দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ড

জুল ভার্ন অমনিবাস

সূচিপত্র

ঝড়ের মধ্যে বেলুন..........2
অনুসন্ধানের ফলাফল 69
পরিত্যক্ত..........118
ভাসমান লিপি..........187
বোম্বেটেদের জাহাজ..........218
রহস্য ঘনীভূত..........293

ঝড়ের মধ্যে বেলুন

১.১ ঝড়ের মধ্যে বেলুন

ঝোড়ো হাওয়ার গর্জনকে ছাপিয়ে হাওয়ায় একটা আর্ত স্বর বেজে উঠল, আমরা কি উপরে উঠেছি আবার?

উত্তর এল, না, আমরা নেমে যাচ্ছি।

অন্য আর-একটা গলা শোনা গেল, বেলুনের বোঝাগুলো কেউ তাড়াতাড়ি ফেলে দাও!

অনেক আগেই বেলুন খালি করে সব বোঝা ফেলে দেয়া হয়েছে।

তবু বেলুন একটুও উপরে উঠছে না?

সে-কথার কোনো উত্তর এল না, বরং আবার সেই প্রশ্নটাই করে বসলেন অন্য-কেউ : বেলুনটা কি একটু-একটু করেও উপরে উঠছে না?

না। নিচে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটা চীৎকার শোনা গেল, সর্বনাশ! বেলুনের ঠিক নিচেই সমুদ্র! বেলুন বোধহয় সমুদ্র থেকে পাঁচশো ফুট উপরে নেই!

তখন কে-একজন দ্রুত উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, বেলুনের উপর থেকে সব ভার ফেলে দাও–যা আছে সব ফেলে দাও! একটুও দেরি কোরো না।

***

আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দের তেইশে মার্চ বিকেল চারটের সময় তরঙ্গময় প্রশান্ত মহাসাগরের মাত্র পাঁচশো ফুট উপরে এই কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল।

ওই বছর উত্তর-পুব দিক থেকে যে-সাংঘাতিক ঝড় বয়ে গিয়েছিল, এখনো হয়তো অনেকের সে-কথা মনে আছে। আঠারোই মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ পর্যন্ত—ন-দিন ধরে তুমুল ঝড় যে-সব উন্মত্ত কাণ্ড করে গিয়েছিল, বুড়োদের মুখে প্রায়ই তার ভয়াবহ বর্ণনা পাওয়া যায়। ওই ঝড়ে আমেরিকা, এশিয়া আর ইওরোপের অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছিল। কত গাছপালা উপড়ে গেল, বড়ো-বড়ো নগর ধ্বংস হয়ে গেল, তার কোনো পরিমাণ করা যায় না। এই অপরিমেয় ক্ষতির সামান্য যে-বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তা পড়েই শিউরে উঠতে হয়। প্রায় একশোটি জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে গুড়িয়ে গিয়েছিল, কত লোক যে মারা গিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

জলে-স্থলে যখন এই ভয়ংকর ধ্বংসলীলা চলছিল, তখন ঝোড়ো আকাশে যেরোমাঞ্চকর নাটকের যবনিকা উঠেছিল, তাও তুলনায় কম রোমহর্ষক নয়।

সেই ঝোড়ো হাওয়ার তাড়নে আকাশ থেকে একটি বেলুন ঘুরতে-ঘুরতে নিচে নেমে আসছিল। বেলুনের তলায় ঝুলে ছিল একটি দোলনা। কুয়াশায় আকাশ এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল যে, বেলুনের আরোহী পাঁচজনকে দেখাই যাচ্ছিল না।

গন্তব্য পথের কোনো হদিশই নেই আরোহীদের। দিশেহারা হাওয়ায় তারা যে কোন পথে ভেসে চলেছেন, তার কিছু ঠিক ছিল না। তবে–অবাক শোনালেও কথাটা সত্যি যে-এত ঝড়েও তাদের খুব-একটা কষ্ট পেতে হয়নি।

মাতালের মতো ঘুরতে-ঘুরতে নিচে নামছে বেলুন। নিচে সমুদ্রের রাগি, বুনো, হিংস আওয়াজ, যার ভিতর ভয়ংকরের উদ্দাম দামামা বেজে চলেছে। বেলুন যে আর-কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্রের উপর আছড়ে পড়ে তলিয়ে যাবে, সে-বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু যাত্রীদের অবস্থাও এমনি অসহায় যে করবারও কিছুই নেই। উপরে প্রচণ্ড ঝড় বেলুনের ঝুঁটি ধরে নিষ্করুণভাবে নাড়ছে, নিচে রাগি সমুদ্র।

আরোহীরা আতঙ্কে অভিভূত হয়ে পড়লেন। আরোহীদের একজন প্রশ্ন করলে : এখন। কী করা যাবে?

উত্তর হল : বাজে জিনিশপত্র সব ফেলে দাও।

যাত্রীরা বেলুন থেকে সব জিনিশ ফেলে দিতে আরম্ভ করল। তুলনামূলকভাবে বিচার করে যে-জিনিশগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম জরুরি বলে মনে হল, প্রথমটায় সে-সবই ফেলে দেয়া হল। কিন্তু তবু যখন বেলুন একটুও উপরে উঠল না, তখন খাবার-দাবার প্রভৃতি ফেলে দিতে পর্যন্ত কেউ কোনো দ্বিধা করলেন না। সলিল-সমাধির হাত থেকে উদ্ধার পেলে তারপর তো খাবার-দাবারের ভাবনা।

কাছাকাছি কোথাও ছোটোখাটো কোনো দ্বীপ আছে কি না তা বোঝা গেল না। নিচে শুধু জল আর জল-বেলুনের যাত্রীদের গ্রাস করবার জন্যে সমুদ্র যেন অধীর হয়ে উঠেছে। যেন প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহীন আলুথালু জলে কোনো ভয়ংকর পরিণামের অশুভ ইঙ্গিত ফেটে পড়তে চাচ্ছে।

অনেক জিনিশ ফেলে দেয়া হয়েছে বলে বেলুন একটু উপরে উঠল। হাওয়ার তাড়নে কাঁপতে-কাঁপতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু সেখানেই তো আর মহাসাগরের শেষ নয়। সুতরাং আবার যখন আমরা আবার নামছি এই তথ্য ঘোষণা করে একটি আর্তনাদ শোনা গেল, তখন সকলের শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

তাহলে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র-সমাধিই আমাদের ভাগ্যে! আর্ত কণ্ঠে একজন বলে উঠল। আরেকজনের গলা শোনা গেল, সমুদ্র! ঢেউয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি?

আমরা ডুবে মরব!

কে যেন ক্লান্ত স্বরে সাহস দিতে চেষ্টা করলেন, হতাশ হোয়ো না, এখনো সময় আছে।

কোথায় সময়! হতাশ গলায় আরেকজন বলে উঠল, আর আমাদের রেহাই নেই!

সব ফেলে দেয়া হয়েছে তো? না। আমাদের কাছে দু-হাজার টাকা আছে, তা এখনও ফেলে দেয়া হয়নি।

কথা শেষ হতে-না-হতেই দু-হাজার টাকা সমুদ্রে ফেলে দেয়া হল। ভার খানিকটা কমল বটে, কিন্তু বেলুন তবু উপরে উঠল না। আশঙ্কায় অবসাদে সবাই প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ল। বেলুন খুব নিচে নেমে এসেছিল। প্রায় দুশো ফুট নিচে ক্ষুব্ধ মহাসাগরের ক্রুদ্ধ গর্জন বাজের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। যা-কিছু তার কবলে পড়বে, নিমেষের মধ্যে তা আত্মসাৎ করে নিজের অতলে টেনে নিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না।

দৃঢ়স্বরে একজন বলে উঠলেন, একটা কাজ করলে হয় না? বেলুন থেকে যেদড়িগুলো ঝুলছে, সেই দড়িগুলোতে নিজেদের শরীর বেঁধে নিয়ে যদি এই বসবার দোলনাটাকে খুলে ফেলে দিই, তাহলে, আমার বিশ্বাস, অনেকটা ভার কমে যাওয়ায় বেলুন ফের উপরে উঠবে।

জলে ডুবে মরতে বসলে লোক খড়কুটোকেও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার একটা সম্ভাবনার সন্ধান পেয়ে সকলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন!

বেলুনের দড়ির সঙ্গে নিজেদের শরীর কঠিনভাবে বেঁধে নিলে সকলে। ক্যাপ্টেনের প্রভুভক্ত কুকুর টপকেও একটা দড়িতে বেঁধে দেয়া হল। তারপর খুলে দেয়া হল দোলনাটাকে।

বিপুল ভার কমে যাওয়ায় বেলুন এবার হু-হু করে উপরে উঠতে লাগল। প্রায় দুহাজার ফুট উপরে উঠে গিয়ে তীব্র গতিতে ছুটে চলল ঝোড়ো হাওয়ায়। এমনিতেই প্রচণ্ড ঝড়

আর ঘন কুয়াশা, তার উপর আবার রাত্রি ঘনিয়ে আসছে। পাঁচটি মানুষ বেলুনের দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। কারু মুখেই টু-শব্দ নেই, শুধু মাঝে-মাঝে ক্যাপ্টেনের কুকুর টপ চেঁচিয়ে উঠছিল। এ-ভাবে ঝুলে যেতে তার নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

কয়েকশো মাইল নির্বিঘ্নে অগ্রসর হবার পর আবার তাদের ভাগ্যের আকাশে ঝড়ের কালো মেঘ ঘনিয়ে এল। তীব্র পাক খেয়ে নিচে নেমে এল বেলুন। এবার আর নিষ্কৃতি নেই, সকলে হতাশ হয়ে মৃত্যুর জন্যে তৈরি হল। দৈব সহায় না-হলে এবার আর রক্ষা নেই। বেলুন যেন নিশ্চত মৃত্যুর দিকে তীব্র বেগে নেমে আসছে।

নিচে, অনেক নিচে নেমে এল বেলুন। সমুদ্র আর একশো ফুট তলায়, তবু এখনো নামছে। বিপদের আর দেরি নেই বুঝে সবাই ভয়ে চোখ বুজল।

হঠাৎ প্রবল এক ঘূর্ণিহাওয়া বেলুনটার ঝুঁটি ধরে নাড়িয়ে গেল। ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে বললেন, শরীর থেকে বেলুনের দড়িগুলো শিগগির সবাই খুলে ফ্যালো, সাঁতার দেয়ার সুবিধে হবে। না-হলে ডুবে মরার আশঙ্কা আছে।

শরীর থেকে দড়ির বাঁধন খুলে হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রইলেন সকলে। টপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। আর-একটা দমকা হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বেলুনটা আছড়ে পড়ল সমুদ্রে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন, টপ নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখতে পেয়েছে!

কিন্তু হঠাৎ সমুদ্রের তীরে আরেকটা বিপরীত তরঙ্গের ধাক্কা খেয়ে বেলুনটা ছিটকে আকাশে উঠে পড়ল। তারপর সমুদ্রের সামান্য উপর দিয়ে আরোহীদের নিয়ে উড়ে

চলল। কয়েকশো ফুট চলে যখন বেলুনটা আবার নিচে পড়ল, তখন আরোহীরা পায়ের তলায়

জলের বদলে ডাঙার স্পর্শ পেলে।

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল একজন, মাটি! মাটি! ডাঙা! আমরা কোনো মহাদেশে বা দ্বীপে এসে নেমেছি।

রাত্রির দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে দৃষ্টি চলল না। কিছুই দেখবার উপায় নেই। যেখানে সবাই নামল সেটা ছোটোখাটো কোনো দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের একাংশ, তা কেউ জানতে পারল না। কিন্তু দ্বীপই হোক আর মহাদেশই হোক, প্রাণ যে বেঁচেছে এইটেই ঢের। পায়ের তলায় ডাঙার স্পর্শ পেয়ে যেন নতুন জীবন পেলে সবাই। এবার কী করা যায় তার পরামর্শ করবার যখন উদ্যোগ হল, তখন একজন বলে উঠল : আরে! ক্যাপ্টেন কোথায়? তার গলার আওয়াজ তো পাচ্ছি না।

সে-কথায় সকলের চমক ভাঙল। সত্যিই তো, ক্যাপ্টেন তাহলে গেলেন কোথায়? টপকেই বা দেখা যাচ্ছে না কেন?

.

১.২ কে, কেন, কবে, কোথায়

আরোহী ক-জনকে নিয়ে বেলুনটা কোত্থেকে এসেছে, সে কথা জানবার জন্যে অনেকের কৌতূহল হতে পারে। বিশেষ করে এইরকম দুর্যোগের মধ্যে আকাশে ওঠবারই বা এমন কী দরকার পড়েছিল, সে-প্রশ্ন ওঠাও অস্বাভাবিক নয়।

ঝড় শুরু হয়েছে পাঁচদিন হল। আঠারোই মার্চ থেকেই ঝড়ের কিছু-কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এই তীব্র ঝড়ের পাল্লায় পড়ে বেলুনটা যে অনেক দূরের দেশ থেকে তীরবেগে ছুটে এখানে পড়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শখ করে এঁরা কেউই এই ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে আকাশ-বিহারে বের হননি, বা নেহাৎ দৈবাৎও এ-ঘটনা ঘটেনি। যে কজন আরোহী এই বেলুনের, তারা সবাই ছিলেন রিচমণ্ড শহরের বন্দী। বন্দিত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই তাঁরা এই বেলুনের সাহায্য নিয়েছিলেন। আসল ঘটনাটি হল এইরকম :

আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকায় যে-গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, তার মুলে ছিল ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের সংকল্প। লড়াইয়ের বিস্তারিত বর্ণনায় আমরা যাবো না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, গৃহযুদ্ধ বন্ধ করবার জন্যে দাসপ্রথা উচ্ছেদকারীদের দল বিশেষভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাদের একজনই হলেন জেনারেল গ্র্যান্ট জেনারেল গ্র্যান্ট মরিয়া হয়ে রিচমণ্ড শহর আক্রমণ করেন। কয়েক জায়গায় জয়লাভ হল বটে কিন্তু রিচম কিছুতেই দখল করা গেল না।

এই লড়াইয়ের সময় জেনারেল গ্রাস্টের জনকয়েক বড়ো অফিসার শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়েন। ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং তাদের অন্যতম। সাইরাস হার্ডিংএর মতো সুদক্ষ

এঞ্জিনিয়ার বিরল। সরকারের তরফ থেকে তাকে লড়াইয়ের এলাকায় রেলপথ নির্মাণের জন্যে নিযুক্ত করা হয়। সাইরাস হার্ডিংএর বয়স প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। অনতিদীর্ঘ দেহ, ছিপছিপে চেহারা। শরীরের গড়ন যেন লোহা পেটানো।

সাইরাস হার্ডিংএর কর্মজীবন শুরু হয় অতি সামান্যভাবে। তার বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ ছিল, কর্মক্ষমতাও ছিল তেমনি আশ্চর্য। এইজন্যেই অল্প দিনের মধ্যেই হার্ডিং জীবনে উন্নতি করতে পেরেছিলেন। যে উদগ্র অভীপ্সার বলে চিরকাল সব কাজে জয়লাভ করা যায়, সেই দৃঢ় অভীপ্সার ছিল হার্ডিংএর।

যেদিন হার্ডিং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, সেদিন আরো-একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। নিউইয়র্ক হেরাল্ড-এর প্রধান সাংবাদিক গিডিয়ন স্পিলেটও সেদিন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁকেও রিচমণ্ডে আনানো হয়েছিল।

অকুতোভয় গিডিয়ন স্পিলেট সংবাদ সংগ্রহের জন্যে ভয়ংকর বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তেও ইতস্তত করতেন না। অন্যান্য খবরের কাগজের চেয়ে অনেক আগেই যাতে নিউইয়র্ক হেরাল্ড খবর জোগাড় করতে পারে, সেদিকে তার তীক্ষ্ণ নজর ছিল। শালপ্রাংশু দেহ তার। বয়স বছর চল্লিশের মতো। তার অনন্যসাধারণ বুদ্ধি, প্রচণ্ড উদ্যম আর উৎসাহ অন্যান্য সাংবাদিকদের ঈর্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল। সে-সময় যতগুলো লড়াই হয়েছিল তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই খবর জোগাড় করবার জন্যে স্পিলেট উপস্থিত থাকতেন { অগুনতি গোলা-গুলির মাঝখানে ঠাণ্ডা মাথায় খবর জোগাড় করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার। তার কর্তব্যজ্ঞান ছিল প্রখর। একহাতে রিভলভার আর অন্যহাতে পেন্সিল নিয়ে খবর লিখতেন তিনি। বিপদের মুহূর্ত পর্যন্ত খবর লিখে চলতেন। গ্রেপ্তার

হওয়ার আগে তার ডায়েরিতে এই পর্যন্ত লেখা ছিল : একজন সৈনিক আমার দিকে তার বন্দুক উঁচিয়ে লক্ষ্য স্থির করছে, কিন্তু লাইনটা আর শেষ হয়নি। এরপর স্পিলেট কী লিখতেন, তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়। তিনি লিখতেন : কিন্তু সে আমায় শেষ পর্যন্ত গুলি না-করে গ্রেপ্তার করল।

এর থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তার সাহস আর কর্তব্যজ্ঞান কী অনন্যসাধারণ। তিনি গুলি খেতে চলেছেন, কিন্তু তবু খবর লিখতে তার বিরতি নেই।

ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট যখন রিচমণ্ডে বন্দী হলেন, তখন এঁদের মধ্যে কোনো আলাপ-পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু দুজনেই দুজনের বিপুল খ্যাতির কথা শুনেছিলেন। সুতরাং দুজনের মধ্যে আলাপ জমে উঠতে দেরি হল না। বিশেষ করে তারা দুজনেই একই দলের লোক, আর দুজনেরই উদ্দেশ্য হল, কী করে পালানো যায়।

কিন্তু পালাবার কোনো পথ ছিল না। শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানোর অধিকার অবিশ্যি তাঁদের ছিল, কিন্তু শহরের বাইরের বেরুনোর পথ ছিল বন্ধ। শহরের প্রত্যেকটি বহির্দ্বারে কড়া পাহারা, ভেতরেও পাহারা। সেই পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে পালানোর কোনো জো ছিল না। বাইরের লোকের পক্ষে ভিতরে আসা অবিশ্যি ততটা অসুবিধের ছিল না, কিন্তু রিচমণ্ড ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছিল একেবারে অসম্ভব।

সাইরাস হার্ডিংএর প্রভুভক্ত নিগ্রো ভৃত্য একদিন রিচমণ্ডে হার্ডিংএর কাছে পালিয়ে এল। এতদিন সে হার্ডিংএর বাড়িতেই ছিল। কিন্তু যখন সে শুনল যে সাইরাস হার্ডিংকে শত্রুপক্ষের

লোকেরা গ্রেপ্তার করেছে, তখন সে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না-করে টপকে সঙ্গে করে চলে এল। ভৃত্যটির নাম নেবুশ্যাডনেজার, ওরফে নেব।

এদিকে জেনারেল গ্র্যান্ট রিচমণ্ড দখল করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি রিচমণ্ড দখল করলে শহরের লোকদের পক্ষে বেরুনোর পথ সুগম হত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সেসম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিল। যারা ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্যে রিচমণ্ডে এসেছিল, লড়াই শুরু হওয়ায় ভেতরে আটকা পড়ে তারাও দারুণ অসুবিধেয় পড়ল। রিচমণ্ডের অনেকেই পালানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

এর কিছুদিন বাদেই গ্র্যান্টের ফৌজ বাইরে থেকে রিচমণ্ড অবরোধ করল। শহরের শাসনকর্তা জেনারেল লী তখন প্রমাদ গুনলেন। এমনভাবে শহরটা অবরোধ করা হয়েছিল যে বাইরে কোনো খবর পাঠানোও অসম্ভব হয়ে উঠল, কাজেই জেনারেল লীও আর বাইরে তাঁর ফৌজের কম্যাণ্ডারের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে পারলেন না। বাইরে লড়াইয়ের হালচাল যে কেমন, তাও তিনি জানতে পারলেন না।

অনেক ভেবেচিন্তে জেনারেল লী বাইরে খবর পাঠানোর জন্যে এক উপায় বের করলেন। তখনকার দিনে বেলুনই ছিলো একমাত্র আকাশ-যান। বেলুনে করে কয়েকজন লোককে বাইরে পাঠিয়ে লড়াইয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা, আর ফৌজের অধিনায়ককে সকল খবর জানানো হবে ঠিক হল। সেইজন্যে শিগগিরই একটা বেলুন তৈরি করা হল। কয়েকজন লোকের উপযোগী চলনসই-গোছের একটা দোলনা বেলুনের তলায় ঝুলিয়ে দেয়া হল। আঠারোই মার্চ রওনা হওয়ার কথা, কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই আকাশে কালো মেঘের আনাগোনা দেখা গেল।

রিচমণ্ডের অনেকেই যে পালানোর জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। পেনক্র্যাফট নামে একটি নাবিক এই বেলুন তৈরির খবর শুনে একটু উৎসাহিত হয়েছিল। সে খবর নিয়ে জানলে যে ক্যাপ্টেন ফরেস্টারের নেতৃত্বে কয়েকজন সৈনিক বেলুনে করে আঠারোই মার্চ সকালবেলা রওনা হবে। ঘুম থেকে উঠেই আকাশে ঝড়ের পূর্বাভাস দেখে পেনক্র্যাফট উৎসাহিত হয়ে উঠল। যে-ময়দানে বেলুনটা যাত্রার জন্যে তৈরি হয়েছিল, সেই সাত-সকালেই পেনক্র্যাফট সেখানে গিয়ে হাজির হল। সে আড়াল থেকে দেখতে পেলে, জেনারেল লী, ক্যাপ্টেন ফরেস্টার এবং কয়েকজন সৈনিক বেলুনের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে একটু দূর থেকে ওদের কথা শোনাবার চেষ্টা করলে। সে শুনতে পেলে ক্যাপ্টেন ফরেস্টার বলছেন : যতক্ষণ-না এই ঝোড়া হাওয়া কমছে, ততক্ষণ রওনা হওয়া যাবে না, জেনারেল। এ-যে দেখছি রীতিমত হারিকেন!

জেনারেল লী সে-কথায় সায় দিলেন : আপনি ঠিকই বলেছেন, ক্যাপ্টেন ফরেস্টার। এই ঝড়ের মধ্যে রওনা হলে নির্ঘাত মরতে হবে। বরং কাল সকালে রওনা হলে ভালো হবে।

তাহলে সবাই তৈরি হয়ে থেকো। কাল সকালেই রওনা হওয়া যাবে। কিন্তু দেখো, বেলুনটা নিয়ে যেন অন্যরা আবার না-পালায়।

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন জেনারেল, এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে সাধ করে মরতে কেউ বেলুনে উঠবে না।

ওদের এই কথা শুনে পেনক্র্যাফট মনে-মনে বললে : আমি নিশ্চিত জানি ক্যাপ্টেন হার্ডিং এই সুযোগ ছাড়বেন না। আবহাওয়া অবিশ্যি বিচ্ছিরি ননাংরা হয়ে আছে। কিন্তু সেইটেই তো আমাদের সুযোগ! তক্ষুনি পেনক্র্যাফট হার্ডিংএর খোঁজে রওনা হয়ে পড়ল।

হার্ডিং তখন দু-একটি দরকারি জিনিশপত্র কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন। রাস্তাতেই পেনক্র্যাফটের সঙ্গে তার দেখা হল। পেনক্র্যাফট তাকে বললে :

আমার একটা কথা শুনবেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?

হার্ডিং পেনক্র্যাফটের মুখের দিকে তাকালেন।

পেনক্র্যাফট তখন বললে : আপনি কি এখান থেকে পালিয়ে যেতে চান?

অন্যমনস্কভাবে হার্ডিং শুধোলেন : কখন?

আজকেই–বলে পেনক্র্যাফট তার জবাবের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং পালানোর জন্যে এত উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন যে, পালানোর নামেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। একটু বাদেই তার হুঁশ হল। পেনক্র্যাফটের নীল কামিজের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে তিনি বললেন : কী বলছিলে তুমি?

পেনক্র্যাফট উত্তর করলে : এখান থেকে পালানোর কথা বলছিলুম, ক্যাপ্টেন। আমাকে আপনি সন্দেহ করবেন না, কোনো বদ মৎলব আমার নেই। আমি আপনার নাম জানি এবং আপনাকে চিনিও। অবিশ্যি আপনাকে কে-ই বা না-চেনে? তবে আমার মতো

একজন সামান্য নাবিককে অবিশ্যি আপনি চিনবেন না। যা-ই হোক, আজ সে-সুযোগ পাওয়া গেছে

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন হার্ডিং। পেনক্র্যাফটের কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন : সুযোগ! কী এমন সুযোগ তুমি পেয়েছো?

বেলুন, কাপ্টেন হার্ডিং, বেলুন! বেলুনে করে উড়ে পালানোর সুযোগ পাওয়া গেছে। আপনি রাজি হলে আজ রাত্রেই আমরা পালিয়ে যেতে পারি!

জেনারেল লী-র বেলুনের কথা হার্ডিংও শুনেছিলেন, কিন্তু তারই সাহায্যে পালানোর মৎলব তার মাথায় আসেনি! উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, বাঃ! চমৎকার! এই সহজ ব্যাপারটা এতক্ষণ আমার মগজে আসেনি! আমি একটা গাধা! আমার নতুন বন্ধুটির নাম জানতে পারি কি।

পেনক্র্যাফট। নাবিক পেনক্র্যাফট।

তারপর দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগল। পেনক্র্যাফট জানালে, অনেকদিন রিচমণ্ডে আটকা থেকে সে অস্থির হয়ে উঠেছে। ব্যাবসা উপলক্ষে সে রিচমণ্ডে এসেছিল। তার সঙ্গে তার স্বর্গত প্রভুর একটি কুড়ি বছরের ছেলে আছে। আগে সে এই যুবকটির বাবার জাহাজে কাজ করত। বছর কয়েক আগে প্রভুর মৃত্যু হয়, এবং বদ লোকে নানানভাবে প্রভুপুত্রকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে ফ্যালে। সে এখন নিজেই একটা ব্যাবসা খুলে প্রভুপুত্রকে নিজের কাছে রেখেছে। ব্যাবসা উপলক্ষে এই শহরে আসবার পর আর বেরুতে না-পেরে তারা অসুবিধেয় পড়েছে।

কথা বলতে-বলতে পেনক্র্যাফটকে সঙ্গে নিয়ে সাইরাস হার্ডিং গিডিয়ন স্পিলেটের কাছে গিয়ে হাজির হলেন। সব কথা শুনে স্পিলেটও আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর তিনজনে বসে অনেকক্ষণ ধরে শলা-পরামর্শ চলল। ঠিক হল, দরকারি জিনিশপত্র সঙ্গে নিয়ে সেদিনই রাত দশটায় যাত্রা করা হবে। রাত্রে কোথায় সবাইকে মিলতে হবে, তাও ঠিক করা হল।

হার্ডিং শুধু বললেন : ঈশ্বর করুন, ঝড় যেন না-কমে।

পেনক্র্যাফট বললে : আশ্চর্য সুযোগ পাওয়া গেছে। ঝড়ের জন্যে রাত্রে বেলুনের কাছে পাহারাও থাকবে না।

একটা শক্ত খুঁটিতে দড়ি দিয়ে বেলুনটাকে খুব ভালো করে বেঁধে রাখা হয়েছিল। সকাল থেকেই জোরে হাওয়া বইছিল, আকাশের হালচালও ভালো ছিল না। হার্ডিংএর ভয়। হল, পাছে দড়ি ছিঁড়ে বেলুনটা আকাশে উড়ে যায়। তাই তিনি শহরতলির ময়দানে গিয়ে দূর থেকে বেলুনটাকে একবার দেখে এলেন।

রাত্রির নিরেট অন্ধকারে যখন সারা রিচম ঢাকা পড়ে গেল, তখন যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন সবাই। খাবার-দাবার, জল ইত্যাদি দরকারি জিনিশ গুছোতে.গুছোতে হার্ডিং কুকুর টপকে বললেন, আকাশে উড়তে তোর ভারি মজা লাগরে, না রে টপ? এ কিন্তু ভারি বিপজ্জনক। আমরা মারাও পড়তে পারি।

স্পিলেট তখন তৈরি হয়ে হার্ডিংএর বাসায় এসে হাজির হয়েছিলেন। হার্ডিংএর কথা শুনে বললেন, আপনি যখন আমাদের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েছেন, তখন আমি অসাফল্যের ভয় করি না, ক্যাপ্টেন।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন হার্ডিং আর স্পিলেট নেব আর টপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বেলুনটাকে যে-মাঠে রাখা হয়েছিল, সেই মাঠের কাছেই নির্দিষ্ট জায়গায় পেনক্র্যাফট আর তার প্রভুপুত্র হার্বার্টের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল। হার্ডিংদের আসতে দেরি দেখে পেনক্র্যাফট তখন বলছিল, ক্যাপ্টেন হার্ডিংরা এখনও এলেন না। যে-তুমুল ঝড় তাতে যে-কোনো মুহূর্তে বেলুনটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই টপের গলার ডাক শুনে সে চেঁচিয়ে বললে, একটু শিগগির করুন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং! নইলে পরে হয়তো পস্তাতে হবে, সব প্ল্যানই ভেস্তে যাবে।

মাঠে তখন একজনও পাহারাওলা ছিল না। ওই দুর্যোগের রাতে বেলুন পাহারা দেয়া তারা দরকার মনে করেনি। সবাই অন্ধাকারে গা-ঢাকা দিয়ে নির্বিঘ্নে গিয়ে বেলুনে চেপে বসলেন। এক-এক করে বেলুনের সবগুলো দড়ি কেটে দেয়া হল। অমনি শাঁ-শাঁ করে। মহাশূন্যে উঠে গেল বেলুন, তারপর তীব্র গতিতে হাওয়ার টানে ভেসে চলল।

এরই কয়েকদিন পরের ঘটনা আগেই বলা হয়েছে। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সবাই যখন মুখর হয়ে উঠেছেন, তখুনি দেখা গেল, তাদের অধিনায়ক সাইরাস হার্ডিং নিখোঁজ। হার্ডিংএর কুকুর টপ-টপই বা গেল কোথায়? হার্ডিং হয়তো কাছাকাছি কোথাও আছেন, এই ভেবে সবাই অনেক ডাকল তার নাম ধরে। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। সাইরাস হার্ডিং তবে গেলেন কোথায়?

.

১.৩ নেব্ কোথায় গেল

ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোথায় গেলেন?

দুর্নিরীক্ষ্য অন্ধকারে স্পিলেটের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোথায় গেলেন?

বেলুন সমুদ্রে আছড়ে পড়বার আগের মুহূর্তে ক্যাপ্টেনের গলা শোনা গিয়েছিল। সুতরাং সমুদ্রে আছড়ে পড়ার পর থেকেই তিনি দল-ছাড়া হয়ে পড়েছেন। কাজেই সকলেরই আশা ছিল, ক্যাপ্টেনকে শিগগিরই খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু একটা ভাবনার বিষয় ছিল। বেলুনটা যখন জলে আছড়ে পড়েছিল তখন যদি তিনি জলে পড়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে সমুদ্রের ঢেউয়ে সাঁতার কেটে তীরে ওঠা সহজ ব্যাপার হবে না। তাছাড়া তিনি জানতেও পারবেন না কাছে কোথাও তীর আছে কি না। চারদিকেই সীমাহারা বিস্তীর্ণ সমুদ্র ভেবে হতাশ হয়ে সাঁতার কাটবার চেষ্টা না-ও করতে পারেন। এই সন্দেহটাই ভাষা পেল পেনক্র্যাফটের গলায় : উনি নিশ্চয়ই সমুদ্রে পড়ে গেছেন।

হাবার্ট বললে, কিন্তু আমরাই বা কোথায় এসে নামলুম?

সে-প্রশ্নের উত্তর পরে খুঁজলেও চলবে। স্পিলেট বললেন, এখন সবাই চলো দেখি। হয়তো ক্যাপ্টেন হার্ডিং সৎরে তীরে এসে উঠেছেন।

তারপর সেই অন্ধকার রাত্রেই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর খোজে সবাই এগিয়ে চললেন। রাত্রির অন্ধকারে তারা দিক ঠিক করতে পারলেন না, তবু বেলুনটা যেদিক থেকে এসেছিল মনে হল, ক্যাপ্টেনের খোঁজে সেদিকেই পা চালালেন সকলে। অন্বেষণ শুরু হল।

নেব প্রভুকে না-দেখতে পেয়ে ক্রমশই অধীর হয়ে উঠছিল। সকলে যাতে ভালো করে অনুসন্ধান করে, সেইজন্যে সে বললে, ক্যাপ্টেনকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। নইলে এই অজ্ঞাত দ্বীপে আমাদের পদে-পদেই বিপদের সম্ভাবনা।

নিশ্চয়ই! বলে স্পিলেট নেবকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু পরমুহূর্তেই কী-একটা কথা মনে হতে নেব শিউরে উঠল। যে-সন্দেহটা সে অনেক্ষণ জোর করে চেপে রাখবার চেষ্টা করছিল, এবার সেই প্রশ্নটাই সে জিগেস করে বসল: কিন্তু তাকে আর জীবিত অবস্থায় পাওয়া যাবে কি? আপনাদের কী মনে হয়?

সকলের মনেই এই সন্দেহটা তোলপাড় করছিল, আর সকলেই এই সন্দেহকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছিল। এবার নেব সরাসরি তার সন্দেহ প্রকাশ করবার পর কেউই কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। দেবার সাহসও করলেন না। সমুদ্রে যদি পড়ে থাকেন, তবে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে আর না-পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। তবে যদি কাছেই কোথাও ডাঙায় পড়ে গিয়ে থাকেন তাহলে তাঁকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

থেকে-থেকে সাইরাস হার্ডিংএর নাম ধরে জোর গলায় ডাকতে-ডাকতে সবাই অন্ধকারে আস্তে-আস্তে পথ চলতে লাগলেন। প্রতি পদক্ষেপেই বিপদের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কারণ সেই ভূখণ্ডে কোথায় কী আছে, তা তারা জানতেন না। সুতরাং একবার অন্ধকারে

অসাবধানে কোথাও পা দিলেই কোত্থেকে কী হয়ে যাবে, কে জানে? হার্বার্ট বললে, হয়তো ক্যাপ্টেন হার্ডিং আহত হয়ে অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় পড়ে আছেন, তাই আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না।

তবে এক কাজ করা যাক–পেনক্র্যাফট বললে, যদি তা-ই হয়, তবে পথের মধ্যে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে যাওয়া উচিত। তাহলে জ্ঞান ফিরলে সকালে উঠে হাঁটতেহাঁটতে ক্যাপ্টেনের মতো বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন আমরা কোন পথে গেছি।

স্পিলেট এ-কথায় সায় দিলেন : ঠিক বলেছো, পেনক্র্যাফট। দ্যাখো তো নেব, আশপাশে কোথাও শুকনো ডালপালা কাঠকুটো কিছু পাও কি না।

হার্বার্ট শুধোলে, কারু কাছে দেশলাই আছে কি?

আছে, আমার কাছে। পেনক্র্যাফট উত্তর দিলে : দেশলাইটা আমি পোশাকের ভিতর এমন যত্ন করে রেখেছিলুম যে, জলে পড়বার সময়ও সেটা ভেজেনি।

কিন্তু, দেশলাইটা থাকলেও শুকনো বা কঁচা কোনোরকম ডালপালা পাওয়া গেল না। কাঠকুটোর সন্ধানে খানিকক্ষণ খামকা এদিক-ওদিক খুঁজে ফিরে এসে নে জানালে, না। গাছপালা কাঠকুটো কিছু পেলুম না।

জায়গাটা তবে বোধহয় মরুভূমির মতো, উদ্ভিদবিহীন, স্পিলেট বললেন : কোনো গাছপালাই বোধহয় এই পাথুরে জমিতে জন্মায় না।

খুঁজতে-খুঁজতে আরো কিছু দূর তারা এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ সামনে আওয়াজ শুনে বোঝা গেল যে কাছেই জল রয়েছে, এবং এবার পথ বন্ধ। নে খুব জোরে জোরে হার্ডিংএর নাম ধরে ডাকতে লাগল। অবাক হয়ে সবাই শুনলেন, দূর থেকে নেএর ডাকের প্রতিধ্বনি

ভেসে আসছে।

পেনক্র্যাফট নাবিক। সে বললে, নিশ্চয়ই এইটে একটা নদী। এর ওপারে আর-একটা ভূখণ্ড আছে। নইলে নেবএর ডাকের প্রতিধ্বনি কখনো ভেসে আসতো না। যদি আমাদের ওপাশে ভূখণ্ড বা দ্বীপ না-থাকত, তবে বিশাল সমুদ্রে নেএর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠত—সেই স্বর অনেক দূরে চলে যেত।

স্পিলেটও তার কথার সমর্থন করলেন : আমারও তা-ই মনে হয়। কারণ, যদি এর চারদিকেই সমুদ্র থাকত, তাহলে আমাদের কথার প্রতিধ্বনি না-উঠে তা মিলিয়ে যেত।

নিরেট অন্ধকার ভেদ করে এপারেই দৃষ্টি চলছিল না, ওপারে তো দূরের কথা। চারধারেই ছোটো-ছোটো পাহাড়। তাতে একটাও গাছপালা না-থাকায় হিংস্র জন্তুর অনস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আর খামকা না-ঘুরে ক্লান্ত দেহে সবাই একটা পাথরের চাতালের উপর বসে পড়লেন।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। তারপর নীরবতা ভেঙে সর্বপ্রথম কথা বললে নাবিক পেনক্র্যাফট : ক্যাপ্টেনকে আর পাওয়া যাবে বলে তো আমার মনে হয় না। বোধহয় আমরা তাকে মহাসমুদ্রেই হারিয়েছি।

স্পিলেট নিজেও মনে আশা পাচ্ছিলেন না। তবু তিনি বললেন, আমরা ক্যাপ্টেনকে খুঁজে বার করতে পারবো, পেনক্র্যাফট। হতাশ হওয়াটা আমাদের ঠিক হবে না। হয়তো তিনি কোথাও আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন, তাই আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না।

কেউ আর কোনো কথা বললে না। সবাই চুপ করে বসে রইল। শুধু খানিকক্ষণ বাদে হার্বার্ট একবার বললে, ইশ! কী বিচ্ছিরি ঠাণ্ডা! একেবারে জমে যাওয়ার জোগাড়!

পেনক্র্যাফট নিজের সন্দেহের কথা খুলে বলতেই নেব মনে-মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যুর কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না নেব।

অসম্ভব। এইভাবে কখনোই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যু হতে পারে না! উনি যে-রকম কৌশলী ও বুদ্ধিমান, তাতে ডাঙার এত কাছে এসেও কি তার মৃত্যু হতে পারে? না-না, তা কখনোই হতে পারে না। নেব সেইদিনই ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যুকে বিশ্বাস করবে, যেদিন সে ক্যাপ্টেনের স্পন্দন-রহিত শরীর নিজে খুঁয়ে অনুভব করবে তার শীতল স্পর্শ, আর অঝোর ধারায় অশ্রু বিসর্জন করে সিক্ত করে দিতে পারবে সেই দেহ। ক্যাপ্টেনের মৃতদেহ নিজে স্পর্শ না-করা পর্যন্ত নে তার মৃত্যুতে বিশ্বাস করতে পারবে না। ক্যাপ্টেন হার্ডিংএর মৃত্যু কি এতই সহজ? এমন অজ্ঞাতসারে কি তার মৃত্যু হতে পারে?

একটা তীব্র অধীরতায় ভরে উঠতে লাগল নেএর মন। তারপর হঠাৎ একসময় অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল, আমি কিন্তু ও-কথা মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। যেমানুষ এর

চেয়েও সাংঘাতিক সংকটের মধ্যে পড়েও এতদিন প্রাণরক্ষা করে এসেছেন, তার পক্ষে এত সহজে প্রাণ হারানো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

স্পিলেট বললেন, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়, নেব! পেনক্র্যাফট শুধু তার একটা অনুমানের কথা বলছিল। তার কথায় রাগ কোরো না।

তারপর স্পিলেট, পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট পরামর্শ করতে বসলেন। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ভোরের আর বেশি দেরি ছিল না। সুতরাং ভোরবেলা থেকেই যাতে অন্যভাবে সাইরাস হার্ডিংএর অনুসন্ধান করা যায়, সে-কথাই ভাবতে লাগলেন সকলে।

বিমর্ষ নেব একটু দূরে চুপ করে বসে রইল। সাইরাস হার্ডিং সম্পর্কে সে তখন আকাশপাতাল ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। যে-হার্ডিংএর গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনে সে অবরুদ্ধ রিচণ্ড শহরে ছুটে এসেছিল, সেই হার্ডিংকেই, তার সেই প্রভুকেই এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! এর চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কী হতে পারে?

একটু বাদেই ফুটফুটে এক ভোরের সোনালি আলো দেখা দিল আকাশে। আর-একবার সাইরাস হার্ডিংএর অনুসন্ধান করবার জন্যে পা চালিয়ে দিলেন সবাই। এটি যে একটি ছোটো দ্বীপ তা বুঝতে অসুবিধে হল না। নেবুর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি গত রাত্রিতে যেখান থেকে শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, তারা ক্রমে সেই জায়গায় এসে হাজির হলেন। দেখা গেল, ওপারে সত্যি-সত্যিই একটু বড়ো আর-একটা দ্বীপ রয়েছে। দ্বীপদুটির মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে খরস্রোতা অপ্রশস্ত একটি নদী। দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে তীব্র কৌতূহলের সঙ্গে অপলক চোখে সবাই ওপারের দ্বীপটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় হঠাৎ

পিছনে ঝপাং করে একটা আওয়াজ হল। চমকে সবাই তাকিয়ে দেখলেন, নেব সেই খরস্রোতা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন।

হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতেই চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট : কোথায় যাচ্ছো তুমি, নেব? শিগগির ফিরে এসো!

নেএর কিন্তু ফিরে আসার ইচ্ছে মোটেই ছিল না। সেই তীব্র স্রোতের মধ্যেই সুকৌশলে সাঁতার কাটতে কাটতে নে উত্তর করলে, ওপারে গিয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে খুঁজে বেড়াবো। হয়তো তিনি সাঁতার কেটে এসে এই দ্বীপেই উঠেছেন।

নেবএর দেখাদেখি স্পিলেটও জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পেনক্র্যাফট তাকে ধরে ফেলল। গম্ভীর গলায় সে বললে, প্রাণটা এত শস্তার নয় মিস্টার স্পিলেট, যে অমনভাবে আগাগোড়া না-ভেবেই নষ্ট করে ফেলবেন। এই তীব্র স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটতে যাওয়া মানেই হল প্রাণ হারানো। আমরা নেবএর মতন অত ভালো সাঁতারুও নই। আমার মনে হয়, ঘণ্টাখানেক পরেই ভাটার টানে নদীর জল একদম কমে যাবে, তখন আমরা অনায়াসেই ওপারে যেতে পারবো।

স্পিলেট নিরস্ত হলে সবাই ওপারের দিকে তাকালেন। দেখলেন, নেব ওপারে গিয়ে পৌঁছেছে। ভিজে কাপড়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে সে তাদের বিদায় অভিনন্দন জানালে।

পাহাড়ের আড়ালে নেব অদৃশ্য হয়ে না-যাওয়া অব্দি নিমেষহীন চোখে তারা তাকে দেখতে লাগলেন। নিগ্রো ভৃত্যটির অসাধারণ প্রভুভক্তি দেখে তিনজনের চোখে জল এল।

তারপর তিনজনেই ক্যাপ্টেনকে খুঁজতে খুঁজতে সর্বত্র চষে বেড়ালেন। তন্নতন্ন করে চারদিকে খোঁজাখুঁজি চলল। কিন্তু হার্ডিংএর কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না।

খিদেয়, তেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সবাই। তারপর আবার সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়ালেন তিনজনে।

নদীর জল তখন খুব তাড়াতাড়ি কমতে শুরু করেছে। এই ফাঁকে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে তারা চারদিকে তাকালেন। কিন্তু গলাধঃকরণ করা যায় এমন-কিছুই নজরে পড়ল না। তেষ্টায় এদিকে তালু শুকিয়ে আসছে। কিন্তু নোনা জল তো আর পান করা যায় না। বেলুনে যে খাবার-দাবার ও জল ছিল বেলুনকে হালকা করার জন্যে তা আগেই ফেলে দেয়া হয়েছিল। গত রাত্রি থেকে একটুও খাবার বা জল পেটে পড়েনি। তাই, এই পরিশ্রমের পর তারা অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়লেন। শ্রান্তিতে শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইল।

নদীর জল যেভাবে কমছিল, তাতে তাদের মনে হল আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই নদী প্রায় জলশূন্য হয়ে পড়বে। সেই খিদে-তেষ্টার সময় একমাত্র আশা হল ওপারের এলাকাটি —হয়তো সেখানে কিছু খাবার-দাবার পাওয়া যেতে পারে, সেই ভরসায় সতৃষ্ণ চোখে সবাই নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বিকেলের দিকে জল একেবারে কমে গেল। দ্বীপদুটির মাঝখান দিয়ে স্রোতহীন যেসরু জলধারা বর্তমান রইল তাকে আর কোনোরকমে নদী বলা চলে না—নিছকই একটা খাল মাত্র।

তিনজনে হেঁটেই খালটুকু পার হয়ে গেলেন। আহার্যের আশায় ব্যাকুল হয়ে তারা দ্বীপে উঠে এলেন।

স্পিলেট উপরে উঠে বললেন, আমি নেবএর খোজে যাচ্ছি। সন্ধেবেলা আবার এখানেই দেখা হবে। তোমরা যদি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারো, আমার জন্যেও রেখে দিও। আমিও যদি পথে কিছু খাবার পাই নিয়ে আসবো।

হার্বার্ট শুধোলে, আমি আপনার সঙ্গে যাবে কি?

না। তোমরা বরং মাথা গোঁজবার মতো একটা আস্তানা, আর কিছু খাবার জোগাড় করো। এই বলে নেব যে-পথে গিয়েছিল, স্পিলেট সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

স্পিলেট প্রস্থান করবার পর হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট নদীতীর থেকে খানিকটা দূর এগিয়ে গেল। চারদিকে গ্র্যানাইট পাথরের ছোটো-বড়ো পাহাড় শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা এদিক-সেদিক ঘুরতে-ঘুরতে একটা বেশ বড়ো পাহাড়ের নিচে এসে থামল। পেনক্রাফট বললে, হার্বাট, এসো, আমরা পাহাড়টায় উঠে একবার চারদিকটা দেখে নিই। কিছু খাবারের জোগাড়ও তো আমাদের করে নিতে হবে।

তারা দুজনে পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। একটু উঠতেই দেখা গেল অনেকগুলো। নামনা-জানা পাখি বসে আছে। পাখিগুলো বোধহয় কখনও মানুষ দ্যাখেনি, তাই ওদের দেখে ভয় পেল না। ওরা দুজনে যখন পাখিগুলোর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল, তখনও তারা ভয় পেল না, বা উড়ে যাওয়ার উপক্রম করল না।

ওদের কাছে এমন-কোনো হাতিয়ার ছিল না যা দিয়ে দু-একটা পাখি মারা যায়। রাত্রের আহারের জন্যে আপাতত গুটিকতক পাখি নিতান্তই প্রয়োজন। পেনক্র্যাফট হাত বাড়িয়ে দু-একটাকে ধরতে গেল, কিন্তু তারা তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। হতাশ হয়ে পড়ল পেনক্র্যাফট। বললে, নাঃ, এরা আমাদের আজকেও কিছু খেতে দেবে না দেখছি!

হার্বার্ট কোনো কথা না-বলে চুপচাপ উপরে উঠতে লাগল। পাহাড়ের মাথার উপর উঠে চারদিকে তাকিয়ে দুজনেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। দূরে সবুজ গাছের সারি দেখা যাচ্ছে। গাছ যখন দেখতে পাওয়া গেছে, তখন এই দ্বীপে কিছু-না-কিছু আহার পাওয়া যাবে বলে তাদের আশা হল।

দুজনেই তখন নামতে শুরু করলে। নামতে-নামতে পাহাড়ের গায়ে চিমনির মতন একটা বড়ো গুহা দেখতে পেয়ে পেনক্র্যাফট বললে, রাত্তিরে এই গুহাতেই আমরা থাকতে পারবো।

আস্তে-আস্তে তখন সন্ধে নেমে আসছিলো। সূর্য ডুবেছিল সমুদ্রের সেই সীমান্তে, যেখানে আকাশ আর সমুদ্র মিলে-মিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

ক্রমেই সন্ধে হয়ে আসছে দেখে পেনক্র্যাফট বললে, তাড়াতাড়ি গুহাটা একবার দেখে নিয়ে নিচে যেতে হবে। আমাদের হাতে এখনও ঢের কাজ পড়ে আছে। কোনো খাবার জিনিশ বা জল এখনো জোগাড় করা হয়নি।

কিন্তু আর-বেশিক্ষণ খাবারের ভাবনায় মাথা গরম করতে হল না ওদের।

গুহা পরীক্ষা করতে গুহার ভেতরে কতকগুলো সামুদ্রিক ঝিনুক দেখতে পাওয়া গেল। ইংরেজিতে এদের বলে মাসেল। গুহার এক জায়গায় পাঁক আর জল দেখা গেল। সেই পাঁকের মধ্যে ঝিনুকগুলো পড়ে ছিল। দেখে মনে হল, সমুদ্রের জল যখন বেড়ে ওঠে, তখন গুহার মধ্যেও জল ঢোকে।

হার্বার্ট বললে, যাক, বাঁচা গেল। খাওয়ার ভাবনা আপাতত আর ভাবতে হবে না। এই ঝিনুকগুলো খেতে নাকি খুব ভালো। আজ আগুনে পুড়িয়ে দিব্যি খাওয়া যাবে।

গুহাটি পরীক্ষা করে দুজনেই খুব খুশি হয়ে উঠল। তারা ঠিক করলে গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে, তাহলে আর বাইরে থেকে সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়া ভেতরে ঢুকে তাদের জ্বালাতন করতে পারবে না।

পেনক্র্যাফট বললে, খাওয়ার ভাবনা না-হয় ঘুচল, কিন্তু এবারে জল পাওয়া যাবে কোথায়? এখানে কোথাও তো ভালো জল পাওয়ার কোনো উপায়ই দেখছি না। অথচ জল না-হলে চলবেই বা কী করে?

হাবার্ট বললে, চলো, নিচে গিয়ে কোথাও জল পাওয়া যায় কি না খুঁজে দেখি। শেষ পর্যন্ত যদি একান্তই ভালো জল না-পাওয়া যায়, তবে এই নদীর ঘোলা জল খেয়েই কোনোরকমে থাকতে হবে।

দুজনে ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। নামতে-নামতে পাহাড়ের পাথরের ফাঁকেফাঁকে কয়েকটা শাদা রঙের গোল-গোল জিনিশ পেনক্র্যাফটের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা সে হাতে তুলে নিলে। পরীক্ষা করে সে বুঝতে পারলে যে জিনিশটা পাখির ডিম। অমনি

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। বললে, এই দ্যাখো হার্বার্ট, আমরা খাবারের জন্যে আরেকটা জিনিশ পেয়েছি-পাখির ডিম!

ডিম দেখে হার্বার্টও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। হালকা গলায় বললে, কয়েকদিন বাদে আজ আমাদের আহার খুব ভালোভাবেই হবে দেখছি! এ-যে দেখছি রীতিমতো ভোজ!

কয়েকটা ডিম কুড়িয়ে তারা আবার নামতে লাগল। এবং জলের খোঁজেও তাদের আর খুব বেশি দূরে যেতে হল না। তারা দেখতে পেলে, নেবকে সঙ্গে নিয়ে স্পিলেট একটা পাহাড়ের ভেতর থেকে বের হলেন। তাদের দেখতে পেয়েই স্পিলেট চীৎকার করে বললেন, নেবকে পেয়েছি, কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর কোনো খোঁজ পেলুম না।

একটু বাদেই নেবের সঙ্গে স্পিলেট এসে উপস্থিত হলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, কিছু খাবার জোগাড় করতে পারিনি, তবে জলের সন্ধান পেয়েছি। ওইদিকে খানিকটা দূরে একটা বড়ো হ্রদ আছে। খেয়ে দেখলুম, তার জল বেশ মিষ্টি। কিন্তু তোমাদের জন্যে কী করে জল নিয়ে আসবো ভেবে পেলুম না। শেষটায় আর-কোনো উপায় না-দেখে দুটো রুমাল ভিজিয়ে এনেছি, সেই জল নিংড়ে তোমাদের খেতে হবে। আমার আর আপাতত জলের দরকার নেই, পেট পুরে খেয়ে এসেছি। নেবও একটু খেয়ে নিয়েছে।

ভালোই করেছেন, হার্বার্ট বললে, আমরাও খাবারের জোগাড় করে রেখেছি।

পাহাড়ের তলা থেকে কিছু শুকনো কাঠকুটো সংগ্রহ করে সবাই আবার ওপরে উঠতে লাগলেন। গুহায় হাজির হয়ে পেনক্র্যাফট দেশলাই বার করে দেখল, দেশলাইয়ে মাত্র একটা কাঠি আছে।

কাঠিটা হাতে করে খানিকক্ষণ কী যেন ভাবলে পেনক্র্যাফট। একটামাত্র কাঠি-একবার নিভে গেলে আর রেহাই নেই। এই নির্জন দ্বীপে না-খেয়ে ঠাণ্ডায় জমে মরতে হবে সবাইকে। আগুন জ্বালিয়ে খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে, সেই আগুন যাতে কোনোমতেই নিভে না-যায়। একটু বাদে-বাদেই আগুনে কাঠ গুঁজে দিয়ে জিইয়ে রাখতে হবে আগুনকে।

গুহার এককোণে কতগুলো শুকনো গাছের পাতা জড়ো করে খুব সাবধানে তাতে আগুন ধরালে পেনক্র্যাফট। তারপর সরু ডালপালা আগুনে নিক্ষেপ করতেই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

হার্বার্ট ডিম আর ঝিনুকগুলোকে তাড়াতাড়ি আগুনে ঝলসে নিতে লাগল। পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট বসে-বসে তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আলাপ করতে লাগলেন। নেব কিন্তু কোনো কথা বললে না। চুপ করে একপাশে বসে রইল। সারাদিন আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও সাইরাস হার্ডিং-এর কোনো চিহ্নই দেখতে পায়নি সে। সন্দেহে আশঙ্কায় সে একেবারে মুষড়ে পড়েছে।

স্পিলেট কী করে নেবকে খুঁজে পেয়েছিলেন সে-কথাই বলতে লাগলেন পেনক্র্যাফটকে : তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই আমি নেবের দেখা পাই। ও তখন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ক্যাপ্টেনের নাম ধরে ডাকছিল, আর কাঁদছিল। আমরা দুজনে যতদূর খুঁজেছি ততদূরের মধ্যে কোথাও কোনো মানুষের

পদচিহ্ন দেখতে পাইনি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি নেবকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। কিছুতেই আসতে চাইছিল না।

ইতিমধ্যে খাবার তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সকলে মিলে সেই ঝলসানো ঝিনুক আর ডিমই খেলেন। নেব বিশেষ কিছু খেল না। তখন স্পিলেট তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, নেব, তুমি উতলা হচ্ছো কেন? আমি ঠিক জানি ক্যাপ্টেনকে আমরা খুঁজে পাবোই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে অগ্নিকুণ্ডের কাছে সবাই ঘেঁষাঘেষি করে শুয়ে পড়লেন। পরিশ্রমে আর উত্তেজনায় সবাই একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কাজেই শুতে-না–শুতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিন্তু শুধু একজন সারা রাত না-ঘুমিয়ে অস্থিরভাবে ছটফট করতে লাগল। কষ্ট করে না-বললেও চলে যে, সেই অস্থির-হৃদয় তন্দ্রাবিহীন লোকটি হল ক্যাপ্টেন সাইরাস হাডিং-এর প্রভুভক্ত ভৃত্য ভাগ্যহত নেব।

সকালে উঠে পেনক্র্যাফটই প্রথম আবিষ্কার করলে যে নেব গুহার ভিতরে নেই। সে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, আরে! নেব কোথায় গেল? সবাই মিলে গুহার চারপাশে খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু কোথাও নেবকে দেখা গেল।

প্রথমটা তারা মনে করলেন হয়তো সে কাছেই কোথাও গেছে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে গেল, অথচ নেব তবু ফিরে এল না। এতক্ষণের মধ্যেও সে যখন ফিরে এল না, তখন সবাই আন্দাজ করলেন যে সাইরাস হার্ডিংএর খোঁজেই সে কোথাও চলে গেছে। কিন্তু যেতে হলে বলে যেতে তো পারতো! না-বলে এইভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল কেন? আর, গেলই বা কোথায়? এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর কেউ বার করতে পারলে না।

.

১.৪ আশ্চর্য ঘটনা

ঝড়ের বেগ একটু কমে এসেছিলো, এবার সেই ঝড় আবার একটু-একটু করে বেড়ে উঠতে লাগল। মহা গর্জনে গুহার বাইরে ফেটে পড়তে লাগল হাওয়া। একে শীতকাল, তার উপর সমুদ্রের ধারের ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া। গুহার ভিতরে আগুনের কুণ্ডের কাছে বসেও সবাই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, হার্বার্ট শুধু একবার বাইরে গিয়ে কোনোরকমে কিছু শুকনো ডালপালা আর গোটাকতক ডিম কুড়িয়ে নিয়ে এল। সারাদিনটা এইভাবে গুহায় বসেই কেটে গেল। তবে, একেবারে বসে রইলেন না কেউই। এই নির্জন দ্বীপের এই গুহাটাকে বাসযোগ্য করে তোলবার জন্যে খুব খাটতে লাগলেন তিনজনে।

সন্ধেবেলায় ঝড়ের তর্জন-গর্জন খুব বেড়ে গেল। সমুদ্রের উত্তাল বাতাস যেন পাগল হয়ে উঠল। আর ঝড়-বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। সে-কী বৃষ্টি! সারাটা আকাশ ফুটো করে কে যেন তুমুলভাবে জল ঢেলে চলেছে! যাঁরা কখনও দ্যাখেননি, তারা এই। সামুদ্রিক মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের কথা কল্পনাও করতে পারবেন না। গুহায় বসে তিনজনে উম্মাদ ঝড়ের তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলেন।

কালো রঙের মেঘে সারা আকাশ ছাওয়া। কাজেই সন্ধের অন্ধকার একেবারে নিরেট হয়ে উঠল যেন। নিচ্ছিদ্র, দুর্নিরীক্ষা অন্ধকারে ঝড়ের পাখসাটে পাহাড়ের উপরকার বড়োবড়ো পাথরের চাইলো মধ্যে-মধ্যে ভীষণ আওয়াজ করে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। দ্বীপদুটির

মাঝখানের নদীটাও কানায়-কানায় ভর্তি হয়ে উঠেছে। কী সেই জলের তোেড়! আর সেই। ছোটো নদীতেই ঢেউয়ের কী ক্রুদ্ধ গর্জন! গুহার ভিতর থেকেই জলের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

এমন দারুণ দুর্যোগের রাতে একলা নেব অসহায়ভাবে কোথায় পড়ে আছে—সেই কথা ভেবে সকলেরই মন দুঃখে ভরে উঠল। সাইরাস হার্ডিংকে তো আর পাওয়ারই আশা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন–কে জানে! কোনো দুর্ঘটনায় হয়তো প্রাণ খুইয়ে বসেছেন। নেবের কথা ভেবে সকলেই বিচলিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু খামকা অস্থির হয়ে উঠেও বা কী লাভ। তাদের হাতে তখন করবার মতো কিছুই ছিল না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিদারুণ ভাগ্যকে মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। সবাই বিমর্ষ হয়ে উঠলেন। বাইরের ঝড়ের তুমূল গর্জনে শুধু থেকে-থেকে গুহার ভিতরের নীরবতা কেঁপেকেঁপে উঠতে লাগল।

রাত্রি তখন অনেক গভীর। ঘেঁসাঘেঁসি করে তিন জনে তখন গুহার ভিতরে নিবিড় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। বাইরে তেমনি তুমুল গর্জনে ফেটে পড়ছে দুর্যোগ। হঠাৎ কেন যেন স্পিলেটের ঘুম ভেঙে গেল। তার মনে হল বাইরে ঝড়ের গর্জন ছাড়াও অন্য কী-একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। স্পিলেট তাড়াতাড়ি পেনক্র্যাফটকে ডেকে তুললেন পেনক্র্যাফট, ওঠো ওঠো! শুনছো বাইরে ও কীসের শব্দ?

ঘুমজড়ানো চোখে পেনক্র্যাফট একটু হকচকিয়ে রইল। তারপর সংবিৎ ফিরতেই কান পেতে খানিকক্ষণ কী শোনবার চেষ্টা করলে। তারপর বললে, কই? কোনো শব্দই তো শুনতে পাচ্ছি না! ও কিছু না, ঝড়ের আওয়াজ বোধহয়।

না, না, স্পিলেট আবার বললেন, আরো-একটু ভালো করে শোনো দিকিনি। টপের গলার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না?

সতর্কভাবে কান পাতল পেনক্র্যাফট। বাইরে ঝড়ের তুমুল গর্জন। তবু পেনক্র্যাফট কান পেতে কী যেন শুনতে লাগল। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, ঠিক ঠিক? টপের লোই তো বটে!

ওদের কথা শুনে হার্বার্টও জেগে উঠেছিল। সেও সায় দিলে হ্যাঁ, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে!

উত্তেজনায় সকলের মন ভরে উঠল। একটা জলন্ত শঠ হাতে নিয়ে দ্রুতপায়ে হার্বার্ট গুহার মুখে এসে হাজির হলতারপর টপকে নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল—টপ, টপ! এই যে! এদিকে!

টপকে ডাকবার পর দেখা গেল, যেন তার চীৎকার ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। আরো-খানিকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই ভিজে-জবজবে শরীরে টপ তাদের কাছে এসে হাজির। অস্থিরভাবে ডাকতে লাগল সে। চঞ্চলভাবে বার-বার গুহার বাইরে ছুটে যেতে লাগল, আবার ভিতরে আসতে লাগল। কিন্তু হায়! সাইরাস হার্ডিংকে দেখা গেল না।

তবু হতাশা আসতে দিলেন না স্পিলেট। বললেন, টপ নিশ্চয়ই আমাদের কিছু-একটা বলতে চাচ্ছে।

তখনও অস্থিরভাবে ল্যাজ নাড়ছে টপ। হার্বার্ট বললে, টপ বোধহয় আমাদের কোথাও নিয়ে যেতে চায়, তাই অমন ছটফট করছে। চলুন, ও আমাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখা যাক। আমার মনে হচ্ছে টপকে যখন পাওয়া গেছে, ক্যাপ্টেন হার্ডিংকেও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পেনক্র্যাফট বললে তাহলে এক্ষুনি আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত। একটুও দেরি করা ঠিক হবে না। টপই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

তক্ষুনি তিনজনে হাত-ধরাধরি করে সেই ঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। ঝড় তখনও একটুও কমেনি, আগের মতোই তার উথালপাথাল দামাল নৃত্য চলেছে। বাইরে জমাটবাঁধা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে দৃষ্টি চলে না। টপ ডাকতে-ডাকতে অগ্রসর হচ্ছে। অন্ধকারে টপের স্বর শুনে-শুনে সবাই তাকে অনুসরণ করে চললেন।

তারা চললেন বটে, কিন্তু সেই ঝড়ের মধ্যে চলাটা সহজে হল না। সামান্য পথ যেতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে গেল। কতক্ষণ ধরে চলেছেন, উত্তেজনার কারুই সে, খেয়াল ছিল না। খেয়াল হল তখন, যখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে, একটু আলো ফুটছে আকাশে। টপ তখন একটা পাহাড়ের উপর উঠছিল। সৌভাগ্যের বিষয় বলতে হবে ঝড় তখন অনেকটা কমে গিয়েছিল, বৃষ্টিও আর পড়ছিল না। আকাশের অবস্থা আর হাওয়ার গতি দেখে বোঝা গেল, শিগগিরই আকাশ একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাবে—ঝড়ও আর থাকবে না। দ্রুতপায়ে সবাই পাহাড়ে উঠতে লাগলেন।

খানিকটা ওঠবার পরেই সামনে একটা গুহা দেখা গেল। টপ ডাকতে-ডাকতে দৌড়ে সেই গুহার ভিতর ঢুকল। তারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে না-পেরে টপের অনুসরণ করলেন।

কিন্তু ভিতরে ঢুকেই যা দেখলেন তাতে সবাই শুম্ভিত হয়ে গেলেন। চোখে পুঞ্জিত বিস্ময় নিয়ে তারা দেখতে পেলেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং স্পন্দনরহিত দেহে শুয়ে আছেন। বেঁচে আছেন, না মারা গেছেন—দেখে তা বোঝবার জো নেই। তার মাথা কোলে নিয়ে উদাস, করুণ চোখে বসে আছে একটি লোক। বলা বাহুল্য, সেই লোকটি আর-কেউ নয়, হার্ডিং এর অনুগত ভৃত্য নেব।

তিনজনে খানিকক্ষণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলেন। কারু মুখেই কোনো কথা ফুটল না। এমন-একটা দৃশ্য যে কখনও তাদের নজরে পড়বে, এ-কথা তারা। ভুলেও কল্পনা করেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন টপ তাদের জীবিত ক্যাপ্টেনের কাছে হাজির করবে! ঘটল তার বিপরীত। সাইরাস হার্ডিং-এর সমাধির ব্যবস্থা করবার জন্যেই তাদের হাজির হতে হল।

সেই করুণ নীরবতা ভাঙলো হার্বার্টের গলার স্বরে। সে জিগেশ করলে নেব, ক্যাপ্টেন কি বেঁচে আছেন?

নেব্ ঘাড় নাড়লো। জানালে যে তা সে ঠিক জানে না। যে-রকম নিরাশ্বাস গলায় সে কথা বললে, তাতে মনে হল না-বেঁচে থাকারই সম্ভাবনা বেশি। তারপর তাঁরা তিনজনে সামনের দেকে এগিয়ে এলেন। স্পিলেট নাড়ি দেখতে জানতেন। ক্যাপ্টেনের একটি হাত

নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলেন তিনি। কিন্তু নাড়ি দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তখন স্পিলেট নাকের কাছে হাত দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ বাদে মনে হল, যেন খুব ধীরে-ধীরে নিশ্বাস পড়ছে। স্পিলেটের মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল : এখনও ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দেহে প্রাণ আছে! চেষ্টা করলে এ-যাত্রা তিনি বেঁচে উঠতেও পারেন!

শুনে নেবের শরীরে যেন বিদ্যুৎশিহরন খেলে গেল। পলকের মেধ্যে উঠে দাঁড়ালো সে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, এখনও বেঁচে আছেন! বলুন–কী করলে ওঁর জ্ঞান ফিরবে।

পুবদিক তখন বেশ ফরসা হয়ে উঠেছে। হাওয়ার এলোমেলো ঝাপটাও আর নেই বললেই চলে।

একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে স্পিলেট বললেন, অত ব্যস্ত হোয়ো না, নেব। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমরা যখন এসে পড়েছি, তখন ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে বাঁচিয়ে তুলবোই। প্রথমে ক্যাপ্টেনের ঠাণ্ডা হাত-পাগুলোকে সেঁক দিয়ে গরম করতে হবে।

কিন্তু সেঁক দেয়া হবে কী করে? উদগ্রীব স্বরে পেনক্র্যাফট জিজ্ঞাসা করলে, এই গুহায় তো আগুনও নেই, অন্যকিছুও নেই!

নেব্ তক্ষুনি বললে, আমি সেই গুহায় গিয়ে এক্ষুনি আগুন নিয়ে আসছি। একটু অপেক্ষা করুন আপনারা।

হার্বার্ট নেবকে বাধা দিলে। বললে, তোমার কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি, নেব। তোমায় আর কষ্ট করতে হবে না। যা-কিছু আনবার আমিই আনছি।

নেব প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু স্পিলেট তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হার্বার্ট ঠিকই বলেছে, নেব। তোমার এখন কিছু করবার দরকার নেই। তারপর হার্বার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সেই গুহা থেকে একটু আগুন আর কিছু খাবার নিয়ে এসো।

হার্বার্ট দ্রুতপদে বের হয়ে গেল। নেব বললে, আমি তবে কিছু কাঠকুটো জোগাড় করে আনি। আগুন জ্বালাতে হবে তো।

তার উৎসাহে আর বাধা দিতে চাইলেন না স্পিলেট। নেবও তখনি বের হয়ে পড়ল। পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট তখন হার্ডিং-এর প্রাথমিক পরিচর্যায় লেগে গেলেন।

আগুন আর খাবার নিয়ে ফিরতে হার্বার্টের ঘণ্টা-দেড়েকের বেশি সময় লাগল না। অন্ধকার দুর্যোগের রাতে পথ চলতে যত সময় লেগেছিল, এবার তার থেকে ঢের কম সময় লাগল। নেব ইতিমধ্যে বাইরে থেকে কিছু ডালপালা জোগাড় করে এনেছিল। কিন্তু সেগুলো ভিজে থাকায় আগুন জ্বালাতে বেশ কষ্ট হল। পেনক্র্যাফটের পকেটে বেশ বড়ো একটা রুমাল ছিল, সেঁক দেবার জন্যে আগুনের আঁচে সেটাকে গরম করতে-করতে সে জিজ্ঞাসা করলে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং-এর দেখা তুমি কেমন করে পেলে, নেব?

নেবের অস্থিরতা তখন বেশ কমেছে। পেনক্র্যাফটের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, আমি তো সেই রাত্তিরেই আপনার কাছ থেকে পালিয়ে আসি। সারাক্ষণ ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছি চারদিক। শেষে এইখানে এসে দেখি টপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। টপকে

দেখেই আমার ভারি আনন্দ হল। ভাবলুম, তাহলে ক্যাপ্টেনও নিশ্চয়ই এখানে আছেন। তার সন্ধানে আমি তখন এদিক-সেদিকে তাকাতে লাগলাম।

তারপর? টপ আমাকে দেখেই ঘেউ-ঘেউ করে চীৎকার করে আমার কাছে দৌড়ে এলো। নেব বলে চলল, আমি প্রশ্ন করলুম, ক্যাপ্টেন কোথায়, টপ? টপ আমার কথা শুনে চঞ্চল হয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগল। শেষটায় আমার পোশাক কামড়ে ধরে এই পাহাড়টায় উঠতে লাগল সে। এই গুহাটার মধ্যে যখন সে আমাকে টেনে নিয়ে এল, তখন দেখি ক্যাপ্টেন এই অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। আমার মনের যে তখন কী অবস্থা তা আপনাদের আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমার মনে হল, উনি বোধহয় আর বেঁচে নেই। সেই থেকে আমি ঠায় এখানে বসে আছি। একবার টপকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম, যদি আপনাদের খুঁজে আনতে পারে। টপ আমাদের শেখানো কুকুর, ও ঠিক আপনাদের এনে হাজির করেছে।

তখনও সমানভাবে সেঁক দেয়া চলছিল। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকিয়ে সবাই চুপচাপ বসে রইলেন। এমনিভাবে আরো-খানিকক্ষণ কেটে গেল। তারপর মনে হল, ক্যাপ্টেনের জীবনীশক্তি যেন একটু-একটু করে ফিরে আসছে। আস্তে-আস্তে তার দেহে স্পন্দন এল।

ক্যাপ্টেনের একটি হাত ধীরে-ধীরে একবার একটুখানি উঠেই আবার পড়ে গেল।

এই দেখে নেব আনন্দে বলে উঠল, এবার তাহলে ক্যাপ্টেন ভালো হয়ে উঠবেন!

আমারও তাই মনে হচ্ছে। স্পিলেট বললেন, একটা মস্ত সোয়াস্তির ব্যাপার হল, ক্যাপ্টেনের শরীরে জ্বর নেই। এর উপর যদি জ্বর থাকতো তাহলে আর রক্ষা ছিল না।

বোধহয় আকস্মিক কোনো-একটা আঘাতে ক্যাপ্টেন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, তারপর শুশ্রূষার অভাবে আর অনাহারে আর জ্ঞান ফেরেনি।

পেনক্র্যাফট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে : আমারও তা-ই মনে হয়। কিন্তু গুহার ভিতরে তিনি এলেন কী করে? এখানে এসে নিশ্চয়ই তিনি আঘাত পাননি, যা-কিছু চোট তা হায় আসার আগেই পেয়েছেন।

স্পিলেট তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। শুধু বললেন, সে-সব কথা ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরলেই জানতে পারবো।

নিঃশব্দে আরো ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। ক্যাপ্টেনের শরীর মাঝে-মাঝে নড়ে উঠতে লাগল। অসংলগ্নভাবে দু-একটা কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরুল। একবার আচ্ছন্নভাবেই তিনি অনতিস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলেন, নেব কি এখানে আছো?

আমায় ডেকেছেন, ক্যাপ্টেন আমায় ডেকেছেন! বলতে-বলতে আনন্দে ছুটে এলো নেব। হার্ডিং-এর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে, হ্যাঁ আমি আপনার কাছেই আছি, ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন নেবের কথা বুঝতে পারলেন কি না বোঝা গেল না। আবার ক্ষীণ স্বরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, অন্ধকার রাত্রিবেলুন যে নিচে পড়ে যাচ্ছে-নিচে যে সীমাহীন সাগর!

আবার একটু পরেই শোনা গেল : কিন্তু বাঁচবার কি কোনো উপায় নেই? স্পিলেট ইশারায় হার্বার্টকে বললেন, পাখির ডিমগুলো আগুনে পুড়িয়ে নাও, হার্বার্ট। ক্যাপ্টেনকে খেতে দিতে হবে।

তাঁর কথামতো ডিমগুলো একে-একে আগুনের আঁচে ঝলসে নেয়া হল। পেনক্র্যাফট বললে, নেব, এইবার তুমি কিছু খেয়ে নাও, অনেকক্ষণ তোমার কিছু খাওয়া হয়নি।

আগে ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে আসুক নেবের প্রতিবাদ শোনা গেল, তিনি আহার করুন, তারপর আমি খাবো।

তার কোনো দরকার নেই, নেব। স্পিলেট বললেন, ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ক্রমেই ফিরে আসছে। আর-কোনো ভয়ের কারণ নেই। তুমি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু খেয়ে নাও।

নেব আর দ্বিরুক্তি না-করে আহার করতে লাগল।

হার্ডিং পাশ ফিরে শুলেন। স্পিলেট তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ধীর স্বরে ডাকলেন, ক্যাপ্টেন।

ক্ষীণ কণ্ঠে হার্ডিং উত্তর করলেন, কী? আপনি এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন কি? সামান্য সুস্থ হয়েছি বটে, তবে বড় দুর্বল বোধ করছি।

দুটো ডিম তার কাছে নিয়ে গিয়ে স্পিলেট আবার বললেন, ডিমদুটো খেয়ে নিন, তাহলে অনেকটা শক্তি ফিরে পাবেন। আপনি হাঁ করুন, আমি খাইয়ে দিচ্ছি।

ক্যাপ্টেন হ্যাঁ করলেন। স্পিলেট একটু-একটু করে তাঁকে খাওয়াতে লাগলেন।

ক্যাপ্টেনের খাওয়া শেষ হলে পর বাকি ডিমগুলো অন্য-সবাই খেয়ে নিলেন। গুহার বাইরে, পাহাড়ের উপর পাথরের কোলে-কোলে গতরাত্রির বৃষ্টির পরিষ্কার জল জমে ছিল। সবাই সেই জলই খেলেন।

দুপুরবেলার দিকে ক্যাপ্টেন হার্ডিং উঠে বসতে পারলেন। হার্বার্ট শুধোলে, বেলুন থেকে পড়বার পর কী-কী ঘটেছে, তা আপনি বলতে পারবেন কি?

হ্যাঁ। এবার আমি কথা বলতে পারবো। হার্ডিং একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বলতে লাগলেন :

বেলুনটা যখন সমুদ্রে পড়ল, তখন আমি ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লাম। পরমুহূর্তেই আর-একটা কী যেন আমার কাছে এসে পড়ল! আমার তখন বুঝতে দেরি হল না যে, আমার মতন আর-একজন কেউ নিশ্চয়ই এসে পড়েছে। কিন্তু কে যে পড়ল, অন্ধকারে তা বুঝতে পারলুম না। অনেক চেষ্টা করে সাঁতার দিয়ে শরীরটাকে জলের উপর ভাসিয়ে শুধোলুম, কে জলে পড়েছো? কিন্তু কোনো জবাব পেলুম না। তার একটু পরে সামনেই সাঁতার কাটার আওয়াজ শুনতে পেলুম। আবার জিজ্ঞাসা করলুম, কে? তখন ঘেউ ঘেউ করে একটা শব্দ হল। স্পষ্টই বুঝতে পারলম, টপ লাফিয়ে পড়ে আমাকে অনুসরণ করছে। আবার আমি যথাসাধ্য বেগে সাঁতার কাটতে লাগলুম।

একটু থামলেন হার্ডিং। দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পড়ে ক্রমশই আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। যদিও আমার

জ্ঞান তখনও বিলুপ্ত হয়নি, তবু কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব আমায় দখল করে নিয়েছিল। আর সাঁতার কাটতে পারছি না, ক্রমেই তলায় ডুবে যাচ্ছি, এমন সময় টপ আমার পোশাক কামড়ে ধরল। তারপর খুব নিপুণভাবে সাঁতার কাটতে-কাটতে আমাকে টেনে নিয়ে চলল।

নেব বললে, তাহলে এই উপই আপনাকে রক্ষা করেছে!

ক্যাপ্টেন হার্ডিং বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু জানেনা, তখন আমার ভারি হাসি পেয়েছিল। ভেবেছিলুম, টপের শক্তি আর কতটুকু! কতক্ষণ আর সে আমায় এই সীমাহারা সমুদ্রে টেনে নিয়ে যাবে! কিন্তু পরমুহূর্তেই পায়ের তলায় ঠেকল মাটি। মাটি! হতাশার হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আর টপের সাহায্যে আমার পায়ের তলায় মাটি ঠেকেছে। এখন বুঝতে পারছি, রাত্রিবেলা কুকুরদের দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হয় বলে কাছের এই ডাঙার সন্ধান আগেই পেয়েছিল টপ। কোনোরকমে অতি কষ্টে টপকে কোলে নিয়ে আমি উপরে উঠে এলুম। তখন আর আমার দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। ডাঙায় উঠেই আমি চেতনা হারিয়ে পড়েছিলাম। তোমাদের চেষ্টায় এই একটু আগে জ্ঞান ফিরেছে।

আশ্চর্য! অবাক হয়ে প্রশ্ন করল পেনক্র্যাফট, আপনি তবে এই গুহায় এলেন কী করে? টপ কি আপনাকে কামড়ে টেনে এনেছে নাকি?

কেন? হার্ডিংকেও অবাক দেখালো : তোমরা কি এখানে নিয়ে আসোনি আমায়!

না। এই গুহাতে এসেই তো আমরা আপনার দেখা পাই। এর আগে নেবও তো আপনাকে এই গুহাতেই দেখছে।

কী আশ্চর্য! সবিস্ময়ে কাপ্টেন বললেন, তবে আমায় এখানে আনলে কে? টপ নিশ্চয়ই আনেনি। তবে কি আমি নিজেই উঠে এসেছি? কিন্তু তা-ই বা এলুম কখন?

ভারি আশ্চর্য তো! কোনো লোকজন এখানে বাস করে কি?

স্পিলেট ঘাড় নাড়লেন।না, অন্তত আমরা তো কাউকেই দেখতে পাইনি। আর যতদূর দেখছি তাতে মনে হয়, এটা একটা জনমানবশূন্য দ্বীপ।

উত্তেজনায় ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর শরীরে তখন যেন যৌবন ফিরে এসেছে। তাড়াতাড়ি তিনি গুহার বাইরে বেরিয়ে এলেন। অন্যরাও তার অনুসরণ করলে। বাইরে এসে হার্ডিং পাহাড় থেকে নিচে নামলেন। তারপর নিচু হয়ে মাটির উপর কীসের দাগ। লক্ষ করতে লাগলেন।

খানিক লক্ষ করে হার্ডিং সকলের পায়ের দিকে তাকালেন। আরে! সকলের পায়েই তো জুতো আছে? তাহলে এই খালি পায়ের ছাপ এখানে এলো কী করে? বলে তিনি মাটির দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখতে পেলে ভিজে মাটিতে খালি-পায়ের একাধিক দাগ।

হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল : এই দ্বীপ মোটেই জনশূন্য নয়। এই দ্বীপে নিশ্চয়ই মানুষ আছে। অন্তত এমন-একজন মানুষ আছে, যে আমাকে সমুদ্রের ধার থেকে তুলে এনে এই গুহায় রেখে দিয়ে গেছে। কিন্তু কে সে? সে কি এই দ্বীপের কোনো বুনো অধিবাসীদের একজন? না, প্রশান্ত মহাসাগরের নির্জন দ্বীপে যে-সব বোম্বেটের আস্তানা আছে সেই বোম্বেটেদের দলের লোক? কিন্তু তাদের যে মানুষের প্রতি বিশেষ দয়া আছে তা তো মনে হয় না। তবে কে সেই লোক, যে আমাকে এই গুহায় নিয়ে এলো? কে?

কে? সমস্বরে সবাই এই প্রশ্নই করলেন।

কিন্তু সঠিক কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

নিঃশব্দে, একটিও কথা না-বলে, সবাই তাড়াতাড়ি আবার গুহাটায় ফিরে এলেন।

.

১.৫ আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার

যদিও সাইরাস হার্ডিং উঠে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন, তবু তাঁর সুস্থ হতে পুরো একটা দিন লাগল।

সেইজন্যে সে-রাত্রে আর আগের গুহায়, অর্থাৎ চিমনিতে না-গিয়ে তারা সেই গুহাতেই কাটিয়ে দিলেন। নেব আর পেনক্র্যাফট একবার মাত্র বনে গিয়ে আহারের জন্যে

কয়েকটা পাখি মেরে আনলে। একদিন শুধু ডিম আর ঝিনুক খেয়ে থাকবার পর মাংস খেতে পেয়ে সবাই খুশি হয়ে উঠলেন।

পরদিন ভোরবেলায় ক্যাপ্টেনকে সঙ্গে নিয়ে সবাই চিমনিতে ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসে একটা ব্যাপার দেখে তাদের চোখ মাথায় উঠল। গুহার জ্বালানো আগুন নিভে গেছে। এককণা জুলন্ত অঙ্গর পাওয়ার জন্যে তারা ছাই তুলতে লাগলেন। কিন্তু বৃথাই শুধু হয়রানই হতে হল–আগুন একেবারেই নিভে গেছে।

যে-গুহা তারা এইমাত্র ছেড়ে এসেছেন, সেই গুহাতেও তারা আগুন রেখে আসেননি।

সবচেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল পেনক্র্যাফট। বললে সর্বনাশ! এখন আমাদের উপায় কী হবে? এইবার কাঁচা মাংস বা ডিম ছাড়া আর আমাদের বরাতে ঝলসানো মাংস বা ডিম জুটবে না! রাত্তিরে একটু আলোর দরকার হলেই বা পাবো কোথায়?

স্পিলেট জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কাছে কি দেশলাই আছে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?

না। হার্ডিং জবাব দিলেন, আমি সিগারেট খাইনে বলে ও-সব জিনিশ কাছে রাখার দরকার হয় না। আর যদিই-বা আমার কাছে থাকতো, তাহলেও জলে পড়ে গিয়ে ভিজে নষ্ট হয়ে যেতো।

পেনক্র্যাফট চিন্তিত হয়ে পড়ল। শুধু কেবল আগুনের অভাবে এই জনমানবহীন দ্বীপে বেঁচে থাকা যে অসম্ভব, তা সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে। তার আর দুশ্চিন্তার সীমা রইল না।

নেব তার কানে-কানে বললে, আপনি খামকা এত ভাববেন না! ক্যাপ্টেন যখন আমাদের কাছে আছেন, তখন এর একটা উপায় তিনি করবেনই।

হার্ডিং বললেন, এসো আমরা এখন ওই পাহাড়টার উপর উঠে দেখি, এটা কোনো দ্বীপ না মহাদেশের কোনো অংশ। যদি এটা দ্বীপই হয়, তাহলেও এই দ্বীপটা কত বড়ো, তা আমাদের জানা দরকার। কেননা, বাধ্য হয়ে যখন এখানে আমাদের অন্তত কিছুদিনের জন্যেও থাকতে হচ্ছে, তখন এর আয়তনটাও আমাদের জেনে রাখা ভালো।

সবাই আস্তে-আস্তে পাহাড়টার উপর উঠতে লাগলেন। স্পিলেটের হাতে রিস্টওয়াচ ছিল। পাহাড়ে ওঠা শেষ হলে পর তিনি ঘড়ি দেখে জানালেন, বেলা বারোটা বেজেছে।

উপরে উঠে ভালো করে চারধার অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে ক্যাপ্টেন বললেন, এটা দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের একাংশ, সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। পাহাড়টা বড্ড ছোটো। একটা বড়ো পাহাড়ে উঠে আমাদের ভালো করে অনুসন্ধান করতে হবে। তবে এটা যদি দ্বীপই হয়, তবে নেহাৎ ছোটো দ্বীপ নয়, লম্বায় বোধহয় বিশ মাইলের মতন হবে।

পেনক্র্যাফট আগুনের ভাবনায় আর খিদেয় ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। তার নীল কামিজে হাত ঘসতে ঘসতে সে বললে, এটা দ্বীপই হোক, আর মহাদেশই হোক—বড়ো হোক কিংবা ছোটোই হোক–আজ থেকে না-খেয়ে মরতে হবে আমাদের। আপনি সে, বিষয়ে কিছু ভাবছেন কি, ক্যাপ্টেন হার্ডিং?

ক্যাপ্টেন হার্ডিং শুধু একটু হাসলেন। বললেন, পাখির মাংস জোগাড় করে আনতেই যা দেরি, নইলে আগুনের আর ভাবনা কী?

বিস্ময়ে পেনক্র্যাফটের চোখদুটি গোল হয়ে উঠল : কী বলছেন আপনি! পাখির মাংস জোগাড় করে আনতেই যা দেরি—আর আগুনের জন্যে ভাবনা নেই? কিন্তু আগুন আপনি পাচ্ছেন কোথায়?

তার হাবভাব আর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলেন। হার্ডিংও তার দুর্ভাবনা দেখে না-হেসে পারলেন না। বললেন, পেনক্র্যাফট, তুমি পাখির মাংস জোগাড় করে আনো, আগুন জ্বালাবার ভার আমার উপর রইল।

এবার পেনক্র্যাফটের বিস্ময় অনেকটা কমে এল। বললে দুটো কাঠকে ঘসে আগুন জ্বালাবার কথা বোধহয় আপনি বলছেন, ক্যাপ্টেন? তাতে কিন্তু কোনো কাজই হয় না। আমি একটা অ্যাডভেনচারের বইতে ওই কথা পড়েছিলুম বটে, কিন্তু সে-কাঠ নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো এক ধরনের কাঠ। কেননা, দুঃখের সঙ্গে আমি আপনাকে জানাচ্ছি যে, এতদিন এক ঘণ্টা ধরে আমি দুটো কাঠ ঘসে একটুও আগুনের ফুলকি পর্যন্ত বার করতে পারিনি, আগুন তো দূরের কথা!

এই কথা বলে পেনক্র্যাফট ভেবেছিল এবার বোধহয় ক্যাপ্টেন দমে যাবেন, কিন্তু তিনি মোটেই দমলেন না। তার রকম-সকম দেখে আবার একটু হেসে হার্ডিং বললেন, কিন্তু। আমি আগেই তোমাকে বলেছি পেনক্র্যাফট, সে-ভার আমার, তোমার নয়। মাংস জোগাড় করতেই তোমার যা দেরি হচ্ছে। তুমি বরং একটু তাড়াতাড়ি যাও।

আর-একটি কথা না-বলে পেনক্র্যাফট বেরিয়ে পড়্লো। হাবার্ট আর নেবুও শিকারের লোভে তার অনুসরণ করলে। খানিকটা দূরে এগিয়ে তারা পিছন ফিরে দেখে, টপও লাফাতেলাফাতে তাদের সঙ্গে আসছে।

পাহাড় থেকে একটু দূরেই যে-অরণ্য ছিল, তারা তিনজনে সেই অরণ্যে শিকার করতে চলল। অবস্থা অবিশ্যি অনেকটা ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতন। হাতে কোনো অস্ত্র নেই, হাতিয়ার নেই, অথচ শিকারীরা শিকার করতে চলেছে। পেনক্র্যাফট একটা গাছের কয়েকটা সরু ডাল ভেঙে নিলে। কোনো পাখি বা জানোয়ার সামনে পড়লে এই ডাল দিয়ে আঘাত করেই মারতে হবে। হার্বার্ট আর নেবের হাতেও সে এক-একটা ডাল তুলে দিলে।

অরণ্য এত নিবিড়, এত অন্ধকার যে তার ভিতরে প্রবেশ করাই রীতিমতো অ্যাডভেনচার। নেব গাছের ডাল হাতে নিয়ে লতাপাতা প্রভৃতির উপর ঘা মেরে দু-হাতে পাতা সরিয়ে পথ করে চলতে লাগল, আর অন্য দুজন তার পিছনে-পিছনে চলল। এইভাবে বেশ খানিকটা এবার পর অরণ্য একটু পাৎলা হয়ে এলো। অরণ্যের অন্ধকারও ঈষৎ ফিকে হয়ে এলো। শিকারের সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকালো সবাই। কিন্তু একটা জানোয়ারও দেখা গেল না।

হার্বার্ট বললে, বনের ভিতর এসেও শিকার জুটল না আমাদের বরাতে। কিন্তু আর বেশিদূর এগিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক। এই দ্বীপে যদি অসভ্য বুনো অধিবাসীরা থাকে, তাহলে হয়তো আমাদের ধরে নিয়ে যাবে। আজও না-হয় আমরা ডিম আর ঝিনুক খেয়েই থাকবো।

ঘাড় নেড়ে উঠল পেনক্র্যাফট না হার্বার্ট, আজ শুধু-হাতে ফিরলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং আগুন নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবেন, আর আমরা শুধু হাতে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াবো? অসভ্য বুনোদের ভয় যদি থাকে, তোমরা ফিরে যাও। আমি আজকে কিছু একটা শিকার না-করে ফিরছি না।

হার্বার্টের বড়ো অভিমান হল। সেও কি তাই বলতে চাইছে না? বুনোদের ভয়ে সে তার আশ্রয়দাতাকে ছেড়ে চলে যাবে-সে কি এতই কাপুরুষ! কোন কথা না-বলে সে চুপ করে রইল।

এমন সময় কয়েকটা গাছপালার আড়ালে একটা হুটোপাটির আওয়াজ শোনা গেল। ব্যাপার কী দেখবার জন্যে গাছের ডাল সরিয়ে তিনজনেই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু ব্যাপার দেখে তারা না-হেসে থাকতে পারল না। টপ একটা খরগোশের পা সাংঘাতিকভাবে কামড়ে ধরেছে, আর খরগোশটা টপের কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। নেব তখন তার হাতের ডালটার আঘাতে খরগোশটাকে মারলে।

পেনক্র্যাফট ভারি খুশি হয়ে উঠল। যাক, এবার আমাদের কাজ শেষ হয়েছে, এখন চলো ফিরে যাই সবাই। আমি কিন্তু তোমায় বলে রাখছি, হার্বার্ট, ক্যাপ্টেন হার্ডিং কোনোমতেই আগুন জোগাড় করতে পারবেন না। তাকে আজ হার মানতেই হবে।

নেব তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে উঠল : আমিও বলে রাখছি আপনাকে, ক্যাপ্টেন কখনোই হারবেন না।

আচ্ছা, দেখা যাক। বলে তিনজনে ফেরার পথ ধরলে। নেব খরগোশটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিলে। তিনজনে দ্রুতপদে ওহার দিকে পা চালাতে লাগল।

খানিক এগিয়েই বড়ো একটা হ্রদ চোখে পড়ল সকলের। এই হ্রদটা লম্বায় প্রায় এক মাইল, চওড়ায় সিকি মাইলের মতো হবে। স্পিলেট প্রথম দিন এই হ্রদ থেকেই জল নিয়ে গিয়েছিলেন।

গুহার কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, গুহার মুখ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আগুন ছাড়া ধোঁয়া ওঠে কোত্থেকে? পেনক্র্যাফট হতভম্ব হয়ে গেল। বিস্মিত হয়ে বললে, তাই তো হে, হার্বার্ট, ধোঁয়া ওঠে কোত্থেকে বলে দিকিনি।

ধোঁয়া যে কোথকে উঠছে, তা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না। সাইরাস হার্ডিং যে আগুন জ্বালাতে পেরেছেন, তা সকলেই বুঝতে পারলে। গুহায় আসতেই দেখা গেল বড়ো একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত হয়েছে।

ওদের দেখে হার্ডিং হাসতে হাসতে বললেন, এই যে, তোমরা এসে গেছ? আমি সেই কখন থেকে আগুন জ্বালিয়ে তোমাদের জন্যে বসে আছি।

পেনক্র্যাফট কথা বলবে কি, বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। আগুন জালানোর কোনো উপকরণ না-থাকলেও যে আগুন জ্বালানো সম্ভব হয়েছে, একে ভুতুড়ে ব্যাপার ছাড়া আর কী বলা যায়? একটু বাদে নিজেকে খানিকটা সামলে সে বললে, আপনি কি জাদু জানেন, ক্যাপ্টেন?

হো-হো করে হেসে উঠলেন হার্ডিং : জাদু? ম্যাজিক? না পেনক্র্যাফট, ম্যাজিক আমি কোনোকালেই শিখিনি। তবে ম্যাজিকের চেয়েও আশ্চর্য-কিছু করা যায়, এমন ধরনের কতগুলো বিজ্ঞানের বই এককালে পড়েছিলুম।

কী করে আগুন জ্বালালেন আপনি? বিস্মিত পেনক্র্যাফট প্রশ্ন করলে।

হার্ডিং উত্তর করলেন, কেন? আগুন জ্বালানো আর একটা বেশি কী? মিস্টার স্পিলেটের আর আমার রিস্টওয়াচের কাচদুটো খুলে নিয়ে, ওই কাচদুটোকে দু-পাশের ঢাকনির মতো করে পাঁক দিয়ে তার ধারগুলো বন্ধ করে দিলুম। তখন দেখতে হলে ঠিক একটা কৌটোর মতো। তখন একপাশ দিয়ে তার ভিতর জল পুরে দিয়ে সেই মুখটাও বন্ধ করে দিলাম। তারপর সেই কাচের উপর সূর্যরশ্মি ফেলে কতগুলো শুকনো পাতার উপর সেই রশ্মি প্রতিফলিত করতেই একটু পরে সেই পাতাগুলো জ্বলে উঠল।

পেনক্র্যাফট এতক্ষণ চোখ গোল করে তার কথা শুনছিল। এবার তার মনে হল, ক্যাপ্টেনের প্রতিভা সত্যিই সাধারণ নয়, তার কাছে যা-কিছু চাওয়া যাবে তা-ই পাওয়া যাবে। তাই সাহসে ভর করে সে বললে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আপনার কাছে আমার আরো-একটা প্রার্থনা আছে। আপনি আপনার অসাধারণ প্রতিভার জোরে যেখান থেকে হোক একটা ছুরি আমাকে দিন, খরগোশের মাংস কাটতে সুবিধে হবে।

বিব্রতভাবে চারদিকে তাকালেন হার্ডিং। বললেন, ছুরি! ছুরি আবার এখানে আমি পাবো কোথায়? আমাদের কারু কাছেই তো একটাও ছুরি নেই!

কিন্তু পেনক্র্যাফটের সাহস বেড়ে গিয়েছিল। তার মনে হল, হার্ডিং-এর কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। যিনি বিনা আগুনে আগুন জ্বালান তার কাছে মাংস কাটবার জন্যে একটা ছুরি পাওয়া এমন-কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। সে বললে, কিন্তু আপনি একটু মাথা খাটালেই

একটা ছুরি হয়তো পাওয়া যায়।

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন হার্ডিং। তারপর বললেন, আচ্ছা, দেখছি। কাজ-চালানোগোছের একটা ছুরি পেলেই তো তোমার চলবে?

পেনক্র্যাফট ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে।

সাইরাস হার্ডিং টপকে কাছে ডাকলেন। তার গলায় লোহার যে-পাৎলা পাতটা পরানো ছিল, তা খুলে নিয়ে ভেঙে দু-টুকরো করলেন। তারপর পেনক্র্যাফটের দিকে পাতদুটো বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই নাও তোমার ছুরি–একটা নয়, দুটো। পাথরে ঘষে একটু ধার দিয়ে নিলেই তোমার কাজ-চলার মতন চমৎকার ছুরি তৈরি হয়ে যাবে।

পেনক্র্যাফট তো আনন্দে লাফ দিয়ে উঠল প্রায়। উত্তেজিত স্বরে বললে, ক্যাপ্টেন, আপনার মাথায় কী বুদ্ধিই খেলে! এইসব সহজ-সহজ জিনিশগুলো পর্যন্ত আমার মাথায় আসে না। আমি একটা রীতিমতো গর্দভ!

যাক সাংবাদিক হাসতে হাসতে বললেন, তাহলে এবার তোমার আত্মজ্ঞান হবার পর থেকে ক্যাপ্টেনের সব কথাই তোমার বিশ্বাস হবে তো, পেনক্র্যাফট?

নিশ্চয়ই বলে পেনক্র্যাফট লোহার পাতদুটোয় ধার দিতে লাগল।

নেব এসে, কানে-কানে বললে, ক্যাপ্টেনের ক্ষমতা অদ্ভুত কি না, এখন প্রমাণ হল তো?

পেনক্র্যাফট বললে, ক্যাপ্টেন যে এত-বড়ো প্রতিভাবান, না-দেখলে তা কী করে জানবো, বলো?

খরগোশের মাংস দিয়ে সেদিন তো তাদের রীতিমতো একটা ভোজ হয়ে গেল।

বলবার মতো কোনোকিছু সে-দিন আর ঘটল না। কিন্তু পরদিন একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই হার্ডিং পেনক্র্যাফটকে বললেন, আজ আর তোমার শিকারে গিয়ে কাজ নেই, পেনক্র্যাফট। পাখির ডিম আর ঝিনুক খেয়েই আজ আমাদের বেশ চলে যাবে। শিকার করতে গেলে মাঝখান থেকে খানিকটা দেরি হয়ে যাবে, কিন্তু আজ আমাদের কোথাও অযথা সময় নষ্ট করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একবার চারধারে ঘুরে দেখতে হবে।

হার্বার্ট বললে, কিন্তু কিছু মাংস খেতে পেলে ভালো হত। ডিম আর ঝিনুক অনেকগুলো খেলেও আমার পেট ভরে না।

হার্ডিং একটু হাসলেন। বললেন, কী আর করা যাবে বলো। কোনো উপায় তো নেই। যদ্দিন আমরা এখানে থাকবো তার কোনোদিন জুটবে খরগোশের মাংস, আর কোনোদিন পাবো শুধু পাখির ডিম আর সামুদ্রিক ঝিনুক।

কিন্তু কতদিন আমাদের এখানে থাকতে হবে?

নির্বিকারভাবে হার্ডিং উত্তর করলেন, যতদিন-না আমরা কোনো উপায় ঠিক করতে পারি। দুর্ভাগ্য আমাদের যেখানে টেনে এনেছে, যতদূর মনে হচ্ছে সেটা একটা দ্বীপ। এই দ্বীপের চারপাশে সীমাহারা নীল নির্জন প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ। কে জানে, একশো মাইলের ভিতরে, আর-কোনো দ্বীপ বা মহাদেশ আছে কি না!

হার্বার্ট হতাশ হয়ে বললে, ঈশ্বর জানেন, এই দ্বীপ থেকে কখনও মুক্তি পাবো কি। আর কখনও মুক্তি পাবে বলে তো আমার মনে হয় না।

মুক্তি আবার আমরা পেতে পারি–হার্ডিং উৎসাহ দেবার চেষ্টা করলেন, যেমনভাবে আমরা এই দ্বীপে এসে পড়েছি, তেমনি অপ্রত্যাশিত কিছু যদি ঘটে।

পেনক্র্যাফট বললে, সে-রকম অসম্ভব–কিছু ঘটবার সম্ভবনাই বা কোথায়? কোনো যাত্রী বা মালবাহী জাহাজ বোধহয় এই দ্বীপের কয়েকশো মাইলের মধ্য দিয়েও যাওয়া-আসা করে না।

হার্ডিং বললেন, কিন্তু যখন অসম্ভব কিছু ঘটে, তখন তার আভাস আগে থেকে পাওয়া যায় না, সেটা আকস্মিকই হয়।

www.bengaliebook.com

নেব এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এইবার বললে, এই দ্বীপটায় আর যত অসুবিধেই থাক, এখানে হিংস্র জানোয়ার কিংবা জংলিদের হাতে প্রাণ দেবার কোনো ভয় নেই।

হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললেন, কোনো ভয় নেই, এ-কথা তোমায় কে বললে, নেব? প্রশান্ত মহাসাগরের এইসব অজানা ছোটো-ছোটো দ্বীপ কত ভয়ংকর হয়, তা জানো? মালয় বোম্বেটের দল জাহাজ লুঠতরাজ করে এ-সব দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। তারা বুনো জানোয়ার বা নরখাদক জংলিদের চেয়ে কম ভয়ংকর নয়।

এ-কথা শুনে সকলের মুখই গম্ভীর হয়ে উঠল। হার্ডিং আবার বললেন, কে বলতে পারে যে আমাদের এই দ্বীপটাই বোম্বেটেদের একটা ঘাঁটি নয়?

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন সবাই। তারপর ধীর স্বরে পেনক্র্যাফট বললে, তাহলে এই দ্বীপে নেমে অব্দি এখনও যে কোনো বোম্বেটে দলের সামনাসামনি পড়িনি, এটাকে সৌভাগ্যই বলতে হবে।

নিশ্চয়ই। হার্ডিং বললেন, আর এসব দ্বীপে আস্তানা তৈরি করাই তাদের তরফে সবচেয়ে সুবিধের। প্রশান্ত মহাসাগরের এ-সব ছোটো-ছোটো দ্বীপ বাইরের দুনিয়ার অজ্ঞাত। কবে যে অকস্মাৎ এই দ্বীপগুলোর সৃষ্টি হচ্ছে আর কবে যে এগুলো আবার আকস্মিকভাবে জলের তলায় মিলিয়ে যাচ্ছে, তা কেউ জানে না।

একরাশ আতঙ্ক ঝরে পড়ল নেবের গলা থেকে : দ্বীপ আবার জলের তলায় মিলিয়ে যায় নাকি, ক্যাপ্টেন? তাহলে আমাদেরও একদিন এই দ্বীপের সঙ্গে জলের তলায় যেতে হবে।

তার আতঙ্ক দেখে হাডিং না-হেসে পারলেন না। নেবুকে আশ্বস্ত করে বললেন, না নেব, সম্প্রতি তোমার জলে ডোববার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তবে, আমার কথায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের ধারণা, শুধু ছোটোখাটো দ্বীপ কেন, বড়ো-বড়ো মহাদেশগুলোরও জন্ম রয়েছে এমনিভাবে জলের থেকে ভূত্বকের আলোড়নের দরুন। আবার হয়তো একদিন সেগুলোও এই জলের তলায় মিলিয়ে যাবে।

হতবুদ্ধি হয়ে নেব শুধু বলে উঠল, কী ভয়ংকর কথা!

হার্ডিং বলে চললেন, ভূমিকম্পের দরুন প্রায়ই তো কত জায়গা মাটির তলায় বসে যায় কিংবা জলের তলায় মিলিয়ে যায়। আবার ভূমিকম্পে হয়তো হঠাৎ-একদিন জলের উপর নতুন দ্বীপের সৃষ্টি হয়। এই-যে আফ্রিকার প্রকাণ্ড শাহারা মরুভূমি-অনেকেরই ধারণা একদিন ওটা ছিল একটা সাগর। তারপর সংঘাতিক একটা ভূমিকম্পে একদিন সেই সাগর স্থানচ্যুত হয়ে গেছে, আর জলের তলা থেকে বালি উঠে এসেছে। আগে সাগর ছিল বলেই তো শাহারা মরুভূমিতে অত বালি!

কথায়-কথায় বেলা বেড়ে উঠেছে দেখে সবাই তখন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কয়েকটা পাখির ডিম আর সামুদ্রিক ঝিনুক জোগাড় করতে খুব বেশি দেরি

হল না। সেগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে আহার করতে-করতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে সবাই বেড়াতে বেরুলেন। টপও সঙ্গে চলল।

কখনও-বা ছোটো-বড়ো পাহাড়ের উপর দিয়ে কখনও-বা পাহাড়ের পাশ দিয়ে তারা চলতে লাগলেন। পাহাড়গুলো গ্র্যানাইট পাথরের, তার চারদিকে ইতস্তত কত গ্র্যানাইট ছড়িয়ে আছে। যেখানে পাহাড় নেই, সেখানে গাছ-গাছালির ভিড়। পাহাড়ের উপর নানান জাতের পাখি দেখা গেল।

অনেক ঘোরাঘুরি করে এক অজানা পথ দিয়ে তখন সকলে প্রায় বনের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় নেবের চীৎকারে সবাই থমকে দাঁড়ালেন। হার্ডিং আর স্পিলেট গল্প করতে-করতে একটু পেছনে আসছিলেন, নে হাবার্ট আর পেনক্র্যাফট এগিয়ে চলছিল। নেব হঠাৎ দৌড়ে এসে বললে, সর্বনাশ হয়েছে, ক্যাপ্টেন! ওই দেখুন পাহাড়ের গা থেকে ধোঁয়া উঠছে, বোধহয় ওই দ্বীপের জংলিরা আগুন জ্বেলেছে? যদি ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে থাকে, তাহলে আর আমাদের কোনোরকমেই রেহাই পাওয়ার জো নেই?

উত্তেজিত হয়ে হার্ডিং শুধোলেন, হাবার্ট আর পেনক্র্যাফট কোথায়? তাদের তো দেখতে পাচ্ছি না!

নেব হাঁপাতে হাঁপাতে জবাব দিলে, তারা দুজনে ওই ঝোপে অপেক্ষা করছেন। আপনি এখন কী করতে বলেন?

হার্ডিং স্পিলেটের মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, আড়ালে লুকিয়ে থেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখলে মন্দ কী?

সাংবাদিক সায় দিলেন, আমারও তা-ই ভালো বলে মনে হচ্ছে।

তারপর তারা দ্রুতপদে এগিয়ে যেখানে হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট অপেক্ষা করছিল সেখানে এসে হাজির হলেন। তারপর খুব সাবধানে আস্তে আস্তে পাহাড়ে উঠতে লাগলেন সকলে।

জংলিরা পাছে দেখতে পায়, এই ভয়ে পাথরের আড়ালে একটু-একটু করে এগিয়ে হার্ডিং সকলকে থামতে ইশারা করলেন। তারপর কী ব্যাপার দেখবার জন্যে মুখ বাড়িয়েই। হো-হো করে হেসে উঠলেন, যেন একটা হাসির তুবড়ি ফুটল। একটু পরে হাসি চেপে তিনি বললেন, দেখুন মিস্টার স্পিলেট, একটা নালা দিয়ে জ্বলন্ত সালফিউরিক অ্যাসিডের

স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আর তা থেকেই ধোঁয়া উঠছে। আগুনের রঙ লাল নয়, নীল।

ক্যাপ্টেনের পেছনে ছিলেন বলে ব্যাপারটা কেউই বুঝতে পারেননি। হঠাৎ তাঁর এই হাসির বহরে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন সবাই। এবার ব্যাপার কী দেখবার জন্যে সবাই মাথা বাড়ালেন। ক্যাপ্টেন ততক্ষণে নামতে শুরু করে দিয়েছেন। সবাই তার পেছনেপেছনে সেই নীল আগুনের বহমান ধারার দিকে এগিয়ে চললেন। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সেই জ্বলন্ত নীল সালফিউরিক অ্যাসিডের স্রোত! অ্যাসিড জমা হয়ে আগুন জ্বলছে।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

হার্ডিং বললেন, এই ব্যাপার থেকে বোঝা যাচ্ছে, এই দ্বীপের বেশিরভাগ পাহাড়ই আগ্নেয়গিরি। এখনও মাঝে-মাঝে হয়তো একটু-একটু অগ্ন্যুৎপাত হয়ে থাকে। পাহাড়ের কোনো-একটা জ্বালামুখ দিয়ে বোধহয় এইসব জ্বলন্ত ধাতু ও অ্যাসিড ইত্যাদি বেরিয়ে এসে এ-সব নালায় জমা হয়েছে, আর বাইরে এসেও তাই এগুলো এখনও জ্বলছে, ঠাণ্ডা হয়নি।

একটুক্ষণ সবাই সেই নীল রঙের আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার চলতে লাগলেন।

বেলা তখন অনেকটা পড়ে এসেছিল। আরো খানিকটা এবার পরই সামনে হ্রদটা গেল।

হ্রদটিকে ডানপাশে রেখে সবাই চলতে লাগলেন। হ্রদের আশপাশে আগাছা জন্মেছে। একটু পর-পর ঘন ঝোপও দেখা গেল। নানান জাতের পাখি জলের উপর বসে খেলা করছিল। বিকেলের রক্তিম আলোয় হ্রদের জল ঝলমল করতে লাগল। সবাই হ্রদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় টপ হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। সাইরাস হার্ডিং টপকে কাছে ডাকলেন : টপ, এদিকে আয়।

কিন্তু টপ তাঁর কাছে এলো না। বরং তাদের নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে সে যেন আরো খেপে উঠল। হঠাৎ সে চীৎকার করতে-করতে লাফ দিয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পলকের। মধ্যে টপ যখন জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন সবাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তার অদ্ভুত রকম-সকমের কোনো মানে খুঁজে পেলেন না কেউ। সবাই অবাক

হয়ে তাকিয়ে দেখলেন, একটু পরেই টপ জলের উপর ভেসে উঠল, তারপর একটুও দেরি না-করে ডাঙায় উঠে এল।

টপের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কিন্তু শিগগিরই জানা গেল। টপের ডাঙায় উঠে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিশালদেহী জলজন্তুর দেহের এক অংশ জলের উপর ভেসে উঠল। জটা কোন শ্রেণীর তা দেখবার জন্যেই সবাই ঝুঁকে দাঁড়ালেন। কিন্তু টপ কাউকে ভালো দেখতে দিলে না। জন্তুটাকে ভালো করে দেখবার আগেই টপ চীৎকার করে আবার তার উপর লাফিয়ে পড়ল। তাকে বাধা দেয়ার এক সেকেণ্ডও সময় পাওয়া গেল না।

তারপরেই ডাঙার জানোয়ারের সঙ্গে জলের জানোয়ারের তুমুল লড়াই বেধে উঠল। প্রবল ঝাপটা-ঝাপটি হয়ে গেল হ্রদের জলে। কিন্তু সেই বিপুলকায় জন্তুর কাছে ছোট্ট টপের শক্তি আর কতটুকু। একটু পরেই টপের এক পা কামড়ে ধরে সেই জটা জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ওঁরা সবাই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তীরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

একটু পরে হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে নেব করুণ গলায় বলে উঠল, হায়, হায়! আমাদের টপকে আর আমরা ফিরে পাবো না, ক্যাপ্টেন! ওই শয়তান জানোয়ারটাই তাকে মেরে ফেলল।

হার্ডিংও তখন সেই কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। তাছাড়া গোটা ব্যাপারটাই এমনই আচমকা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে, তখনও সবাই ভালো করে

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

বুঝে উঠতে পারেননি। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন তীরে দাঁড়িয়ে হাত কামড়ানো ছাড়া করবার কিছুই ছিল না।

কিন্তু শিগগিরই জলের ভিতরে সাংঘাতিক একটা আলোড়ন শুরু হল। জলের ভিতরকার সেই দারুণ আলোড়নে টপ ছিটকে জলের উপর উঠে এলো। জলের উপরে প্রায় দশ-বারো হাত লাফিয়ে উঠে টপ আবার জলে পড়ে গেল। কিন্তু এবার তাড়াতাড়ি সাঁতার কেটে ডাঙায় এসে উঠল।

টপের আঘাতটা কী-রকম দেখবার জন্য সবাই টপের কাছে ছুটে এলেম। কিন্তু পরীক্ষার পর দেখা গেল, তার আঘাত তেমন গুরুতর-কিছু নয়। পেছনের একটা পা সামান্য একটু জখম হয়েছে মাত্র, শরীরের অন্য কোনো জায়গায় আঘাতের কোনো চিহ্নই নেই।

সকলে তখন জলের দিকে তাকালেন আবার। টপের সঙ্গে সেই জটার লড়াই তখন শেষ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেখা গেল জলের তলায় তখনও আগের মতো প্রবল আলোড়ন চলেছে।

এর কোনো মানে খুঁজে পেলে না কেউ। লড়াইই যদি শেষ হয়ে গেল, তবে আলোড়ন এখনও থামেনি কেন?

সাইরাস হার্ডিং বললেন, আমার মনে হয় জন্তুটা অন্যকোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করছে।

স্পিলেট ঘাড় নেড়ে তাঁর কথায় সায় দিলেন বটে, কিন্তু জন্তুটার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী কে হতে পারে, তা তিনি আন্দাজ করতে পারলেন না।

হ্রদের নীল জল তখন লাল হয়ে উঠেছে। শেষ বিকেলের রক্তিম আলোয় নয়, টকটকে লাল রক্তের রঙে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছে। আরো মিনিট পনেরো পরে আগেকার সেই বিশালদেহী জলজন্তুটার বিরাট শরীর জলের উপর ভেসে উঠল। এবার সবাই স্পষ্টভাবে জন্তুটাকে দেখতে পেলেন।

হার্বার্ট বলে উঠল, এ-যে দেখছি প্রকাণ্ড একটা সীল?

তাঁরা আর একটুও দেরি না-করে কয়েকটা শক্ত দেখে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে এলেন, তারপর একটু জলে নেমে সেই ডাল দিয়ে সীলটাকে তীরের দিকে টেনে আনতে লাগলেন। তীরের কাছে এলে পাঁচজনে সেটাকে টেনে ডাঙায় তুললেন। টপ লেজ নাড়তে নাড়তে তার মৃত শত্রুর দেহ শুঁকতে লাগল।

কোন জায়গায় আঘাত পেয়ে সীলটা মারা গেল, তা দেখবার জন্যে পাঁচজন ঝুঁকে পড়লেন! এত-বড়ো একটা প্রাণী যার সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হয়, সে নিশ্চয় আরো-অনেক, বেশি শক্তিশালী। কিন্তু, কী আশ্চর্য! এত-বড়ো একটা লড়াই হয়ে গেল, অথচ অন্য জন্তুটাকে এতটুকু সময়ের জন্যেও জলের উপরে দেখা গেল না!

পেনক্র্যাফট সীলটার গলার কাছে তর্জনী নির্দেশ করল, এই দেখুন ক্যাপ্টেন প্রাণীটার গলায় কত-বড়ো একটা দাঁতের দাগ।

হার্ডিং খুব ভালো করে দাগটা পরীক্ষা করলেন। আস্তে-আস্তে তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটা দুর্ভাবনায় কালো হয়ে উঠল তার মুখ। শান্ত, স্পষ্ট স্বরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এই আঘাতেই ওর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আরো-একটা কথা আছে। এ-আঘাত দাঁতের কিংবা কোনো জন্তুর খড়্গের নয়। কোনো লোহার হাতিয়ার ছাড়া এ-রকম আঘাত কিছুতেই সম্ভব হয় না।

পেনক্র্যাফটের চোখদুটি গোল হয়ে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে সে বললে, জলের তলায় লোহার হাতিয়ার! এ আপনি কী বলছেন, ক্যাপ্টেন! নিশ্চয় অন্যকোনো প্রাণীর তীক্ষ্ণধার খড়্গের আঘাতে ওই দাগ হয়েছে!

হার্ডিং সন্দেহ-গম্ভীর গলায় বললেন, কী জানি, পেনক্র্যাফট, আমার তো তাই মনে হয়। যেদিন থেকে আমি জানতে পেরেছি যে আমার অজ্ঞাতে আমাকে কেউ গুহার ভিতরে শুইয়ে দিয়ে গেছে, সেদিন থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেশি না-হোক, আমরা পাঁচজন ছাড়াও এই দ্বীপে অন্তত আর-একজন ব্যক্তি আছে। আর এই সাংঘাতিক আঘাতটা হয়তো সেই ব্যক্তিরই কাজ।

কিন্তু সে কী করে হবে, ক্যাপ্টেন? যদি ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি দ্বীপে থেকেই থাকে, তার বাস কি জলের তলায়?

ঠিক বলতে পারছি না। হয়তো জলের তলাতেই থাকে।

এ তো ভারি অদ্ভুত কথা! আমার কিন্তু তা মনে হয় না।

ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি যদি না থাকে তবে ভালোই, দুর্ভাবনার হাত-থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এই বলে হার্ডিং একটু হাসলেন।

এরপর আর এই সম্পর্কে কোনো আলোচনা না-করে সকলে চিমনির পথ ধরলেন। সন্ধে ঘনিয়ে আসছে। এই অজানা রহস্যময় দ্বীপে সন্ধের পর আস্তানার বাইরে থাকাটা ভালো হবে না, শিগগির গুহায় ফিরতে হবে। বিশেষত ক্যাপ্টেন যখন মনে করছেন দ্বীপে কোনো অজ্ঞাত রহস্যময় ষষ্ঠ ব্যক্তি আছে!

পথ চলতে-চলতে স্পিলেটকে লক্ষ্য করে হার্ডিং বললেন, বোধহয় আপনিও দেখে থাকবেন মিস্টার স্পিলেট, কোনো তীক্ষ্ণধার ভারি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে সে-আঘাতটা

যে-রকম দেখায়, এই ক্ষতটাও তেমনি।

স্পিলেট তার কথায় সায় দিলেন, হ্যাঁ, দেখলে তা-ই মনে হয় বটে।

তখন হার্ডিং ফিশফিশ করে স্পিলেটকে বললেন, এই দ্বীপে নিশ্চয়ই কোনো-একটা গভীর রহস্য আছে। সমুদ্র-তরঙ্গের হাত থেকে কীভাবে আমি রক্ষা পেয়েছিলুম? এইমাত্র টপকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে কে? হয়তো একসময় সব রহস্যেরই সমাধান হবে, কিন্তু তবু এমন দুর্ভাবনায় সময় কাটাতে আমার ভালো লাগছে না!

স্পিলেট আস্তে আস্তে বললেন, আপনার কথাগুলো ঠিক, ক্যাপ্টেন হার্ডিং। যে-করেই হোক, এই রহস্যটা আমাদের ভেদ করতেই হবে। কিন্তু তবু কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া এখানে ষষ্ঠ কোনো ব্যক্তি নেই।

না-যদি থাকে, তাহলেই ভালো। হার্ডিং বললেন, কিন্তু আপনি যেন আমার সন্দেহের কথা পেনক্র্যাটদের কাছে বলবেন না। ভেবে ভেবে আমারই মাথা গরম হয়ে উঠছে, আর ওদের তো নেহাৎ অল্প বয়স। শেষে ঘাবড়ে-টাবড়ে গিয়ে একটা কাণ্ড না করে বসে।

সেই সীলটাকে দুটো ডালে ঝুলিয়ে নিয়ে নেব, পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট হৈ-হৈ করে পথ চলছিল। স্পিলেট আর হার্ডিং-ও এবার দ্রুতপায়ে এগুতে লাগলেন। সকলে যখন চিমনিতে পৌঁছুলেন, তখন চারধারে রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে।

সীলটাকে হার্ডিং-এর কথামতো আগামী দিনের জন্যে রেখে দেয়া হল আসছে কাল ওটাকে দিয়ে নানান কাজ করা চলবে।

দুপুরবেলার মতো রাত্রিতেও পাখির ডিম আর ঝিনুকই আহার করলেন সকলে। পরদিন ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠলে সাইরাস হার্ডিং বললেন, আজ থেকে আমাদের অনেক কাজ। প্রথমে নদীর ধার থেকে কিছু এঁটেল মাটি এনে আমাদের কয়েকটা মাটির পাত্র তৈরি করতে হবে। তার পরের কাজ হল গতকালকার মৃত সীলটার চর্বি থেকে তেল প্রস্তুত করা। আজকের আহারের জন্যে শিকারে যাওয়া দরকার। সুতরাং সময় যাতে বাজেখরচ না-হয় সেদিকে লক্ষ রেখো।

সঙ্গে-সঙ্গেই নে আর পেনক্র্যাফট বেরিয়ে গেল শিকারের সন্ধানে। হার্বার্ট গেল ছোটো নদীটির ধার থেকে কিছু এঁটেল মাটি জোগাড় করে আনার জন্যে আর স্পিলেট আর হার্ডিং মৃত সীলটার চর্বি থেকে তেল তৈরির কাজে লেগে গেলেন।

এমনি ধরনের প্রাথমিক দরকারি কাজে পর-পর কয়েকটা দিন যে কোথা দিয়ে উড়ে গেল, কেউই খেয়াল করলেন না। পেনক্র্যাফট শিকারের সুবিধার জন্যে কয়েকটা গাছের ডালের বল্লম তৈরি করেছিল। সেই বল্লমের সাহায্যেই সে একদিন যখন একটা ক্যাপিবারা শিকার করলে, সেদিন তার ফুর্তি দ্যাখে কে! এছাড়া খরগোশ আর পাখি শিকার করতে টপ কম সাহায্য করেনি! কাজেই এই ক-দিন তাদের খাওয়াদাওয়ার কোনো কষ্ট তো হয়ইনি, বরং বেশ তোফা রকমের ভোজই হয়েছে প্রত্যেকদিন।

সপ্তাহখানেক পরে একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সাইরাস হার্ডিং সবাইকে ডেকে বললেন, এবার সারা দ্বীপটা খুঁজে দেখবার সময় এসেছে। আসলে এটা দ্বীপ, না কোনো মহাদেশের অংশ, তাও এখনও আমরা ঠিক করে জানি না। সেই সম্পর্কেও আমাদের নিশ্চিত হতে হবে। আগামী কাল আমরা চিমনির কাছে যে-পাহাড়গুলো আছে তারই একটার চূড়ায় উঠবো। তাহলে আশপাশে পঞ্চাশ মাইলের মতো ভালো করে দেখা যাবে। এই জায়গা সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি একটা ধারণা করে নেয়া দরকার। কারণ এটা দ্বীপই হোক, আর কোনো মহাদেশের কোনো অংশই হোক, এখানে আমাদের কতদিন থাকতে হবে, তার ঠিক কী?

নেব বললে, এই দ্বীপে যদি অন্যকোনো অধিবাসী থাকে, তাহলে তাকেও হয়তো আমরা বের করতে পারবো।

হয়তো পারবো। হার্ডিং বললেন, অবিশ্যি আদৌ যদি এই দ্বীপে আমরা ছাড়া অন্যকোনো মানুষ থাকে।

তারপর হার্ডিং মনে-মনে বললেন, কে জানে, সত্যিই এই দ্বীপে কেউ আছে কি না। বুনো জংলি হোক, আর এখানকার সজ্জন আদিম জাতিই থোক, কোনো-কেউ যদি না-থাকে, তবে দ্বীপের ষষ্ঠ ব্যক্তিটি কে? তার দেখা কালকের অনুসন্ধানে পাওয়া যাবে কি না, কে জানে? অভিযানের ফলাফলের উপরই নির্ভর করছে সকলের ভবিষ্যৎ।

কত-কী আকাশ-পাতাল কথা ভাবতে-ভাবতে ক্যাপ্টেন সাইরাস হার্ডিং একসময়ে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেলেন।

অনুসন্ধানের ফলাফল

১.৬ অনুসন্ধানের ফলাফল

চিমনি থেকে কিছু দূরেই উঁচু একটা পাহাড়-সেটার উপরে উঠে দ্বীপের চারদিক খুব ভালো করে দেখতে হবে।

পেনক্র্যাফটের পরামর্শে বনের মধ্য দিয়ে যাওয়াই ঠিক হল। পাহাড়ের কাছে যাওয়ার জন্যে এই পথটাই সবচেয়ে সোজা এবং সহজ। ফেরবার সময়ে অন্য পথে ফিরতে হবে।

বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় টপ ছোটোখাটো জানোয়ারগুলোকে তাড়া করতে লাগল। কিন্তু খামকা সময় নষ্ট হবে বলে হার্ডিং টপকে বাধা দিলেন। আগে পাহাড়ে চড়ে দ্বীপটা দেখা যাক, পরে অন্য কাজ।

ধীরে-ধীরে বন পেরিয়ে সকলে ভোলা জায়গায় এলে দেখা গেল, সামনে একটু দূরেই সেই পাহাড়। পাহাড়ের দুটো চুড়ো, দেখতে মোচার ডগার মতো। একটা চুড়োর আগাটা প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে কে যেন হেঁটে দিয়েছে। চুড়োটার একদিকে ঠিক যেন। পোস্তা বাঁধা। এই পোস্তা দু-দিকে পাখির পায়ের মতো হয়ে চলে এসেছে। তার মধ্যিখানে সমান জমি, তাতে বড়ো-বড়ো গাছ-গাছগুলি প্রায় নিচু চুড়োটার সমান উঁচু। পাহাড়ের উত্তর-পুব দিকে গাছের সংখ্যা কম, এবং পাহাড়ের গায়ে ছোটো-ছোটো ঝরনার মতো দেখা গেল। ঠিক ছিল, ওঁরা প্রথমে ছোটো চুড়োটাতেই উঠবেন। হার্ডিং দেখলেন, জমি পাহাড়পর্বত সবকিছুর উপর দিয়েই যেন এককালে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে

গিয়েছে। তার চিহ্ন এখনও পরিষ্কার বর্তমান। ভূমিকম্পের দরুন চারদিকের সমস্ত জমিই খুব উঁচু-নিচু, এবড়োখেবড়ো! হাবার্ট পাহাড়ে ওঠবার সময়ে মাটিতে বুনো জানোয়ারের পায়ের দাগ দেখতে পেলে।

পেনক্র্যাফট বললে, এ-সব জানোয়ার যদি ওঠবার সময় আমাদের বাধা দেয়, তখন কী হবে?

স্পিলেট ভারতবর্ষে বাঘ শিকার করেছেন, আফ্রিকায় সিংহ মেরেছেন। তিনি বললেন, পথে জানোয়ারেরা এসে বাধা দিলে তার ব্যবস্থা করা যাবে। কিন্তু যখন বড়ো জন্তুর পায়ের দাগ দেখা গেছে, তখন আমাদের সাবধান হয়ে চলা উচিত।

দুপুর বারোটার সময় ওঁরা সবাই একটা ঝরনার ধারে গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করলেন, এবং কিছু আহার সেরে নিলেন। ততক্ষণে ওঁরা চুড়োর প্রায় অর্ধেক পথ উঠছেন। এখান থেকে অনেকদূর পর্যন্ত দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্র দেখা যায়। দক্ষিণ দিকটা পর্বতের একটা উঁচু টেকের জন্যে দেখা যায় না। বাঁদিকে উত্তরে অনেকদুর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে।

বিশ্রাম ও আহারের পর বেলা একটার সময় সকলে আবার পর্বতের চুড়োয় উঠতে ঘন ঝোঁপের মধ্যে এসে হাজির হলেন। মাঝে-মাঝে মোরগের মতো বড়ো ফেজান্ট জাতের ট্রেগোপান পাখি দেখা যেতে লাগল। গিডিয়ন স্পিলেট আশ্চর্য কৌশলে একটুকরো পাথর ছুঁড়ে একটা ট্রেগোপান মেরে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন। পেনক্র্যাফট শিকার পেয়ে ভারি খুশি হল।

ক্রমে ঝোপ পেরিয়ে, যাত্রীরা একে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে প্রায় একশো ফুট খাড়া পথ ওঠবার পর সমান জমি পাওয়া গেল। এখানকার জমিতে অগ্ন্যুদ্গারের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট।

এখানে স্যাময় আর ছাগল জাতের জন্তুর পায়ের দাগ অনেক দেখা গেল। তারপর হঠাৎ দেখা গেল, প্রায় পঞ্চাশ ফুট দূরে দুটো বড়োরকমের জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড়ো-বড়ো শিং-পেছনের দিকে বাঁকানো। গায়ে ভেড়ার মতো লোম।

জানোয়ারগুলোকে দেখেই হার্বার্ট বলে উঠল, আরে, এগুলো যে মুশমন!

কতকটা ভেড়ার মতো দেখতে জানোয়ারগুলো বড়ো-বড়ো কালো পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ওঁদের দেখতে লাগল। মনে হল, যেন আগে তারা কখনও মানুষ দেখেনি। তারপর হঠাৎ কেন যেন ভয় পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করে দিল।

বিকেল চারটের সময় গাছের সীমানা শেষ হল। আর পাঁচশো ফুট উঠতে পারলেই প্রথম চুড়োর নিচের সমতল জমিতে পৌঁছুনো যাবে। ক্যাপ্টেন হার্ডিং সেখানেই রাত কাটাবেন বলে ঠিক করলেন। উঁচু-নিচু আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরে অনেক কষ্টের পর সকলে সমান জমিতে উপস্থিত হলেন।

হার্বার্ট, নে ও পেনক্র্যাফট লেগে গেল আগুন জ্বালানোর কাজে। রাত্রে ঠাণ্ডা পড়বে সাংঘাতিক, আর সেইজন্যেই আগুনের দরকার—রান্নার জন্যে ততটা নয়।

আগুন জ্বলল। শুয়োরের মাংস যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই আহার শেষ হল। সন্ধে সাড়ে-ছটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়া সব শেষ।

আহারের পর স্পিলেট তাঁর নোটবুক নিয়ে বসলেন দিনের ঘটনা লেখবার জন্যে। নেব ও পেনক্র্যাফট ঘুমুবার তোড়জোড় করতে লাগল। হার্ডিং হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে চললেন পাহাড়ের উঁচু চুড়োটার অবস্থা দেখতে।

সুন্দর পরিষ্কার রাত্রি। অন্ধকারও বেশি নয়। প্রায় কুড়ি মিনিট চলে হার্ডিং একটা জায়গায় দাঁড়ালেন। এখানে চুড়োটার ঢালু গা মিলে গিয়ে এক হয়েছে। চুড়োর গা ঘুরে আর এবার জো নেই। যাই হোক, সৌভাগ্যবশত চুড়োয় ওঠবার একটা উপায় হল। ঠিক তাঁদের সামনেই দেখলেন একটা গভীর গর্ত রয়েছে। এটা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। ভারি অসমান, উঁচুনিচু। আগে যে-অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল, তার দরুন লাভা গন্ধক ইত্যাদি মাটিতে পড়ে বেশ সিঁড়ির মতো হয়েছে। উঁচু চুড়োটার উপরে ওঠা খুব মুশকিলের ব্যাপার হবে না।

এইসব দেখে হার্ডিং আর দেরি করলেন না। হার্বার্টের সঙ্গে অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করলেন। তখনও প্রায় হাজার ফুট উঠতে হবে। হার্ডিং ঠিক করলেন, বাধা না-পাওয়া পর্যন্ত গহ্বরের ভিতরকার চড়াই দিয়ে উঠতে থাকবেন। সৌভাগ্যবশত চড়াইয়ের পথ ক্রেটারের ভিতরেও ঘুরে-ঘুরে উপরের দিকে উঠছিল। তাতে ওঠবার পক্ষে সুবিধেই হল।

আগ্নেয়গিরি এখন একেবারে নিভে গেছে। পাহাড়ের জ্বালামুখ দিয়ে এখন আর ধোঁয়া বেরোয় না, গহ্বরের ভিতর তাকালে আর আগুনও দেখা যায় না। সাড়া নেই, শব্দ নেই,

গর্জন নেই, কম্পন নেই-আগ্নেয়গিরি এখন যে শুধু ঘুমন্ত তা-ই নয়, একেবারে মরে গেছে।

হার্ডিং হার্বার্টকে নিয়ে ক্রেটারের ভিতর দেয়াল বেয়ে কেবলই উপরের দিকে উঠতে লাগলেন। ক্রমে ক্রেটারের মুখের কাছে আসবার পর উপরের দিকে তাকালে একটুকরো গোল আকাশ দেখা গেল। হার্ডিং আর হার্বার্ট যখন উঁচু চুড়োর ডগায় দিলেন, তখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেছে। অন্ধকারও বেশ গভীর হয়েছে ইতিমধ্যে। মাইলদুয়েকের বেশি দেখা যায় না। তবে কি সমুদ্র জায়গাটিকে ঘিরে রেখেছে? না এটা কোনো মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত? এখনও সে-কথার মীমাংসা হল না। চারদিকে তাকিয়ে দেখে মনে হলসবদিকেই সমুদ্র যেন আকাশের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল। আকাশে যেন একটা আলো দেখা গেল। এই আলোর ছায়া যেন জলের উপর পড়ে কাপছে। এই আলো চাঁদের—সরু ধনুকের মতো চাঁদ-একটু পরেই ডুবে যাবে।

হার্বার্ট চারদিকে তাকিয়ে বললে, যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই সমুদ্র! খালি জল, আর জল!

হার্ডিং হার্বার্টের হাত ধরে একটু চাপ দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, হার্বার্ট, বুঝতে পেরেছি-আমাদের এটা দ্বীপ। এ-কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে চাঁদ ঢেউয়ের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে হার্ডিং হার্বার্টের সঙ্গে অন্য-সকলের কাছে ফিরে এলেন। অভিযানের ফলাফল বর্ণনা করে বললেন, এবার তো সবকিছু জানা গেল। এ-জীবনে হয়তো-বা আর

এই দ্বীপ ছেড়ে কোথাও যাওয়া যাবে না। এই দ্বীপে বাস করাই যখন আমাদের ভাগ্যলিপি, তখন বসবাসের জন্যে সুব্যবস্থা করতে হবে।

গিডিয়ন স্পিলেট শুধু বললেন, হ্যাঁ, জীবনে হয়তো-বা এই দ্বীপ থেকে কখনোই আর অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না!

পরদিন তিরিশে মার্চ। সকাল সাতটার সময় কিছু জলযোগ করে সবাই আবার রওনা হলেন। সেই মরে-যাওয়া আগ্নেয়গিরির চূড়ায় উঠে দিনের আলোয় খুব ভালো করে চারদিক দেখতে হবে। হার্ডিং আগের দিন সন্ধেবেলায় যে-পথে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই চললেন। চুড়োয়, পৌঁছেই চারদিকে তাকিয়ে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, সমুদ্র, সমুদ্র! চারদিকেই সমুদ্র।

হার্ডিং হয়তো ভেবেছিলেন চুড়োয় উঠে দিনের আলোয় দূরে তীর দেখতে পাবেন। আগের দিন অন্ধকার ছিল বলে হয়তো তা দেখা যায়নি। কিন্তু চারদিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কিছুই দেখা গেল না—সমুদ্র যেন সবদিকেই আকাশের প্রান্তের সঙ্গে মিশে গেছে। তীর কিংবা কোনো জাহাজের পাল–কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। অসীম জলরাশির ঠিক মাঝখানে তাদের এই দ্বীপ-প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে যেন ভীষণ-কোনো সামুদ্রিক জন্তু, যেন একটা তিমি ঘুমুচ্ছে।

আসলে দ্বীপটা দেখতে সত্যিই অনেকটাই তিমির মতো। গিডিয়ন স্পিলেট তক্ষুনি দ্বীপটার একটা নকশা এঁকে ফেললেন। দ্বীপটার পরিধির একশো মাইলের বেশি হবে বলেই মনে হল।

দ্বীপের পূর্বদিকের অংশটা, যেখানে তাঁরা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, দেখতে একটা উপসাগরের মতো। তার একপাশ তীক্ষ্ণ অন্তরীপের মতো হয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। উত্তর-পূর্ব দিকে আরো দুটি অন্তরীপ, আর সেখানেই উপসাগরটির শেষ। উত্তর-পূব তীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম তীরটা গোল। এই তীরের প্রায় মধ্যিখানে সেই মরে-যাওয়া আগুনের পাহাড়। দ্বীপের সবচাইতে সরু জায়গাটা অর্থাৎ চিমনি আর পশ্চিম তীরের নদী পর্যন্ত জায়গাটা দশ মাইল চওড়া দ্বীপের লম্বালম্বি দূরত্ব ত্রিশ মাইলের কম তো নয়ই, বরং বেশিই। হতে পারে। দ্বীপের মধ্যকার জায়গাটা-পাহাড় থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিক জুড়ে সমুদ্র পর্যন্ত—বিশাল অরণ্য। উত্তর ভাগটা শুকনো, বালুময়। হার্ডিংরা দেখে অবাক হলেন যে, আগ্নেয়গিরি আর পুব তীরের মাঝখানে একটা হ্রদ রয়েছে। তার কিনারায় অগুনতি সবুজ গাছপালা। হ্রদটি দেখে মনে হল এটি যেন সমুদ্র থেকে খানিকটা উঁচুতে অবস্থিত।

পেনক্র্যাফট জিজ্ঞাসা করল, হ্রদের জল কি খাওয়ার উপযোগী হবে?

হার্ডিং বললেন, নিশ্চয়ই! দেখছো না, হ্রদের জল পাহাড়ের ঝরনা থেকে নেমে আসছে?

হার্বার্ট বললে, ওই দেখুন, একটা ছোটো নদী যেন হ্রদে এসে পড়েছে।

হার্ডিং বললেন, এই নদীর জল দিয়েই যখন হ্রদের সৃষ্টি, তখন খুব-সম্ভব অন্যদিকে। অতিরিক্ত জল বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়বার একটা পথও আছে। ফেরার পথে এইটে দেখে যেতে হবে।

এই বাঁকাচোরা ঝরনা আর নদীর জল দিয়েই দ্বীপটা উর্বর। হয়তো-বা গভীর বনের মধ্যে অন্যকোনো ঝিল বা হ্রদ আছে। বনটি তো আর কম বড়ো নয়। দ্বীপের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে হবে। উত্তর দিকে তাকিয়ে সেখানে নদী কিংবা ঝরনার অস্তিত্ব আছে বলে বোঝা গেল না। তবে মধ্যে-মধ্যে জলাভূমি আছে বটে।

প্রায় একঘণ্টা পাহাড়ের চুড়োয় থেকে সবাই চারদিক তন্নতন্ন করে দেখলেন। এখন একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তরের উপর এই আগন্তুকদের ভবিষ্যৎ ভালোমন্দ নির্ভর করে :

এই দ্বীপে কি মানুষের বাস আছে?

প্রশ্নটি করলেন গিডিয়ন শিলেট। চারদিক দেখেশুনে যা মনে হলতাতে এই প্রশ্নের জবাব হয় : না—এখানে কোনো জনমানবের বসতি নেই। ঘর-বাড়ি, গ্রাম, ধোঁয়া কিছুই দেখা গেল না। অবশ্য এঁরা যেখান থেকে দেখেছেন, সেখান থেকে দ্বীপের শেষ সীমা ত্রিশ মাইলের উপর। এত-দূরে লোকের বসতি থাকলে ঈগলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও দেখতে পাবে না।

পরে আরো খোঁজখবর নেয়া যাবে। এখন না-হয় মেনে নেয়া গেল, দ্বীপটি জনমানবশূন্য। তাহলেও কাছাকাছি অন্যকোনো দ্বীপের নোক এখানে আসতে পারে তো? এ-প্রশ্নের উত্তর দেয়া সহজসাধ্য নয়। চারদিকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে তো কোনো দ্বীপ দেখতেই পাওয়া গেল না। যা-ই হোক, পঞ্চাশ মাইলের পরেও দ্বীপ থাকতে পারে। সেখানকার লোকের পক্ষে নৌকো কিংবা ক্যানুতে করে এই দ্বীপে আসা মুশকিল হবে না। এমন অবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সবসময় তৈরি হয়ে থাকতে হবে।

আপাতত অনুসন্ধান শেষ হল। ফেরার আগে হার্ডিং ধীর গভীর গলায় বললেন, হয়তো এই দ্বীপে আমাদের অনেকদিন থাকতে হবে। অবশ্য হঠাৎ কোনো জাহাজ এসে হাজির হওয়াও বিচিত্র নয়। হঠাৎ বলছি এইজন্যে যে এটা অতি নগণ্য দ্বীপ-জাহাজ চলাচলের পথ মোটেই নয়।

স্পিলেট বললেন, ক্যাপ্টেন, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। যা-ই হোক, আমরা সকলেই উদ্যোগী মানুষ। তাছাড়া আপনার উপরে আমাদের ভরসা খুব আছে। আমরা এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করবো।

স্পিলেটের কথায় সকলেই খুব উৎসাহের সঙ্গে সায় দিল।

ফেরবার সময় হার্ডিং বললেন, চলো এক কাজ করি। দ্বীপের পাহাড়-পর্বত, নদী নালা, উপসাগর, অন্তরীপ—সবগুলোরই এক-একটা নাম দেওয়া যাক।

পেনক্র্যাফট বললে, আমাদের প্রথম আচ্ছাটির নাম দিয়েছি চিমনি–কারু কোনো আপত্তি না-থাকলে সেটার নাম চিমনিই থাক।

হার্বার্ট বললে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং, মিস্টার স্পিলেট, পেনক্র্যাফট, নে—সকলের নামেই এক-একটার নাম দেয়া যাক।

আমার নামে নাম হবে। এই বলে নেব চকচকে শাদা দাঁতগুলো বের করে হাসতে লাগল।

যা-ই হোক, সবাই উত্তর আমেরিকার লোক, তাই শেষটায় হার্ডিং-এর প্রস্তাবমতো আমেরিকার প্রসিদ্ধ নামসমূহ দিয়েই দ্বীপের ভিন্ন-ভিন্ন জায়গার নামকরণ করা হল। বড়োদুটি উপসাগরের একটার নাম হল ইউনিয়ন বে, অন্যটার নাম হল ওয়াশিংটন বে। পাহাড়টার নাম রাখা হল মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন। দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তের উপদ্বীপটার নাম হল সার্পেন্টাইন পেনিনসুলা, কারণ উপদ্বীপটা দেখতে অনেকটা সাপের ল্যাজের মতো। অন্য প্রান্তের উপসাগরটার নাম শার্ক গালফ-দেখত যেন হাঙরের মুখ হাঁ করে আছে। এই শার্ক গালফের দুটি অন্তরীপ হল নর্থ ম্যাবিল আর সাউথ ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ 1 বড়ো হ্রদটার নাম লেক গ্র্যান্ট চিমনির উপরে গ্র্যানাইট পাথরের খাড়া পাহাড়গুলোর চুড়োয় যে-সমতল জমিটুকু ছিল, তার নাম হল প্রসপেক্ট হাইট। এখান থেকে সমস্ত উপসাগর বেশ ভালোরকম দেখা যায়। তারপর যে-নদীর জল তারা পান করবার জন্যে ব্যবহার করেন, যার কাছে তারা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, তার নাম হল মার্সি নদী। দ্বীপের যে-সংকীর্ণ অংশটায় তারা বেলুন থেকে পড়েছিলেন, তার নাম হল সেফটি আইল্যাণ্ড। সবশেষে গোটা দ্বীপটার নাম দেয়া হল লিঙ্কন আইল্যাণ্ড।

এ হল আঠারোশো পঁয়ষট্টি খ্রিষ্টাব্দের তিরিশে মার্চের কথা। তারা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি যে এর ঠিক ষোলো দিন পরে ওয়াশিংটনে এমন-একটা বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হবে, যার ফলে সারা দুনিয়া শিউরে উঠবে। আব্রাহাম লিঙ্কন যে কোনো নিষ্ঠুর আততায়ীর হাতে নিহত হতে পারেন, এ-কথা অবিশ্যি কেই বা ভাবতে পারত।

.

১.৭ উপক্রমণিকা

পরদিন সকলের ঘুম ভাঙতেই সাইরাস হার্ডিং বললেন, আজ আমরা নতুন পথে চিমনিতে ফিরবো। তাহলে এই ফাঁকে গোটা দ্বীপ সম্পর্কে একটু মোটামুটি আন্দাজ করে নেয়া যাবে। এখানে আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে কী-কী জিনিশ পাচ্ছি, আগে সেগুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে হবে–তারপর খুব ভেবে আমাদের কাজ করতে হবে। কে জানে কতদিন এই দ্বীপে থাকতে হবে, কিন্তু তার ব্যবস্থা তো করা দরকার।

পেনক্র্যাফট বললে, কিন্তু ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমার একনম্বর প্রার্থনা হল, আপনি দয়া করে আমাকে কোনোদিন হাতিয়ার তৈরি করে দিন-বন্দুক বা রিভলভার। এভাবে গাছের ডাল দিয়ে শিকার করা একটা বড়ো বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। পারবেন আপনি বন্দুকের ব্যবস্থা করতে?

হয়তো পারতেও পারি। হার্ডিং উত্তর করলেন, কিন্তু এখন আগে আমাদের কয়েকটা তীর ধনুক তৈরি করে নিতে হবে। অস্ট্রেলিয়ার শিকারীদের মতো তীর-ধনুক ব্যবহারে দু-দিনেই তোমরা ওস্তাদ হয়ে উঠতে পারবে, যদি একটু একাগ্রতা থাকে।

তীর-ধনুক! মুখটা কালো করে বললে পেনক্র্যাফট, ও-তে ছেলেখেলা!

এত গর্ব কোরো না, পেনক্র্যাফট, বললেন স্পিলেট, রক্তপাতের জন্যে তীর-ধনুকই আরো কয়েক শতাব্দীর জন্যে যথেষ্ট। গোলা-বারুদ আর কবেকার? এইতো সেদিন সবে গোলাবারুদ ব্যবহার করা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত খুন-জখম লড়াই সেই আদিম যুগ থেকেই চলে আসছে।

সে-কথা ঠিক, মিস্টার স্পিলেট। পেনক্র্যাফট উত্তর করলে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি সবসময়েই একটুও না ভেবে, হ-য-ব-র-ল যা মাথায় আসে দুমদাম বলে ফেলি।

হার্ডিং বললেন, কিন্তু এখন আর একটুও দেরি করা চলবে না। সবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। তারপরই আমরা বেরিয়ে পড়বে।

একটু পরে সবাই খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। এবার হ্রদের পশ্চিম দিয়ে চিমনির দিকে চললেন সবাই। সারাদিন দ্বীপের নতুন-নতুন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে-করতে হাসিগল্পগুজব করতে-করতে সবাই চললেন। দুপুরবেলার দিকে নেব আবার টপের সাহায্যে দুটো খরগোশ ধরে নিয়ে এলো। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহী হল পেনক্র্যাফট। সে-তো খরগোশ দুটো দেখে মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, যাক, আজ রাত্রিরে খরগোশের রোস্ট দিয়ে ভোজটা জমবে ভালো।

সারাদিন ওঁরা লেক গ্ল্যান্টের আশপাশে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর মার্সি নদীর বাঁ-ধার দিয়ে সবাই যখন চিমনিতে এসে পৌঁছুলেন, তখন সন্ধে হয়ে গেছে।

আলো জ্বালিয়ে নেওয়া হল ভালো করে। রান্নাবান্নার কাজে খুব ওস্তাদি দেখালে নেব আর পেনক্র্যাফট। রাত বেশি বাড়বার আগেই খাওয়া-দাওয়া করে নিলেন সবাই। সারাদিন হাঁটাহাঁটির পর খরগোশের রোস্ট খেতে যে খুব ভালো লাগল, সেটা না-বললেও চলে।

খাওয়া-দাওয়ার পর অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে সবাই গোল হয়ে বসল। তখন সাইরাস হার্ডিং পকেট থেকে নানা ধরনের খনিজ দ্রব্যের নমুনা বার করলেন, সারাদিন তিনি এ-সবই সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর একটু কেশে সবার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, এই হল লোহা, এটা পাইরাইট, এটা চুন, এই হল কয়লা আর এটা এখানকার কাদামাটি। প্রকৃতি আমাদের এইসব জিনিশ দিয়েছে। ঠিকভাবে এদের কাজে লাগানো হল আমাদের কর্তব্য। কাল থেকে আমাদের কাজ শুরু হবে।

স্পিলেট শুধু বললেন, হ্যাঁ। শুভস্য শীঘ্রম্।

কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা শুরু করবো কোত্থেকে? পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পেনক্র্যাফট হার্ডিংকে প্রশ্ন করলে।

একেবারে শুরু থেকে–বললেন সাইরাস হার্ডিং।

আর, সত্যিই একেবারে শুরু থেকে করতেই বাধ্য ছিলেন এঁরা। যন্ত্রপাতি বানাবার মতো যন্ত্রপাতি পর্যন্ত এঁদের ছিল না। বাঁচবার পক্ষে যে জিনিশগুলো না-হলেই নয়, সেইসব জিনিশ পর্যন্ত ছিল না এঁদের। প্রত্যেকটি জিনিশ তাঁদের নিজের হাতে তৈরি করে নিতে হবে। তাদের লোহা আর ইস্পাত অপরিশুদ্ধ খনিজ পদার্থের আওতায় পড়ে, তাদের মাটির জিনিশপত্র, পোশাক-আশাক এখনো তৈরি হয়নি। আবিশ্যি এ-কথা বলতেই হবে যে, তাঁরা সবাই মানুষ শব্দটির পূর্ণ বিকাশ। এঞ্জিনিয়ার হার্ডিং-এর সঙ্গীরা সকলে বুদ্ধিমান। হার্ডিং তাঁদের ক্ষমতায় আস্থা রাখেন। যে-পাঁচজন আকস্মিকভাবে এক

হয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই আপন-আপন ক্ষেত্রে সেরা, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার ক্ষমতা রাখেন, সেই লড়াইয়ে জেতবার শক্তিও তাঁদের আছে।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, একেবারে শুরু থেকে। এই যে শুরুর কথা বলছি, তা হল এমন একটি যন্ত্র তৈরি করবার কথা, যে-যন্ত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক বস্তুসমূহকে কাজে লাগানো যায়। এ-কাজে উত্তাপের কতটুকু ক্ষমতা, তা সকলেরই জানা আছে। এখন কাঠই হোক আর কয়লাই হোক, তা ব্যবহার করবার জন্যে সব-আগে দরকার একটা চুল্লি।

কেন? চুল্লি দিয়ে কী হবে? প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফট।

ইট বানাবার জন্যে হার্ডিং উত্তর করলেন, এবং তা বানাতে হবে ইট দিয়েই।

কিন্তু সে-ইট কী করে বানাবো?

কাদামাটি দিয়ে। এখুনি শুরু করতে হবে আমাদের। হ্যাঙামা কমাবার জন্যে আমাদের চুল্লিটা তৈরি করতে হবে উৎপাদনের স্থানেই! নেব খাবার-দাবার নিয়ে যাবে—রাঁধবার জন্যে আগুনের অভাব সেখানে হবে না। হ্রদের পশ্চিম তীরে যেতে হবে আমাদের। সেখানে কাদামাটির কোনো অভাব হবে না। কাল ওখান দিয়ে আসবার সময় আমি জায়গাটা ভালো করে দেখে এসেছি।

***

মার্লি নদীর তীর দিয়ে সবাই চলতে লাগলেন। প্রসপেক্ট হাইট পেরিয়ে মাইল পাঁচেক চলবার পর তারা অরণ্যের কাছে ঘাসে-ছাওয়া একটি জমিতে এসে পৌঁছুলেন। লেক গ্র্যান্ট সেখান থেকে প্রায় দুশো ফুট দূরে। পথে হার্বার্ট তালগাছের মতো একটা গাছ আবিষ্কার করলে, যার ডাল দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা তীর-ধনুক তৈরি করে। পাশেই এমনএক জাতের গাছ দেখা গেল, যার ছাল দিয়ে অনায়াসে ধনুকে তৃণ পরানো চলে। পেনক্র্যাফট অনায়াসেই তার ধনুক পেয়ে গেল। এখন শুধু তীরের ওয়াস্ত্র।

আগের দিন যে-জায়গাটা হার্ডিং দেখে গিয়েছিলেন, সবাই সেখানে এসে পৌঁছুলেন। যে মাটি দিয়ে ইট তৈরি হয় ঠিক সেই জাতের মাটি বলে দের অনেক ঝামেলা কমে গেল। বালি মিশিয়ে সেই কাদামাটি দিয়ে সুন্দর ছাঁচের ইট তৈরি করে কাঠের আগুনে পুড়িয়ে নিলেই তাদের সব পরিশ্রম সার্থক হয়ে উঠবে। ছাঁচ না-থাকায় অবিশ্যি হাত দিয়েই ইট তৈরি করতে হবে, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না—সুন্দর না-হয়-না-ই হল, প্রয়োজনটুকু তো মিটবে। ওস্তাদ মজুর অবিশ্যি যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই সকাল-সন্ধে খেটে দিনে দশ হাজার ইট তৈরি করতে পারে, কিছু অপটু হাতেও এঁরা পাঁচ জনে দু-দিনের মধ্যে হাজার তিনেক ইট তৈরি করে ফেললেন। তিন-চার দিন চুল্লি বানাবার মতো ইট তৈরি হল। চুল্লি তৈরি করবার আগে দুদিন ধরে সবাই মিলে জ্বালানি কাঠ জোগাড় করলেন।

এই ফাঁকে পেনক্র্যাফট গাছের ডাল দিয়ে বহু তীর তৈরি করে নিলে। প্রত্যেকের জন্যে একটা করে ধনুকও তৈরি করা হল। তারই সাহায্যে শিকার জোগাড় করতে তাদের খুব বেশি অসুবিধে হল না। সাইরাস হার্ডিং সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কারণ অরণ্যে হিংস্র জানোয়ার থাকতে পারে। তার আন্দাজে ভুল হয়নি। গিডিয়ন স্পিলেট আর হার্বার্ট একদিন এমন-একটা জানোয়ার দেখেছিলেন বনে, যাকে তাদের জাগুয়ার বলে মনে

হয়েছিল। সৌভাগ্য বলতে হবে, জানোয়ারটা তাদের আক্রমণ করেনি। যদি করতো তাহলে বিপদ হতে পারতো. 1 স্পিলেট তো তখনি প্রতিজ্ঞা করে ফেললেন যে, কোনোমতে যদি একটা বন্দুক পাওয়া যায় তাহলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই ঘোষণা একটুও দ্বিধা করবেন না। দ্বীপ থেকে যে-করেই হোক এই সাংঘাতিক জানোয়ারদের বিনাশ করতেই হবে।

এই ক-দিনে তারা কিন্তু চিমনির প্রতি বিশেষ নজর দেননি। সাইরাস হার্ডিং ঠিক করেছিলেন যে শিগগিরই নতুন-একটা বাসস্থান ঠিক করে নেবেন। কেননা চিমনিটি বাসের পক্ষে বেশ বিপজ্জনক। চিমনির জায়গায় ফাঁক ছিল—দেখে মনে হয়, সমুদ্রের জল যখন বেড়ে ওঠে তখন চিমনির মধ্যেও জল ঢোকে।

স্পিলেট সাংবাদিক। কাজেই লিঙ্কন দ্বীপে আসবার পর থেকে প্রত্যেকটা দিনের হিশেব রাখছিলেন তার রোজনামচায়। পাঁচই এপ্রিল স্পিলেট জানালেন যে, এই দ্বীপে আসবার পর বারো দিন কেটে গেছে। ছয়ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই সবাই চুল্লির কাছে এসে হাজির হলেন। শুকনো ইটের পাঁজার মধ্যে পুঞ্জীভূত করা হল কাঠকুটো, ডালপালা। সারা দিন ধরে চুল্লিটাকে কার্যকরী করার চেষ্টা চলল। সন্ধের সময় ইটের পাঁজায় আগুন দেয়া হল। সে-রাত্রে আর কেউ ঘুমুলেন না। সতর্কভাবে আগুন জ্বালিয়ে রাখলেন।

তিনদিন ধরে পোড়ানো হল ইট। এবারে ঠাণ্ডা হবার সময় দিতে হবে। অসংস্কৃত চুনা-পাথরকেও সাধারণ পাথরের সঙ্গে আর বালির সঙ্গে মিশিয়ে চমৎকারভাবে কাজে

লাগানো হল। নয়ই এপ্রিল সাইরাস হার্ডিং কাজ শুরু করবার উপযোগী কয়েক হাজার ইট আর পরিশুদ্ধ চুনাপাথর পেলেন।

আরো-কয়েক দিন বাদে দেখা গেল, দ্বীপের আগন্তুকেরা একরাশ মাটির বাসন-কোশন তৈরি করেছেন, ব্যবহারের জন্যে। মাটির সঙ্গে সামান্য চুনাপাথর আর অন্য-এক ধরনের খনিজ পদার্থ মিশিয়ে তৈরি-করা বাসন টেকসই হল খুব দেখতে অবিশ্যি খুবই বিশ্রী হল কিন্তু কাজ চলল খুব ভালোই। পেনক্র্যাফ্ট তো ওই চুন-মাটি ইত্যাদি দিয়ে একটা পাইপ তৈরি করে ফেললে। কিন্তু তামাক না-পাওয়ায় সেই পাইপ বেচারির কোনো কাজেই লাগল না। পনেরোই এপ্রিল পর্যন্ত কুমোরের কাজই চলল। পরদিন হল ঈস্টার সানডে, সেদিন তারা জিরিয়ে নিলে। সেদিন বিকেলের দিকে সাইরাস হার্ডিং একটা স্মরণীয় জিনিশ আবিষ্কার করলেন। নাগলতা বা ওঅর্ম উড বলে এক ধরনের গাছ আবিষ্কার করলেন তিনি দ্বীপে, যা ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে পটাসিয়াম নাইট্রেটের সাহায্যে চলনসই-গোছ দেশলাই তৈরি করা যায়। আর দ্বীপে পটাসিয়াম নাইট্রেটের অভাব ছিল না। কাজেই এই মূল্যবান আবিষ্কার তাদের জীবনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে হার্ডিং লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থানও বের করে নিয়েছিলেন। মোটামুটিভাবে জানা গেল যে, দ্বীপটি পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এবং একশো বাহান্ন ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখায় অবস্থিত। তার মানে দ্বীপটি তাহিতি থেকে বারোশো মাইল, নিউজিল্যাণ্ড থেকে আঠারোশো মাইল এবং আমেরিকার উপকূল থেকে প্রায় সাড়ে-চার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমনি কোনো দ্বীপের কথা কখনো শুনেছিলেন কি না, সে-কথা ভাবতে চেষ্টা করলেন সাইরাস হার্ডিং। কিন্তু লিঙ্কন দ্বীপের মতো কোনো দ্বীপের কথা তাঁর স্মরণে এলো না।

www.bengaliebook.com

রবিবার দিন পেনক্র্যাফট তার তীর-ধনুক দিয়ে কোনোকিছুই শিকার করতে পারেনি। সন্ধের পর সবাই চিমনিতে ফিরলে সে আপশোশ করে বললে : এভাবে আর ক-দিন চলবে ক্যাপ্টেন বলুন তো? বন্দুক ছাড়া সাংঘাতিক অসুবিধে হচ্ছে যে!

সে-কথা ঠিক। স্পিলেট বললেন, কিন্তু সে-তো তোমার উপরেই নির্ভর করছে। লোহা জোগাড় করে ব্যারেলের জন্যে, ট্রিগারের জন্যে ইস্পাত, সল্ট পিটার, কয়লা আর গন্ধক বারুদ তৈরির জন্যে, পারদ নাইট্রিক অ্যাসিড আর সিসে গুলির জন্যে—দেখবে, ক্যাপ্টেন আমাদের চমৎকার বন্দুক তৈরি করে দিয়েছেন।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : সবগুলো জিনিশই আমরা দ্বীপে পাবো–কিন্তু বন্দুক হল এমন-একটা জিনিশ, যা বানাতে বিশেষ কয়েক ধরনের ভালো যন্ত্র চাই। কিন্তু সে যা-ই হোক, পরে দেখা যাবে-খন।

বেলুন থেকে সব জিনিশপত্র ফেলে দিয়ে কী ভুলই না করেছি! বললে পেনক্র্যাফট।

যদি সব জিনিশপত্র আমরা ফেলে না-দিতুম, তাহলে নির্ঘাৎ জলে ডুবে মরতুম, পেনক্র্যাফট। বললে হার্বার্ট।

স্পিলেট সে-কথায় সায় দিলেন : হাবার্ট ঠিক কথাই বলেছে।

পরদিন ভোরে বেলুনটা না-দেখতে পেয়ে ফরেস্টার আর তার সঙ্গীদের মুখের যে দশা হয়েছিল, তা কল্পনা করেও আমার হাসি পাচ্ছে, বললে পেনক্র্যাফট।

ওদের মুখের কী দশা হয়েছিল, স্পিলেট বললেন, তা জানবার জন্যে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

একটু গর্বের স্বরে পেনক্রাফট বললে : গোটা বুদ্ধিটা কিন্তু আমার মগজেই এসেছিল প্রথম।

চমৎকার বুদ্ধিটা-হাসতে-হাসতে বললেন স্পিলেট, কারণ তার দরুনই তো আজ আমাদের এই দুরবস্থা!

রিচমরে বদমায়েশগুলোর হাতে বন্দী হয়ে থাকার চাইতে এই দ্বীপে সারা জীবন কাটানোও আমি ভালো বলে মনে করি! পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে বললে।

.

১.৮ নতুন আস্তানার সন্ধানে

আজ সতেরোই এপ্রিল।

আগের দিন প্রাতরাশের পর তারা চিমনি থেকে সাত মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপ পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। এর ফলে কাঁচা লোহার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সেই লোহাকে পরিশুদ্ধ করে না-নিলে কোনো কাজেই লাগানো অসম্ভব। সুতরাং সাইরাস হার্ডিং ভোরবেলা পেনক্র্যাটকে ডেকে বললেন: পেনক্র্যাফট, এবার কিন্তু তোমাকেই

সবচেয়ে বেশি কেরামতি দেখাতে হবে। আমার এখন কয়েকটা সীল চাই। পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগকে আলাদা করে নিতে হবে।

পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগকে আলাদা করতে সীল চাই কেন? বিস্মিত, হয়ে শুধোলে পেনক্র্যাফট।

সীলের চামড়া দিয়ে হাপর বানাতে হবে। সাইরাস হার্ডিং জানালেন : হাপর ছাড়া লোহা আগুনে তাতানো যাবে না।

গোটা দিনটা কাটল নীল শিকারে। পেনক্র্যাফটের নেতৃত্বে সবাই মিলে বেশ কয়েকটা সীল মারলেন। সীলের চর্বি থেকে তেল পাওয়া যাবে-চামড়া দিয়ে হাপরও বানানো চলবে। সুতরাং সীল-শিকার তাদের কাছে সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর গুরুত্ব দিয়েছিল বলে প্রচুর পরিশ্রম করে পেনক্র্যাফট সীল শিকার করলে।

বিশে এপ্রিলের মধ্যেই একটা বেশ-বড়ো হাপর তৈরি হয়ে গেল। মাউন্ট ফ্রাঙ্কলিনের। নিচে, চিমনি থেকে ছ-মাইল দূরে, বিপুল পরিমাণ কয়লা আর পাথুরে লোহা পাওয়া গেল। হার্ডিং ঠিক করলেন, ওইখানেই তাদের লোহার কারখানা বসবে। প্রত্যেকদিন এখান থেকে। চিমনিতে ফেরা সম্ভব নয় বলে গাছের ডাল দিয়ে ছোট্ট একটা কুটির তৈরি করা হল ওখানে। তাতে একটা সুবিধে হল এই যে, দিন-রাত্রি কাজ করা চলবে।

পাথুরে লোহা থেকে লোহার ভাগ আলাদা করা রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। পঁচিশে এপ্রিলের আগে তো কোনোরকমেই পরিশুদ্ধ লোহা পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত যখন

পঁচিশে এপ্রিল বিকেলের দিকে কয়েক তাল বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া গেল, সবাই আনন্দে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন। তারপর অনেকবার চেষ্টা করে অনেক পরিশ্রম করে কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র তৈরি করলেন ওঁরা। কুঠার প্রভৃতি যে-সব সাধারণ জিনিশ এঁরা বানালেন, তা-ই ওঁদের অমূল্য রত্নের সমান হয়ে উঠল। মোটামুটিভাবে কাজ চালানোগোছ কয়েকটা জিনিশ বানানো গেলেও, ইস্পাত কিন্তু প্রথমটা তৈরি করা সম্ভব হয়নি। ইস্পাত তৈরি করতে হয় লোহার সঙ্গে কয়লা মিশিয়ে; ওই মিশ্রণে যদি কোনো-একটার পরিমাণ বেশি হয়ে পড়ে, তবে কিন্তু ইস্পাত তৈরি করা যাবে না। সুতরাং ইস্পাত তৈরি করাটা সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মে মাসের পাঁচ তারিখের মধ্যে তারা যখন ইস্পাতের তৈরি বিশেষ প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিশ তৈরি করতে পারলেন, তখন পেনক্র্যাফটের আনন্দ দ্যাখে কে!

জিনিশপত্রগুলো দেখতে অবিশ্যি খুবই বিশ্রী হল, কিন্তু তবু এই কর্মকারের দল একটুও নিরুৎসাহ অনুভব করলেন না। কাজ চললেই তো হল–সুন্দর অসুন্দর ধুয়ে জল খেলেই তো চলবে না!

ছয়ই মে দ্বীপে বিষম ঠাণ্ডা পড়ল : সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পারলেন, শীত আসছে। ঠাণ্ডাতে হয়তো না–ঘাবড়ালেও চলে, কিন্তু আকাশে বর্ষার পূর্বাভাস দেখে হার্ডিং খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মধ্য-সাগরের এই নির্জন দ্বীপে বর্ষার যে কী ভয়ংকর রূপ হবে, তা কল্পনা করে হার্ডিং ঠিক করে ফেললেন, শিগগিরই নতুন-একটি আস্তানা চাই এবার। বর্ষাকালে যে-চিমনিতে সাগরের জল ঢুকবে না তা-ই বা কে বলতে পারে! আগে যে সাগরের জল ঢুকেছিল, তার প্রমাণ প্রথম দিনেই পাওয়া গিয়েছিল, পাঠকদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে। প্রথম দিনে চিমনিতেই সামুদ্রিক ঝিনুক আবিষ্কার করেছিল পেনক্র্যাফ্ট।

সুতরাং শিগগিরই যে নতুন একটা আস্তানা চাই এ-বিষয়ে কারু একটুও মতদ্বৈধ রইল না। এ ছাড়া সাইরাস হার্ডিং আরো বললেন যে, বাসস্থান সম্পর্কে তাদের খুব সাবধান হওয়া উচিত। কেননা, যদিও এই দ্বীপে এখনও পর্যন্ত জংলি অধিবাসীদের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি, হিংস্র জানোয়ার তো আছে। এই ক-দিনে দু-একবার তাদের সাক্ষাৎও পাওয়া গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের এই অঞ্চলে যে মালয় বোম্বেটেরা ঘাঁটি করে থাকে, সে-কথাও হার্ডিং আবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

নতুন আস্তানার অবস্থান যাতে মার্সি নদী আর লেক গ্ল্যান্টের কাছাকাছি হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কেননা, দ্বীপের মধ্যে এই এলাকাই সবচাইতে ভালো। গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড়ের মধ্যে যদি কোনোরকমে একটা আস্তানা করা যায়, তাহলেই সবচেয়ে ভালো। কেননা, গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল ঝড়-ঝঞ্জার হাত থেকে যেমনি রক্ষা করবে, তেমনি রক্ষা করবে হিংস্র জানোয়ার কিংবা বোম্বেটেদের হাত থেকে।

সেদিনই সবাই নতুন আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। লেক গ্ল্যান্টের জলের উৎস হল পাহাড়ের বেশখানিকটা উপরের একটি ঝরনার জল। কিন্তু হ্রদের অতিরিক্ত জল যে কোনদিক দিয়ে বেরিয়ে সাগরে পড়ে, সেটা কোনোমতেই জানা যায়নি। লেক গ্ল্যান্টের তীর দিয়েই সবাই দ্বীপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আস্তানার জন্যে যে-রকম জায়গা। আর সুবিধে তাঁরা চাইছিলেন, সে-রকম কোনো জায়গা কিন্তু আবিষ্কার করা গেল না।

সাইরাস হার্ডিং কিন্তু ভেবেছিলেন যে হ্রদের সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ আছে। কিন্তু এই সংযোগস্থল আবিষ্কার করা গেল না। অনেক ঘোরাঘুরি করেও যখন সেই সংযোগস্থল

পাওয়া গেল না, অথচ সন্ধে হয়ে এল, তখন হার্ডিং ঠিক করলেন পরদিন তিনি আবার এসে ভালো করে খুঁজে দেখবেন সংযোগস্থলটি, কারণ তিনি নিশ্চিত যে অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়বার একটা পথ কোথাও আছেই।

পরদিন সকালবেলাতেই স্পিলেট আর হার্ডিং আবার হ্রদের কাছে এলেন, সমুদ্রের সঙ্গে হ্রদের সংযোগ-পথটি খুঁজে বার করবার জন্যে। ওঁরা দুজনে কথা বলতে-বলতে পথ চলতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায় এসে হার্ডিং-এর নজরে পড়ল, হ্রদের জলে তীব্র স্রোত। সেই স্রোতের মধ্যে কয়েকটা কাঠের টুকরো তিনি ফেলে দিলেন। হ্রদের দক্ষিণ দিক অভিমুখে সেই কাঠের টুকরোগুলো ভেসে চলল। সেই স্রোত অনুসরণ করে তাঁরা হ্রদের দক্ষিণ সীমান্তে এসে পৌঁছুলেন। সেখানে হ্রদের জলে তীব্র একটা ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি হয়েছে; হঠাৎ সেখানে এসে জল যেন অনেকটা নিচে পাতালে চলে যাচ্ছে। হার্ডিং উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলেন। হ্রদের সমতল মাটিতে কান লাগিয়ে একটা জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে তার বিলম্ব হল না।

উঠে দাঁড়িয়ে হার্ডিং বললেন : এইখান দিয়েই অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। নিঃসন্দেহে গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালের মধ্য দিয়ে কোনো পথ আছে। যে-করেই হোক সেই পথটি বার করতেই হবে।

লম্বা একটা গাছের ডাল কেটে নিলেন হার্ডিং। তারপর সেটাকে জলে ডুবিয়ে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে জলের সমতলের এক ফুট নিচে, তীরের গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে একটা গর্ত আছে বলে বোঝা গেল। সেখানে জলে এত তীব্র স্রোত যে, ক্যাপ্টেনের হাত থেকে তীরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল ডালটি এবং পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আবার বললেন হার্ডিং : এবার আর-কোনো সন্দেহই নেই-এখানেই অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যাবার পথ। এই পথটিকে দৃষ্টিপথে আনতেই হবে।

কী করে আনবেন? শুধোলেন স্পিলেট।

জলের সমতলটা তিন ফুট নিচে নামিয়ে দিয়ে।

কিন্তু কী করে নামাবেন?

এর চেয়ে বড়ো আর-একটা জল বেরুবার পথ করে দিয়ে।

কোন জায়গায় আপনি সেই পথটা করবেন?

উপকূলের সবচেয়ে কাছে যে-তীর, সেখানে।

কিন্তু সেখানে তো গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল!

তা জানি। উত্তর দিলেন হার্ডিং। ওই গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল আমি উড়িয়ে দেবো। ওইদিকে পথ পেয়ে জলের সমতল অনেক নেমে যাবে, তাহলেই এই পথটা–

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

এবং তীরে একটা জলপ্রপাত তৈরি করে–স্পিলেট বললেন।

–সেই জলপ্রপাত আমরা কাজে লাগাবো। সাইরাস হার্ডিং বললেন : চলুন, এবার ফেরা যাক।

দ্রুতপদে তারা চিমনিতে ফিরে এলেন। পেনক্র্যাফট আর হার্বার্ট তখন সদ্য-সদ্য বন থেকে কাঠ কেটে বোঝা নিয়ে ফিরেছে। তাঁদের দেখেই পেনক্র্যাফট হেসে বললে : কাঠুরেরা এইমাত্র তাদের কাজ শেষ করে ফিরল, ক্যাপ্টেন। এবার আপনি যদি রাজমিস্ত্রি চান, তবে তা-ও আমরা হতে পারি।

রাজমিস্ত্রি? হার্ডিং বললেন : না-না, এবার চাই রাসায়নিক।

জানো পেনক্র্যাফট, আমরা এবার দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে চলেছি। জানালেন স্পিলেট।

দ্বীপটা উড়িয়ে দিতে চলেছি! চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট।

গোটা দ্বীপটা নয়,–স্পিলেট হাসলেন : একটা অংশ মাত্র।

তখন হার্ডিং তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সবার কাছে খুলে বললেন। সব শুনে হার্বার্ট বললে : ডাইনামাইট ছাড়া ওই গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল আপনি উড়িয়ে দেবেন কী করে?

ডাইনামাইটের চেয়েও শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরি করে।

পরদিন, মে মাসের আট তারিখে, ক্যাপ্টেন হার্ডিং বেশ কিছু পরিমাণ সালফারেট অভ আয়রন সংগ্রহ করলেন। আগ্নেয়গিরির কল্যাণে দ্বীপে এইসব খনিজ পদার্থের কোনো অভাব ছিল না। সালফারেট অভ আয়রন থেকে সালফেট বার করে নিতে খুব-বেশি দেরি হল না। সালফেট পাওয়া গেলে সালফিউরিক অ্যাসিডের আর ভাবনা কী?

চিমনির পিছনে নিখুঁত সমতল একটি জায়গা বার করে নিলেন হার্ডিং। সেইখানেই তৈরি করলেন তার ল্যাবরেটরি। আর ল্যাবরেটরিতেই প্রস্তুত হল সালফিউরিক অ্যাসিড।

সীলের চর্বি থেকে গ্লিসারিন বার করতেও কোনো অসুবিধে হল না। কেননা দ্বীপে চুনের কোনো অভাব নেই। রসায়ন নিয়ে যারাই সামান্য নাড়াচাড়া করেছে তারাই জানে, চর্বি থেকে গ্লিসারিন বার করতে হলে চুন কিংবা সোডার প্রয়োজন। সোডাও দ্বীপে পাওয়া গেল, কেননা ক্ষারযুক্ত গাছের অভাব নেই দ্বীপে; আর সেই গাছ থেকে সোজা বার করে নেয়া খুব বেশি কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়।

সালফিউরিক অ্যাসিড আর গ্লিসারিন যখন জোগাড় করা গেল, তখন প্রয়োজন পড়ল অ্যাজোট অভ পটাশ-এর। এই অ্যাজোট অভ পটাশ সল্টপিটার নামেই অভিহিত হয়। আজোটিক অ্যাসিডের সাহায্যে সহজেই উদ্ভিদসমূহের মধ্য থেকে কার্বনেট অভ পটাশ পাওয়া যায়। কিন্তু অ্যাজোটিক অ্যাসিড পাওয়াটা মুশকিলের ব্যাপার হয়ে উঠল। তবে, সৌভাগ্যবশত ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের পাদদেশে অতি সামান্য সল্টপিটার পাওয়া গেল। হার্ডিং তাকে পরিশুদ্ধ করে নিলেন। এইসব কাজেই কেটে গেল এক সপ্তাহ। এই ক-দিনে চুনবালি-কাদা দিয়ে একটা ফারনেস তৈরি করে নিয়েছিলেন হার্ডিং। সেই ফারনেসের সাহায্যে সালফারেট অভ আয়রন থেকে সালফিউরিক অ্যাসিড আর সল্টপিটার একত্র

করে অ্যাজোটিক অ্যাসিড পাওয়া গেল। সেই অ্যাজোটিক অ্যাসিড আর গ্লিসারিন মিশিয়ে হার্ডিং তার বহু-আরাধ্য বিস্ফোরক পেলেন—সামান্য একটু তেলতেলে হলদে তরল পদার্থ। একটা বোতলের মধ্যে সেই বহু-আরাধ্য পদার্থটি নিয়ে হার্ডিং সবাইকে বোতলটি দেখালেন, বললেন : এই হল তোমাদের নাইট্রোগ্লিসারিন।

সেদিন হল মে মাসের বিশ তারিখ।

চোখ মাথায় তুলে পেনক্র্যাফট বললে : এই কয়েক ফোঁটা নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে আপনি গ্র্যানাইট পাথর উড়িয়ে দেবেন?

হ্যাঁ। হার্ডিং বললেন : কালকেই নিজের চোখে সব দেখতে পাবে।

পরদিন একুশে মে ভোরবেলা সবাই লেক এ্যান্টের পুব তীরে গিয়ে হাজির হলেন।

জায়গাটা সমুদ্র-উপকুল থেকে মাত্র পাঁচশো ফুট দূরে। এই জায়গাতেই মাটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল না-থাকলে হ্রদের জল ঝরনার মতো হয়ে গিয়ে বেলাভূমির কাছে নেমে যেতো। যদি গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালটি উড়িয়ে দেয়া যায়, তবে জলের সমতল অনেক নিচে চলে যাবে-এবং সঙ্গে সঙ্গে যে-বহিথ দিয়ে হ্রদের অতিরিক্ত জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, তা দৃশ্যমান হবে।

হার্ডিং-এর নির্দেশমতো পেনক্র্যাফট একটি শাবল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। হ্রদের তীরে গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে একটু জায়গা নির্দেশ করলেন হাডিং 1 পেনক্র্যাফট সেখানে একটা গর্ত করতে লাগল। গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে গর্ত করা মোটেই সোজা ব্যাপার

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

নয়। অথচ গর্তটা একটু গভীর করা প্রয়োজন। সুতরাং, একটু পরে যখন পেনক্র্যাফটের শরীর দিয়ে ঝরঝর করে ঘাম ঝরতে লাগল, তখন নেব পেনক্র্যাফটের হাত থেকে শাবলটা নিলে।

বেলা চারটের সময় গর্ত করা হয়ে গেল। সেই গর্তের মধ্যে হার্ডিং অতি সন্তর্পণে নাইট্রো-গ্লিসারিনের বোতলটা রাখলেন।

এবার সেই বিস্ফোরককে অগ্নিসংযোগের প্রশ্ন উঠল। কয়েকটি গাছের ছাল দিয়ে একটা লম্বা দড়ির মতো তৈরি করা হল। তারপর সেই দড়িটা সালফিউরিক অ্যাসিডে ভিজিয়ে নিয়ে তার একটা মুখ ওই গর্তটায় ঢুকিয়ে দেয়া হল। ঠিক হল এর অন্য প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করা হবে। গোটা দড়িটা পুড়তে পঁচিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

দড়িটার এক প্রান্তে অগ্নিসংযোগ করে সবাই দৌড়ে চিমনিতে ফিরে এলেন। ঠিক পঁচিশ মিনিট বাদে অতি ভয়ংকর একটি বিস্ফোরণের শব্দে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড এত জোরে কেঁপে উঠল যে, মনে হল যেন সাংঘাতিক একটি ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। বড়ো-বড়ো পাথরের চাঁই ছিটকে পড়ল ফ্রাঙ্কলিন পর্বতের গা থেকে, যেন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার, শুরু হয়েছে।

বিস্ফোরণের স্থান থেকে চিমনি প্রায় দু-মাইল দূরে অবস্থিত হলেও, সবাই চিমনির ভিতরে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। সংবিৎ ফিরে পেয়ে সবাই ছুটলেন লেক গ্ল্যান্টের দিকে। একটু পরেই সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দে।

গ্র্যানাইট পাথরের দেয়ালে বেশ বড়ো আকারের একটি পথ দেখা গেল। হ্রদের ফেনিল জল সেই পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে তিনশো ফুট নিচে সমুদ্র-সৈকতে আছড়ে পড়ছে।

.

১.৯ গ্র্যানাইট হাউস

নতুন বহির্পথটির পরিধি এত বড়ো হল যে, দেখা গেল অল্প সময় পরেই হ্রদের জলের সমতল তিন ফুটের মতো নেমে গেছে। সবাই তখন চিমনিতে ফিরে এলেন। কুঠার, শাবল ইত্যাদি কিছু হাতিয়ার নিয়ে সবাই এবার রওনা হলেন হ্রদের পুরোনো বহিপথের সন্ধানে। টপ এবার তাদের সঙ্গে চলল।

রাস্তায় পেনক্র্যাফট হার্ডিংকে একটা কথা জিজ্ঞেস না-করে পারলে না। শুধোলে : আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আপনার ওই নাইট্রোগ্লিসারিন দিয়ে কি কেউ এই গোটা দ্বীপটাকে উড়িয়ে দিতে পারে না?

কোনো সন্দেহ নেই তাতে। শুধু এই দ্বীপ কেন-হার্ডিং জবাব দিলেন, দেশ, মহাদেশ এমনকী দুনিয়া পর্যন্ত উড়িয়ে দেয়া যায়। প্রশ্ন শুধু পরিমাণের।

বন্দুকে কি এই নাইট্রোগ্লিসারিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন না? শুধধলে পেনক্র্যাফট।

না পেনক্র্যাফট এটি একটি সাংঘাতিক বিস্ফোরক। বন্দুকের জন্যে সাধারণ বারুদ তৈরি করা মোটেই কঠিন নয়। অ্যাজোটিক অ্যাসিড সল্টপিটার, গন্ধক, কয়লা—কিছুরই অভাব নেই এই দ্বীপে। কিন্তু দুর্ভগ্যবশত একটিও বন্দুক নেই আমাদের।

পেনক্র্যাফট উত্তর করলে : ক্যাপ্টেনের সামান্য ইচ্ছে থাকলেই—

লিঙ্কন দ্বীপের অভিধান থেকে অসম্ভব কথাটা মুছে ফেলেছিল পেনক্র্যাফট।

খানিকক্ষণ বাদেই হ্রদের পুরোনো বহির্পটির সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। গ্র্যানাইট পাথরের মধ্য দিয়ে টানেলের মতো পথ চলে গেছে। বাইরে থেকে দেখা গেল ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে সেই পথটি। টপ তো সোজা সেই টানেলের ভিতর প্রবেশ করল। টানেলটা দেখে মনে হল, কেউ যেন কোনো উদ্দেশ্যে পাহাড় কেটে তা প্রস্তুত করেছে। হার্ডিং খুব ভালো করে বুঝতে পারলেন যে, টানেলটার বয়স দ্বীপের বয়সের কম হবে না। সম্ভবত এই ঢালু টানেলটা গিয়ে পড়েছে একেবারে সমুদ্রের সমতলে।

হার্বার্ট বললে : চলুন, এবার ভিতরে ঢোকা যাক।

চলো-বলে হার্ডিং সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন, চীৎকার করতে করতে টপ ভিতর থেকে ছুটে আসছে।

নেব বিরক্ত হয়ে বললে : তোর আবার কী হল রে টপ, অত ডাকছিস কেন?

সবাই টানেলের ভিতর প্রবেশ করলেন। টপ গর্জন করতে-করতে ছুটতে ছুটতে সেই টানেলের অভ্যন্তরে এগিয়ে চলল। আস্তে আস্তে সেই ঢালু সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নামতে লাগলেন সকলে। এই না-জানা পাতালের দিকে প্রথম চলেছেন তারা–এই কথা ভেবে তাদের মনে ঈষৎ ভীতি এবং একটু বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। কেউ একটিও কথা বলছিলেন না। এমনও তো হতে পারে, এই সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে কোনো সামুদ্রিক জীবজন্তু বাস করে! তাদের সঙ্গে দেখা না-হলেই ভালো একহিশেবে।

পিচ্ছিল, ঢাল সুড়ঙ্গপথ দিয়ে প্রায় একশো ফুট নামবার পরে সবাই একটা চওড়া গহ্বরের মতো জায়গায় এসে থামলেন। ছাদ থেকে তখনো ফেঁাটা-ফোঁটা জল পড়ছিল। একটু স্যাঁতসেঁতে ভাব থাকলেও হাওয়া সেখানে বিশুদ্ধ।

ক্যাপ্টেন, গিডিয়ন স্পিলেট বললেন : এই হল নিরাপদ আস্তানা-একেবারে পাহাড়ের অভ্যন্তরে। কিন্তু তবু বাসযোগ্য নয়।

বাসযোগ্য নয় কেন? নাবিক পেনক্র্যাফটের গলা শোনা গেল।

কারণ এ-জায়গাটা খুব ছোটো, আর অন্ধকার।

কেন, এটাকে কি বড়ো করা যায় না? আলো-হাওয়ার জন্যে দু-একটা জানলা করে নিলেই চলে।

পেনক্র্যাফট তার অভিধান থেকে অসম্ভব কথাটা একেবারেই মুছে ফেলে দিয়েছিল।

চলো এগিয়ে চলো। সাইরাস বললেন : সবে তো তিনভাগের একভাগ পথ মাত্র এসেছি। আরো, নিচে হয়তো দেখতে পাবো প্রকৃতি আমাদের সমস্ত পরিশ্রম লাঘব করে রেখেছে।

টপ কোথায়? হঠাৎ নে একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল।

চারদিকে তাকালেন সবাই। মশালের আলোয় তন্ন-তন্ন করে দেখলেন জায়গাটা। কিন্তু টপকে দেখা গেল না।

পেনক্র্যাফট বললে : টপ হয়তো এগিয়ে গিয়েছে।

চলো—আমরাও এগোই। হার্ডিং বললেন।

আবার সবাই নিচে নামতে লাগলেন। আরো পঞ্চাশ ফুট এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়ালেন। অনেক তলা থেকে কীসের একটা শব্দ যেন ভেসে আসছে।

একটু কান পেতে শুনেই হার্বার্ট বললে : আরে! এ-যে টপ ডাকছে!

হ্যাঁ, পেনক্র্যাফট বললে : ভীষণভাবে ডাকছে টপ!

শাবল আর কুঠারগুলো বাগিয়ে ধরে সাবধানে এগিয়ে চলো। হার্ডিং-এর নির্দেশ পাওয়া গেল।

দ্রুতপদে টপকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে চললেন সকলে। টপের ডাক ক্রমশই বাড়ছিল—সাংঘাতিকভাবে ডাকতে লাগল সে।

কোনো সামুদ্রিক জন্তুর দেখা পেয়েছে কি টপ? সাইরাস হার্ডিং একটু নিচু গলায় বললেন : বিনা কারণে তো টপ কখনো এত উত্তেজিত হয় না! নিশ্চয়ই কোথাও কিছুএকটা ঘটেছে, আমরা বুঝতে পারছি না।

আরো ষোলো ফুটের মতো নামবার পর টপের দেখা পাওয়া গেল। সেখানটা বিশাল এবং চমৎকার একটা চত্বরের মতো। টপ খুব উত্তেজিত হয়ে ছুটোছুটি করে ডাকতে লাগল। মশালের আলো জ্বেলে খুব সতর্কভাবে চারদিক দেখলেন সবাই। কিন্তু বিপুল গুহাটি শূন্য, একেবারে ফঁকা। প্রত্যেকটি কোণে গিয়ে পরীক্ষা করলেন তখন। কোনো জন্তু বা মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কিন্তু তবু টপ ডেকেই চলল একটানা। ভয় দেখিয়ে বা চুপ করতে নির্দেশ দিয়েও টপকে থামানো গেল না।

হার্ডিং বললেন : এই গুহার মধ্যে এমন-একটা পথ নিশ্চয়ই আছে, যেখান দিয়ে হ্রদের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে।

নিশ্চয়ই, পেনক্র্যাফট বললে : সাবধানে চলাফেরা করতে হবে আমাদের। ও-রকম কোনো গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেই সর্বনাশ!

হার্ডিং ডাকলেন : টপ, টপ, চল।

হার্ডিং-এর কথায় উত্তেজিত হয়ে টপ ছুটে গেল গুহাটির একেবারে প্রত্যন্ত প্রান্তে — সেখানে গিয়ে দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করতে লাগল। টপকে অনুসরণ করে সে-জায়গায় পৌঁছে দেখা গেল, গ্র্যানাইট পাথরের কোলে রীতিমত একটা কুয়ো সেখানে। এই কুয়ো

দিয়েই হ্রদের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। কুয়োটা সোজা নেমে গেছে। সুতরাং এর ভেতর ঢুকে পরীক্ষা করে দেখাটা সম্ভব নয়। কুয়োর মুখের কাছে মশাল ধরা হল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। হার্ডিং একটা জ্বলন্ত মশাল কুয়োর মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ছলাৎ করে একটা শব্দ শোনা গেল, বোঝা গেল মশালটা সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সমুদ্রের জলে পড়তে মশালটার যত সময় লাগল তা হিশেব করে হার্ডিং কুয়োর গভীরতা নির্ণয় করলেন। প্রায় নব্বই ফুট গভীর হবে কুয়োটা। গহ্বরের মেঝে তাহলে সমুদ্রতলের নব্বই ফুট উপরে অবহিত!

হার্ডিং বললেন : এই হল আমাদের নতুন আস্তানা।

কিন্তু এই জায়গায় নিশ্চয়ই কোনো প্রাণী থাকে? স্পিলেটের কৌতূহল তখনো নিবৃত্ত হয়নি। হয়নি।

সে-প্রাণী এতক্ষণে ওই কুয়ো দিয়ে সমুদ্রে চলে গেছে, হার্ডিং উত্তর দিলেন। জায়গাটা আমাদের দিয়ে গেছে।

সত্যিই প্রশস্ত গহ্বরটা বাসের পক্ষে খুব ভালো। এত চওড়া, যে অনায়াসেই ইটের গাঁথুনি দিয়ে দেয়াল তুলে কয়েকটা কামরায় ভাগ করে নেয়া সম্ভব। তবে, দুটো অসুবিধে আছে। প্রথমত, এই পাথরের তৈরি হায় আলো পাওয়া যাবে কী করে, আর দ্বিতীয়ত, সংস্কার করে আরো স্বাচ্ছন্দ্য আনতে হবে। গ্রানাইটের পুরু ছাদ ভেদ করে আলোর পথ করে দেয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, তবে, সমুদ্রের দিকের দেয়ালে কয়েকটা জানলা তৈরি করা সম্ভব হতে পারে। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতো পেনক্র্যাফট সমুদ্রের দিকের

দেয়ালে শাবল দিয়ে ঘা মারতে লাগল। একটু পরে স্পিলেট গিয়ে তার স্থান গ্রহণ করলেন, তারপর নেব কাজে লাগল। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরও যখন সবাই দেয়ালে জানলা করবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন এমন সময় নেবের শেষ একটা আঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে শাবলটা ছিটকে পাথরের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে পড়ল। হার্ডিং মেপে দেখলেন, দেয়ালটা তিন ফুট পুরু। সেই ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালেন ক্যাপ্টেন। দেখতে পেলেন, প্রায় আশি ফুট নিচে সমুদ্র-সৈকত, তারপর সেফটি আইল্যাণ্ড, তারও পর উত্তাল সমুদ্রের নীল জল। সেই ফাঁক দিয়ে বন্যার মতো ছুটে এলো আলো। তখন ভালো করে গহ্বরটি দেখতে পাওয়া গেল। বিরাট গহ্বরটি-বাঁ দিকে ত্রিশ ফুট উপরে ছাদ, ডান দিকে ছাদ আশি ফুট উপরে। মাঝে-মাঝে শূন্যে মাথা তুলেছে গ্র্যানাইট পাথরের থাম। অনায়াসেই একাধিক কক্ষে গহ্বরটি ভাগ করা সম্ভব হবে। যেখানে মাথা গোঁজবার জন্যে সামান্য একটা আশ্রয় চাচ্ছিলেন, সেখানে এই বিরাট আস্তানা পেয়ে সবাই আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : প্রথমেই কয়েকটা জানলা বানাতে হবে। গোটা গুহাটা আলোকিত হয়ে গেলে পর বাঁ দিকে আমরা থাকবার ঘর আর ভাড়ার বানাবো, আর ডান দিকের অংশটুকু হবে আমাদের স্টাডি আর জাদুঘর।

হাবার্ট জিগেস করল : আমাদের নতুন আস্তানার নাম কী হবে?

গ্র্যানাইট হাউস। হার্ডিং উত্তর করলেন।

ঠিক হল, পরদিন থেকেই গ্র্যানাইট হাউসের কাজ শুরু হয়ে যাবে। তখন তারা ফিরতি পথ ধরলেন। ফেরার আগে আবার কুয়োর কাছে এসে ভিতরে দৃষ্টিপাত করলেন হার্ডিং। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না।

সবাই যখন সেই গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন, তখন প্রায় চারটে বাজে।

পরদিন বাইশে মে থেকে নতুন আস্তানা গড়ে তোলবার কাজ শুরু হয়ে গেল। প্রথমেই ভারি একটা ঢাকনি গড়ে তোলবার কাজ। কুয়োটার মুখ এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হল, যাতে উপর থেকে সেই ঢাকনি খোলা গেলেও কুয়োর ভিতর থেকে সেই ঢাকনি মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী খুলতে না-পারে। পাঁচটি জানলা এবং একটি দরজা বানানো হলযাতে বাইরে থেকে আলো-হাওয়া আসে। সমুদ্রমুখী পাঁচটি কক্ষে গুহাটিকে বিভক্ত করা হল। ডানদিকে একটি পথ—সেখান থেকে নিচে ঝোলানো সিঁড়ির ব্যবস্থা করা হল। কেননা দ্বীপে কোনো লোক না-থাকলেও মালয় বোম্বেটেরা হয়তো দ্বীপে আসতে পারে—তারা যাতে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করতে না-পারে, এইজন্যেই ঝোলানো সিঁড়ির ব্যবস্থা। ঠিক হল সবাই যখন বাইরে যাবেন তখন সিঁড়িটি ফেলে দেয়া হবে-ফিরে আসবার পর আবার তুলে ফেলা হবে। প্রবেশ-পথের পরেই ত্রিশ ফুট লম্বা একটি রান্নাঘর। তারপর প্রায় চল্লিশ ফুট লম্বা খাওয়ার ঘর। এর পরে ঠিক তত বড়ো একটি শোবার ঘর, আর সবশেষে বিরাট একটি হলঘর–ভঁদের বৈঠকখানা। এছাড়াও গহ্বরের মধ্যে যে-জায়গা ছিল, তাতে একটি ভাড়ার ঘর বানানো হলআর বাকিটুকু করিডর হিশেবে ব্যবহারের জন্যে রাখা হল। যে-টানেলটি দিয়ে হ্রদের জল গহ্বরে প্রবেশ করতো, হঁটের দেয়াল দিয়ে সেটা বন্ধ করে দেয়া হল। ঝোলানো সিঁড়িটা খুব সতর্কভাবে অত্যন্ত মজবুত করে বানানো হল। সেই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করাটা অসুবিধে হলেও

নিরাপত্তার পক্ষে প্রচুর সহায়ক। আঠাশে মে ঝোলানো সিঁড়িটা নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হল প্রায় আশি ফুট লম্বা সিঁড়ি-একশোটার মতো সোপান তাতে। সৌভাগ্যবশত সিঁড়িটা দু-ভাগে ভাগ করা গেল। মাটি থেকে চল্লিশ ফুট উপরে

একটি পাথরের চাই-প্রকৃতি যেন তাদের জন্যে আগে থেকেই একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে রেখেছে। সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে দ্বিতীয় সিঁড়ি শুরু হল। সুতরাং তাদের ওঠানামা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হল। পেনক্র্যাফট টপকে শিখিয়ে দিতে শুরু করলে কী করে ওই সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। টপ কিছুদিনের মধ্যেই সার্কাসের কুকুরের মতো ওই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ওঠানামা করতে সক্ষম হল।

গোটা জুন মাসটা কাটল গ্র্যানাইট হাউসকে গড়ে তুলতে। ইতিমধ্যে দিন ছোটো হয়ে আসছিল—আস্তে-আস্তে শীত পড়ছিল। শীতের সময় হয়তো সবদিন বাইরে বেরুনো সম্ভব না-ও হতে পারে, তাই শীতের জন্যে খাদ্য সঞ্চয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়ছিল। হার্বার্ট আর স্পিলেটের উপর ভার পড়ল শিকারের। মার্সি নদীর পাশের অরণ্যে শিকারের অভাব। নেই। সুতরাং প্রত্যেকদিনই বেশকিছু পরিমাণ খাদ্য সংগৃহীত হতে লাগল। ইতিমধ্যে একদিন সীল শিকারেও বেরিয়েছিলেন সবাই। সীলের চর্বি দিয়ে মোমবাতি প্রস্তুত করা যায়। সেই মোমবাতি বানানোর জন্যেই সীল-শিকারে গেলেন সবাই। সৌভাগ্যবশত তিনটে সীল শিকার করা সম্ভব হল। সুতরাং কিছুকালের জন্যে যে আলোর ভাবনা ভাবতে হবে না, সেই আশ্বাস পেয়ে সবাই খুব খুশি হয়ে উঠলেন। সালের চামড়া দিয়ে সবাই একজোড়া করে জুতো তৈরি করে নিলেন। বলা বাহুল্য দেখতে জুতোগুলো ভালো হল না, কিন্তু কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

জুন মাসের গোড়া থেকেই মাঝে-মাঝে কয়েক পশলা করে বৃষ্টি হতে লাগল। একদিন বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। সবাই সেদিন গ্র্যানাইট হাউসের বৈঠকখানায় বসে মোমবাতি তৈরি করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ হার্বার্ট চেঁচিয়ে উঠল : এই দেখুন ক্যাপ্টেন, একটা গমের দানা! এই বলে সে সবাইকে একদানা গম—মাত্র একটি দানা-দেখালো। দানাটা তার ওয়েস্ট-কোটের লাইনিং-এ আটকে ছিল। রিচমণ্ডে থাকতে হার্বার্ট কয়েকটা পায়রা পুষেছিল–নিজের হাতে তাদের সে খাওয়াতে। খুব-সম্ভব সেই সময়কারই গম এটি।

একটা গমের দানা? তক্ষুনি উৎসুক কণ্ঠে ক্যাপ্টেন শুধোলেন।

হ্যাঁ ক্যাপ্টেন। কিন্তু একটা–মাত্র একটা দানা!

পেনক্র্যাফট হো হো করে হেসে উঠল : একটা গমের দানা দিয়ে আমরা করবো–কী?

এমন কী চঁচিয়ে বলার মতো ব্যাপার এটা?

রুটি—আমরা রুটি পাবো এ থেকে! হার্ডিং বললেন।

রুটি, কেক-আরো কত-কী! হেসে উঠল পেনক্র্যাফট : চমৎকার! একটা মাত্র গমের দানা, অথচ তা নিয়ে কত স্বপ্ন!

হার্বার্ট দানাটা ফেলে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হার্ডিং দানাটা নিজের হাতে নিয়ে খুব ভালো করে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। একটু পরে পেনক্র্যাফটের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে

তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন : পেনক্র্যাফট, তুমি জানো একটা গমের দানা থেকে কটা অঙ্কুর হয়?

বিস্মিত হয়ে পেনক্র্যাফট বললে কেন? একটা বোধহয়।

না, দশটা। আর, একটা অঙ্কুরে কটা করে গমের দানা থাকে, জানো?

না।

প্রায় আশিটা। সাইরাস হার্ডিং বললেন : তাহলে, আমরা যদি এই গমের দানাটা রোপণ করি, তবে প্রথম বারে আটশোটা দানা পাব—দ্বিতীয় বারে তা থেকে পাবো ছশো চল্লিশ হাজার, তৃতীয় বারে পাঁচশো বারো লক্ষ, আর চতুর্থ বারে চারশো হাজার লক্ষেরও বেশি।

এই কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। সাইরাস হার্ডিং বলে চললেন : এই দ্বীপের আবহাওয়ায় বছরে দু-বার চাষ করা সম্ভব—সুতরাং দু-বছরের মধ্যেই আমরা বিরাট এক গম-খেতের মালিক হতে পারবো। সুতরাং হার্বার্ট, তোমার এই আবিষ্কার আমাদের কাছে। প্রায় অমূল্য। যে-কোনো কিছু-এখন যে-অবস্থায় আছি, তাতে প্রত্যেকটি তুচ্ছ জিনিশও আমাদের কাজে লাগবে, এ-কথা তোমরা কেউ ভুলে যেয়ো না, এই অনুরোধই তোমাদের করছি।

না ক্যাপ্টেন, না, আমরা কখনো ভুলবো না এ-কথা, উত্তর দিলে পেনক্র্যাফট : আচ্ছা এখন আমরা কী করবো?

এই গমের দানাটা রুইবো আমরা। উত্তর করলে হার্বার্ট।

হ্যাঁ। যোগ করলেন গিডিয়ন স্পিলেট : খুব সতর্কভাবে এটি রুইতে হবে। কেননা, এইটের ওপরই আমাদের ভবিষ্যৎ ফসল নির্ভর করছে।

যদি এটা থেকে অঙ্কুর না-বেরোয়? চেঁচিয়ে বললে পেনক্র্যাফট।

বেরুবেই। সাইরাসের দৃঢ় কণ্ঠ শোনা গেল।

সেদিন হল বিশে জুন। এই একটিমাত্র মহামূল্য গম রুইবার উপযুক্ত সময় তখন। প্রথমে ঠিক করা হল একটা টবের মধ্যে এটি রোয়া হবে, কিন্তু পরে ঠিক হল, প্রকৃতির হাতেই সব ভার ছেড়ে দেয়া হবে, মাটিতে রোয়া হবে এটি। সেইদিনই রোয়া হল এটি, আর কষ্ট করে না-বললেও চলে যে, যাতে এই পরীক্ষা সার্থক হয় সেজন্যে খুব সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল।

আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সবাই বেরিয়ে পড়লেন। গ্র্যানাইট হাউস ছাড়িয়ে আরো উপরের দিকে উঠে একটা সমতল জমির উপর খুব ভালো করে জায়গা করা হল গমটি রুইবার জন্যে। তারপর এর চারিদিকে একটা বাঁশের বেড়াও দেয়া হল, যাতে কোনো জীবজন্তু এটাকে নষ্ট করতে না-পারে। যদি এই গমটি কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায়, এই জনমানবহীন দ্বীপে আর-কোথাও আর-একটি গমের দানাও জোগাড় করা যাবে না।

.

১.১০ রহস্যের কালো মেঘ

সেইদিন থেকে পেনক্র্যাফট একদিনের জন্যেও তার গম-খেত দেখতে যেতে ভোলেনি।

যে-সব কীট সাহস করে ওই খেতের আশেপাশে ঘুরে বেড়াত, বলা বাহুল্য, তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র ক্ষমা প্রদর্শন করা হত না।

জুন মাসের শেষের দিকে আবহাওয়া ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ল দ্বীপে। উনত্রিশে জুন তো এমন ঠাণ্ডা পড়ল যে, যদি থার্মোমিটার থাকতো তবে তাতে নিশ্চয়ই কুড়ি ডিগ্রির বেশি তাপ ধরা পড়তো না। পরদিন এমন ঠাণ্ডা পড়ল যে তাকে তিরিশে জুন না-বলে অনায়াসে একত্রিশে ডিসেম্বর বলা চলে। মার্সি নদীর মুখে বরফ জমতে শুরু করল। লেক গ্ল্যান্টের দশাও শিগগিরই মার্সি নদীর মতো হয়ে গেল।

প্রায়ই সেই অসহ্য ঠাণ্ডার মধ্যে কাঠ আর কয়লা আনতে বেরুতে হত সবাইকে। এবার তাই মার্সি নদীকে কাজে লাগানো হল। কাঠ জড়ো করে বাণ্ডিল বেঁধে স্রোতে ভাসিয়ে দেয়া হলস্রোতে ভেসে-ভেসে তা গ্র্যানাইট হাউসের প্রায় নিচে এসে উপস্থিত হওয়ায় অনেক পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পেলেন তাঁরা।

এর মধ্যেই একদিন আবহাওয়া শুকনো থাকায় সবাই মিলে ঠিক করলেন, মার্সি নদী আর ক্ল অন্তরীপের মাঝখানের জায়গাটা দেখতে যাবেন। পাঁচই জুলাই সকাল ছটায় সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়লেন—তাঁদের অস্ত্র-শস্ত্র–মানে কুঠার, তীর-ধনুক,

বল্লম ইত্যাদি নিয়ে। মার্সি নদীর জল সব বরফ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের পক্ষে বেশ সুবিধেই হল। বরফের উপর দিয়েই মার্সি নদী হেঁটে পেরুনো গেল। পেরুবার সময় হার্ডিং বললেন : কিন্তু এই বরফ তো আর চিরকাল মার্সি নদীর উপর সেতুর ভূমিকায় কাজ করবে না, সুতরাং আমাদের আরো-একটা কাজ বাড়ল। এখানে একটা সেতু তৈরি করতে হবে।

দ্বীপের মধ্যকার অঞ্চল গ্র্যানাইট হাউসের পাশের অঞ্চলের থেকে একেবারে বিপরীত। এই দিককার জমি এত উর্বর যে দেখে রীতিমতো লোভ হয়। হার্ডিং এইসব দেখে বললেন : লিঙ্কন দ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চল দেখছি বিভিন্ন রকম। একটা ছোট্ট দ্বীপের জমিতে এত বৈচিত্র্য যে কী করে সম্ভব, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। এই দ্বীপের প্রকৃতি আর গঠন ভারি অদ্ভুত। একটা মহাদেশের সংক্ষিপ্তসার যেন এই দ্বীপটি! আগে কোনো মহাদেশের অংশ ছিল বলে যদি জানা যায়, তাহলেও বিস্মিত হবো না।

কী! প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে একটি মহাদেশ! বিস্মিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট।

অসম্ভব কী? উত্তর দিলেন হার্ডিং:অস্ট্রেলিয়া, নিউ-আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলেশিয়া ইত্যাদি যে এক ছিল না, তা কে বলতে পারে? আমার তো মনে হয়, বিশাল সমুদ্রের মধ্যে যেসব ছোটোখাটো দ্বীপ দেখা যায় তা সেই ষষ্ঠ মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চুড়ো মাত্র–প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে-মহাদেশটির অস্তিত্ব ছিল; এইসব চুড়ো ব্যতীত আজ তার আর কোনো চিহ্নই নেই।

হার্বার্ট বললে, আগে যেমন অ্যাটল্যান্টিস ছিল, ঠিক তেমনি?

হ্যাঁ, অবিশ্যি যদি অ্যাটল্যান্টিস কোনোকালে থেকে থাকে।

এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড সেই ষষ্ঠ মহাদেশের একাংশ তাহলে? প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফট।

সম্ভবত। হার্ডিং বললেন : দ্বীপের জমিতে এত বৈচিত্র্যর কারণ বোধহয় তা-ই।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র হার্বার্ট। সে বললে : এই দ্বীপে যে বিভিন্ন ধরনের বহু জীবজন্তু দেখা যায়, তা-ও বোধ হয় এই কারণেই।

হ্যাঁ। হার্ডিং উত্তর করলেন : আমার মত তাতে আরো টেকসই হল, পেনক্র্যাফট। আমরা এ ক-মাসে দেখেছি এই দ্বীপে অসংখ্য জীবজন্তুর বাস এবং আশ্চর্য, এত বিভিন্ন জাতের জীবজন্তু, এত বৈচিত্র্য তাদের মধ্যে যে তাই যদি বলা যায় লিঙ্কন আইল্যাণ্ড আগে এমন-কোনো মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত ছিল বা ক্রমে-ক্রমে প্রশান্ত মহাসাগরের অতল গর্ভে স্থান নিয়েছে, তবে সে-কথা একেবারে উড়িয়ে দেয়া চলে না।

পেনক্র্যাফট বললে : তাহলে, দেখছি একদিন সেই প্রাচীন মহাদেশের অবশিষ্ট অংশও জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যাবে—আর এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল জল ছাড়া আর-কিছু থাকবে না!

সম্ভবত! হার্ডিং বললেন : তাই বলে আমরা কাজে দিলে দেবে না বা হাল ছেড়ে দেবো না। সেই ভয়ংকর দিনটি আসতে এখনো ঢের বাকি আছে।

গোটা দিনটা ঘুরে-ঘুরে কাটল। খুব ভালো করে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলেন হার্ডিং। সেদিন শিকারও পাওয়া গেল অনেক। সন্ধে পাঁচটার সময় তারা সবাই ফিরে চললেন এবং সন্ধে আটটার সময় গ্র্যানাইট হাউসে এসে প্রবেশ করলেন।

পনেরোই আগস্ট পর্যন্ত ভয়ংকর ঠাণ্ডায় যেন জমে রইল লিঙ্কন দ্বীপ। ইতিমধ্যে তারা প্রসপেক্ট হাইটের আশপাশে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটা ফঁদ পাতলেন। অতি সাধারণ সেই সব ফাঁদ। বড়ো-বড়ো গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডাল-পালা পাতা বিছিয়ে রাখা হল। তারা কিন্তু দ্বীপের সব জায়গাতেই এইভাবে গর্ত খুঁড়লেন না। যে-সব জায়গায় জীবজন্তুর প্রচুর পায়ের ছাপ দেখা গেল শুধুমাত্র সেইসব জায়গাতেই এইরকম গর্ত খুঁড়ে-খুঁড়ে ফাঁদ। পাতা হল। প্রথম দিকে অবিশ্যি ফাদে কোনো জানোয়ার পড়ল না। কিন্তু আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে মাঝে-মাঝে একাধিক জানোয়ার ফাঁদে পড়ল, তাদের মধ্যে একটি জাত উল্লেখযোগ্য। ঠিক বরাহ এদের বলা চলে না, বরং পিকারি বলেই এদের অভিহিত করা উচিত। এগুলো সেই বিরল জাতের পিকারি, যাদের দেখা সব জায়গায় পাওয়া যায় না। পেনক্র্যাফট তো তার শিকার পেয়ে মহা খুশি হয়ে উঠল।

পনেরোই আগস্ট থেকে দ্বীপের আবহাওয়া একটু-একটু করে ভালো হয়ে উঠতে লাগল। তাপ কয়েক ডিগ্রি বাড়ল। এর মধ্যেই কয়েকদিন প্রচুর বরফ পড়েছিল, এত প্রচুর পড়েছিল যে প্রায় দু-ফুট পুরু হয়েছিল সেই বরফের চাদর। এই তুষার-ঝড়ের জন্যে বিশে আগস্ট থেকে পঁচিশে আগস্ট গ্র্যানাইট হাউসের বাইরে তাঁরা বেরুতে পারলেন না। তাই বলে শুধু-শুধু বসে রইলেন না। অনেক কাঠ ছিল গ্র্যানাইট হাউসে, তাই দিয়ে তাঁরা এ ক-দিনে টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি তৈরি করলেন। এই দ্বীপে এসে তারা যে কী-না করেছেন সে-কথা বলা দুষ্কর। প্রথমে তারা হলেন কুমোর, তারপর কাঠুরে, তারপর

রাসায়নিক, এরপরে রাজমিস্ত্রি, এবারে ছুতোর আর ঝুড়িওয়ালা। সীলের চামড়া দিয়ে জুতোও বানিয়েছিলেন তারা।

আগস্টের শেষ দিকে আবহাওয়া আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল। তুষারঝড় অন্তর্হিত হল। এবার তারা বাইরে বেরুতে সক্ষম হলেন। যদিও দু-ফুট পুরু বরফের চাদরে পথঘাট ঢেকে ছিল, তবু সেই কঠিন বরফের উপর দিয়ে চলতে তাদের খুব বেশি অসুবিধে হল না।

সারা দ্বীপ যেন শাদা হয়ে গেছে। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের চুড়ো থেকে শুরু করে সমুদ্রসৈকত, অরণ্য, সমভূমি, হ্রদ, নদী সবকিছু শাদায়-শাদাময় হয়ে গেছে। হার্বার্ট, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট গিয়ে তাদের ফাঁদগুলো পরীক্ষা করে এল। ফাঁদের আশপাশে জানোয়ারদের পায়ের অনেক ছাপ দেখা গেল, কিন্তু ফাদে একটিও জানোয়ার দেখা গেল না। বরং ফাঁদওলোয় এমন-কতগুলো থাবার দাগ দেখা গেল, বা গভীরভাবে মাটিতে বসে গেছে।

হার্বার্ট তীক্ষ্ণ চোখে থাবার দাগগুলো পরীক্ষা করে দেখলে, তারপর বললে : জাওয়ারের থাবার দাগ।

জাগুয়ার! পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে উঠল এই দ্বীপে তাহলে অমন হিংস্র জন্তুও আছে। সেইজন্যে ফাদে কোনো শিকার দেখা যাচ্ছে না! ওই ব্যাটা জাগুয়ারই সবগুলোকে সাবাড় করেছে!

স্পিলেট বললেন : এবার থোক আমাদের সকলের খুব সর্তক হয়ে চলা-ফেরা করা উচিত।

হ্যাঁ। পেনক্র্যাফট বললে : আজকেই গিয়ে ক্যাপ্টেনকে আবার বন্দুকের কথা বলতে হবে।

হ্যাঁ, দ্বীপে যখন বন্য জানোয়ার আছে তখন তাদের সবংশে বিনাশ করতেই হবে সবআগে। স্পিলেট বললেন।

সেদিন ফিরেই সব বলা হল হার্ডিংকে। হার্ডিং কিন্তু তখন বন্দুকের কথা ভাবছিলেন না—কাপড়-চোপড়ের সমস্যাটাই তার কাছে সবচেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাংসাশী জাতীয় জীবের চামড়া কিংবা ভেড়া-জাতীয় প্রাণীর, যথা মুসমনের লোম দিয়ে কিছু জামাকাপড় বানাতেই হবে। তিনি আরো ভাবছিলেন, মুসমন ইত্যাদি জন্তুকে এবং বন্য মুরগি, বালি হাঁস ইত্যাদিকে পোষবার জন্যে একটা আস্তানা বানালে পর প্রত্যেকদিন শিকারে যাওয়ার হ্যাঙামা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে, অনেক কাজ হালকা হবে। তার মানে: শিকারেই যদি এত সময় নষ্ট হয়, তবে আর অন্যান্য কাজ করবার সময় পাওয়া যাবে কোথায়? কিন্তু তারও আগে এই দ্বীপের প্রত্যেকটি অংশ তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করতে হবে। এখনো অধিকাংশ অঞ্চলই দেখে আসা হয়নি।

আবহাওয়া তখন বিশেষ অনুকূল ছিল না বলেই দ্বীপ-ভ্রমণের সংকল্প অল্পদিনের জন্যে স্থগিত রাখতে হল। একটু-একটু করে তাপ বাড়ছে তখন। বরফ গলতে শুরু করেছে। এ-ছাড়া দিনকয়েক প্রবল বর্ষণও চলল। এ ক-দিন গ্র্যানাইট হাউসে বসে-বসে সবাই ঘরোয়া কাজগুলো সমাধা করলেন। কিন্তু এরমধ্যেই এমন-একটা ঘটনা ঘটল, যাতে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন, একটা আতঙ্ক এসে অধিকার করল তাদের মন;

আর গোটা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করবার আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে একটা দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হল।

যে-দিনটির কথা বলছি, সেটি অক্টোবর মাসের চব্বিশ তারিখ। সেদিন পেনক্র্যাফট একাই তার ফাঁদগুলো পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল। দেখা গেল যে তিন-তিনটে প্রাণী ধরা পড়েছিল। তাই দেখে পেনক্র্যাফট তো আহ্লাদে আটখানা হয়ে উঠল। সেই তিনটে প্রাণী হল একটি স্ত্রী-পিকারি, আর দুটো খুব বাচ্চা।

পেনক্র্যাফট হৈ-হৈ করতে-করতে তার শিকার নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরল, ও বারকয়েক হুরে-হুরে বলে চ্যাঁচালে। তার শিকার দেখে অন্যরাও, বলা বাহুল্য, খুশি হয়ে উঠতে একটুও দেরি করলেন না।

পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে বললে : আজ আমাদের রীতিমতো একটা ভোজ হবে, ক্যাপ্টেন। আর মিস্টার স্পিলেট, আশা করি আপনিও আমাদের সঙ্গে আহারে বসে যৎসামান্য মুখে দেবেন।

আপনার নেমন্তন্ন পেয়ে আমি খুব সুখী হলম, পেনক্র্যাফট সাহেব! স্পিলেট বললেন : কিন্তু আজকের মেনুর প্রধান আকর্ষণটা কী বলুন তো?

বাচ্চা পিকারির মাংস!

বাচ্চা পিকারির মাংস! আমি তো তোমার চাচামেচি শুনে মনে করছিলুম না-জানি কী শিকার করে এনেছো?

আরো চাই! পেনক্র্যাফট বললে : আপনি দেখছি বাচ্চা পিকারির মাংস খেতে হবে শুনে নাক সিটকোচ্ছেন!

না, সে-কথা নয়। আমার বক্তব্য হল কারুই বেশি খাওয়া উচিত নয়। স্পিলেট বললেন : দ্বীপে তো আর ডাক্তার নেই! বেশি খেয়ে অসুখ বাধিয়ে বসাটা খুব-একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সে-কথা ঠিক। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, সাত মাস আগে আমরা যখন এদ্বীপে এসে পৌঁছুই, তখন এ-রকম শিকার দেখলে পর আপনি স্বয়ং হৈ-চৈ বাধিয়ে বসতেন।

সাংবাদিক-সুলভ গাম্ভীর্য এনে আপ্তবাক্য আওড়ালেন স্পিলেট : মানুষ কখনো কোনো অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হয় না, পেনক্র্যাফট।

আপনার বক্তৃতা বাদ দিন। পেনক্র্যাফট বললে : আমি জানি নেবের রান্নার কল্যাণে আজকের ভোজটা জমবে ভালো। এই ছোট্ট দুটো পিকারির বয়স তিন মাসের বেশি কোনোমতেই হবে না। সুতরাং খেতে চমৎকার লাগবে। এসো নেব, এসো আজ আমি নিজেই রান্নার তদারক করবো।

নেব আর পেনক্র্যাফট তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

রাত্তির বেলা গ্র্যানাইট হাউসের ডাইনিং রুমে রীতিমত ভোজসভা বসে গেল। মাংসটা চমৎকার রান্না করেছে নেব। পেনক্র্যাফট অবিশ্যি বললে যে সে না-থাকলে কখনো নেব এত ভালো রান্না করতে পারতো না।

প্রত্যেকের প্লেটেই বিপুল পরিমাণ মাংস দেয়া হল। সত্যি, বাচ্চা পিকারিগুলো চমৎকার লাগল খেতে 1 পেনক্র্যাফট বড়ো একটুকরো মাংস তুলে মুখে পুরল আর পরক্ষণেই প্রচণ্ড চেঁচিয়ে উঠল। আর্ত স্বরে একটা শপথ করে উঠল সে।

কী হল আবার? জিগেস করলেন সাইরাস হার্ডিং।

কী হল? পেনক্র্যাফট বললে : হবে আবার কী? আমার একটা দাঁত ভেঙে গেছে!

তোমার মাংসে পাথরের কুচি ছিল? গিডিয়ন স্পিলেট প্রশ্ন করলেন।

তা-ই তো মনে হচ্ছে! এই বলে পেনক্র্যাফট মুখের ভিতর থেকে তার দাঁত-ভাঙার কারণটি বার করলে। কিন্তু–

কিন্তু জিনিশটা পাথরের কুচি নয়—একটা বন্দুকের গুলি!!

পরিত্যক্ত

২.১ আরেকটা রহস্যময় ঘটনা

ঠিক সাত মাস আগে বেলুন-যাত্রীর দল মার্কিন মুলুক থেকে গৃহযুদ্ধের একেবারে মাঝখানে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে এসে পড়েছিলেন। সেই সময়টুকুর মধ্যে তারা যতদূর অনুসন্ধান করেছেন, তার মধ্যে কোনো মানুষ চোখে পড়েনি। দ্বীপে যে কোনো মানুষ থাকে, তার কোনো প্রমাণ এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া, দ্বীপে যে কোনোকালে কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি, দ্বীপের চারদিক ঘুরে সেই ধারণাই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের সেই বদ্ধমূল ধারণা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পেনক্র্যাফটের দাঁত যা ভেঙেছে তা একটি বুলেট, আর বুলেটটি নিঃসন্দেহে কোনো বন্দুক থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর, মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী নিশ্চয়ই বন্দুক ব্যবহার করে না।

পেনক্র্যাফট যখন বুলেটটি টেবিলের উপর রাখলে, সবাই বিস্ময়-বিমূঢ় চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই ঘটনা থেকে যে-সব ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা আছে, নিমেষের মধ্যে তাও একের পর এক তাদের মনে জেগে উঠল। অতিপ্রাকৃত কোনো-কিছু ঘটলেও বোধহয় তারা এত বিমূঢ় হয়ে পড়তেন না। সাইরাস হার্ডিং বুলেটটা হাতে তুলে নিলেন, বারকয়েক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন সীসের বলটি, হাতের তালুতে বারকয়েক গড়িয়ে নিলেন, তারপর পেনক্র্যাফটের দিকে তাকিয়ে বললেন : তুমি ঠিক জানো, যে-পিকারিটি এই বুলেটে আহত হয়েছে সেটির বয়েস তিন মাসের বেশি হবে না?

অসম্ভব। পেনক্র্যাফট উত্তর করলে : পিকারিটির বয়স কোনোমতেই তিন মাসের বেশি হতে পারে না। ফাঁদে যখন এটিকে আমি দেখতে পাই, তখনও এ মায়ের দুধ খাচ্ছিল।

হুঁ! আরো গম্ভীর হল হার্ডিং-এর মুখ। তাই থেকে প্রমাণ হয় যে তিন মাসের মধ্যে অন্তত একবার এই দ্বীপে গুলি ছোঁড়া হয়েছে!

এবং সেই গুলিতে একটি প্রাণী আহত হয়েছে। স্পিলেট যোগ করলেন।

তার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। বললেন সাইরাস হার্ডিং : এই ঘটনা থেকে এইসব ধারণা করা যায় যে, আমাদের আসবার আগেও দ্বীপে কোনো মানুষ ছিল, কিংবা তিন মাসের মধ্যে কোনো ব্যক্তি এই দ্বীপে এসে পৌঁছেছে। এই লোকগুলো কিংবা লোকটি কি প্রায়ই এখানে আসে, না হঠাৎ কোনো জাহাজডুবির ফলে এসে পৌঁছেছে, সে-প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু সেই লোকেরা ইওরোপীয় কিংবা মালয় বোম্বেটে, শত্রু কিংবা মিত্র—যা-ই হোক না কেন, আগে থেকে কিছু আন্দাজ করবার কোনো উপায় নেই। এখনও তারা এই দ্বীপে আছে, না দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে, তাও আমরা জানি না। কিন্তু এই প্রশ্নগুলো এত গুরুত্বপূর্ণ যে, যে করেই হোক শিগগিরই এর উত্তর আমাদের পেতেই হবে।

অসম্ভব। পেনক্র্যাফট তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল : আমরা ছাড়া লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আর-কোনো লোক থাকে না, থাকতে পারে না। দ্বীপটা তো আর খুব বড়ো নয়! যদি অন্য লোকেরা এই দ্বীপে থাকত, তবে এতদিনে নিশ্চয়ই অন্তত তাদের একজনেরও দেখা আমরা পেতুম।

না-থাকলেই ভালো। কিন্তু বিপরীতটা অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও বাস্তব হতে পারে। হার্বার্ট বললে।

যদি মনে করতে হয় যে পিকারিটি তার দেহে একটি বুলেট নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল, তবে তা-ই হবে সবচেয়ে বিস্ময়কর। স্পিলেট বললেন।

হার্ডিং বললেন : এ-কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্যি যে, তিন মাসের মধ্যে অন্তত একটি বন্দুক এই দ্বীপে গর্জে উঠেছে। নিশ্চয়ই অল্পদিনের মধ্যে এই দ্বীপে জনসমাগম হয়েছে, কেননা মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের চুড়ো থেকে যখন আমরা সারা দ্বীপ পর্যবেক্ষণ করেছিলুম, তখন যদি কেউ এই দ্বীপে থাকতো তবে নিশ্চয়ই তা দেখতে পেতুম। এমনও হতে পারে, কয়েক হপ্তার মধ্যে জাহাজডুবি হয়ে কোনো-কেউ এই দ্বীপে এসে উঠেছে। তবে এখনও কিছু ঠিক করে বলা চলে না।

আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

আমিও তাই বলি, বললেন হার্ডিং, কেননা, মালয় দারাও এ-দ্বীপে আসতে পারে।

পেনক্র্যাফট বললে : সারা দ্বীপ আমাদের খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে একটা ক্যানু তৈরি করলে ভালো হয় না কি, ক্যাপ্টেন? এর সাহায্যে আমরা নদীপথেও অনুসন্ধান চালাতে পারবো-দ্বীপের উপকূলভাগও ঘুরে দেখতে সুবিধে হবে।

তোমার পরিকল্পনা খুব ভালো, কিন্তু আমরা সেজন্যে অপেক্ষা করতে পারি না। একটা চলনসই নৌকো বানাতে কম করেও একমাস সময় লাগবে।

হ্যাঁ, যদি একটা সত্যিকার ভালো নৌকো তৈরি করি। কিন্তু আমরা তো আর সমুদ্রযাত্রা করছি না। মার্সি নদীতে চলাচলের উপযোগী একটা ক্যান তৈরি করতে পাঁচদিনের বেশি সময় লাগবে না।

পাঁচ দিন লাগবে একটা নৌকো বানাতে? নেব চেঁচিয়ে উঠল।

হ্যাঁ, নেব। রেড-ইণ্ডিয়ানদের ধরনের একটা নৌকো বানাতে এর বেশি সময় লাগবে না।

কাঠের নৌকো? তখনো নেবের কৌতূহল অপগত হয়নি।

হ্যাঁ, কাঠের নৌকো। আমি আবারও বলছি ক্যাপ্টেন, পাঁচ দিনের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে।

যদি পাঁচদিনের মধ্যে তৈরি করা যায়, তাহলে ভালো। হার্ডিং বললেন : কিন্তু একদিন আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। গ্র্যানাইট হাউসের আশপাশের অরণ্যের মধ্যেই একদিন তোমাদের শিকার সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

পেনক্র্যাফটের আশা আর পূর্ণ হল না। তার ভোজ-পর্ব অবশ্য তারপরে নিরাপদভাবেই শেষ হল। তাহলে এই দ্বীপে এঁরা ছাড়াও অন্য লোক আছে। বুলেট যখন পাওয়া গেছে,

তখন আর এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। এবং এই আবিষ্কারে এঁদের আশঙ্কা ও অস্বাচ্ছন্দ্য বিপুল পরিমাণে বেড়ে গেল।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট ঘুমোতে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা সম্পর্কে খানিকক্ষণ আলোচনা করলেন। এই ঘটনার সঙ্গে কি দ্বীপে-ঘটে-যাওয়া রহস্যময় ঘটনাগুলোর কোনো সম্পর্ক আছে? খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ব্যাপারটা সম্পর্কে আলোচনা করে হার্ডিং বললেন : ভালো কথা, এই ঘটনা সম্পর্কে আপনি কি আমার অভিমত জানতে চান? আমার অভিমত হল, যত আঁতিপাঁতি করেই দ্বীপটা আমরা খুঁজে দেখি না কেন, আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাবো না।

পরদিনই পেনক্র্যাফট তার কাজে লেগে গেল। মার্সি নদীতে চলাচলের উপযোগী ছোটোখাটো একটা সাধারণ ক্যানু বানাবে বলেই ঠিক করেছিল সে। ঝড়ে অরণ্যের অনেকগুলো বড়ো-বড়ো গাছ উপড়ে পড়েছিল, সুতরাং কাঠের জন্যে ওঁদের আর ভাবতে হল না।

সেইদিনই হার্বার্ট একটি খুব উঁচু গাছের আগায় উঠে সারা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন করে দেখেছিল। কিন্তু বলা বাহুল্য, সন্দেহজনক কিছুই তার চোখে পড়েনি। অনেকক্ষণ ধরে সে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিল। কিন্তু না, কোথাও কিছুই নেই।

সাইরাস হার্ডিং চুপচাপ হার্বার্টের অনুসন্ধানের ফলাফল শুনলেন, তারপর বারকয়েক মাথা ঝাঁকালেন; কিন্তু কিছুই বললেন না। বোঝা গেল, গোটা দ্বীপটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে না-দেখলে এই সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত করা চলবে না।

এর দু-দিন পরেই, আটাশে অক্টোবর এমন-একটি ঘটনা ঘটল যে তার জন্যে একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুবই জরুরি হয়ে পড়ল। গ্র্যানাইট হাউস থেকে দু-মাইল দূরে সমুদ্রসৈকতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে অকস্মাৎ হার্বার্ট আর নে একটি বিরাটাকার কচ্ছপ দেখতে পেলো। দেখেই হার্বার্ট চেঁচিয়ে উঠল : নেব শিগগির এসে আমায় সাহায্য করো।

নেব দৌড়ে হার্বার্টের কাছে এসে দাঁড়াল।কী বিরাট জানোয়ারটা। কিন্তু কী করে এটাকে ধরা যায়?

এর চেয়ে সোজা আর-কিছু নেই, নেব। উত্তর করলে হার্বার্ট : যদি আমরা কোনোমতে এটাকে উলটে ফেলতে পারি, তবে এটা আর পালাতে পারবে না। তাড়াতাড়ি তোমার কুড়ুলটা নিয়ে এসো তো!

বিপদ বুঝতে পেরেই কচ্ছপটা তার পাগুলো আর মুখটা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। হার্বার্ট আর নেব তাদের কুড়ল কচ্ছপটার দেহের নিচে ঢুকিয়ে চাপ দিয়ে ওটাকে উলটে ফেললে। কচ্ছপটা প্রায় তিন ফুট লম্বা, আর তার ওজন হবে প্রায় চারশো পাউণ্ড।

চমৎকার! নে চেঁচিয়ে উঠল : পেনক্র্যাফট এটার কথা জানতে পারলেই আহ্বাদে আটখানা হয়ে উঠবে। কিন্তু এখন এটাকে নিয়ে কী করা যায়? যে-রকম ওজন, তাতে এটাকে গ্র্যানাইট হাউসে তো নিয়ে যেতে পারবো না!

এখানেই পড়ে থাক। উত্তর করলে হার্বার্ট : একবার যখন এটাকে উলটে ফেলতে পেরেছি, তখন এটা আর-কখনও পালাতে পারবে না। কাঠের গাড়িটা এনে এটাকে

গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে। কাজের সুবিধের জন্যে হার্ডিং-এর নির্দেশে তারা একটা কাঠের গাড়ি আগেই প্রস্তুত করে নিয়েছিল।

ফিরে-যাওয়ার আগে হার্বার্ট আর নেব কচ্ছপটার চারপাশে বড়ো-বড়ো কয়েকটা পাথর দিয়ে একটা দেয়ালের মতো তৈরি করলে। তারপর সমুদ্রে-সৈকত ধরে-ধরে ওরা দুজনে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এল। পেনক্র্যাফটকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়ার জন্যে হার্বার্ট কচ্ছপটার খবর আর কারু কাছে ভেঙে বললে না। দু-ঘণ্টা পরে ওরা দুজনে কাঠের গাড়ি নিয়ে সমুদ্র সৈকতে ফিরে এলো। কিন্তু, কী আশ্চর্য! কচ্ছপটাকে আর সেখানে দেখা গেল না। অবাক হয়ে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালে। পাথরগুলো তখনও সে-জায়গায় পড়ে আছে, কিন্তু কচ্ছপটারই শুধু দেখা নেই।

নেব বললে : তাহলে এই জন্তুগুলো আপনা-আপনিই উলটে যেতে পারে?

তা-ই তো দেখা যাচ্ছে! হতবুদ্ধি হয়ে বললে হার্বার্ট : এটা এমনিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে শুনে নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন হার্ডিংও হতভম্ব হয়ে যাবেন।

নেব ঠিক করে ফেললে তাদের এই দুর্ভাগ্যের কথা কাউকে বলবে না। সে বললে : এই ব্যাপারটা কাউকে বলা চলবে না।

না নেব, বরং ঠিক তার উলটো। এই ব্যাপারটা বলতেই হবে আমাদের। বললে হার্বার্ট।

তারপর দুজনে খালি গাড়িটাই ঠেলতে ঠেলতে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলো। হার্ডিং, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট তখন নৌকোর কাজে ব্যস্ত। কী-কী ঘটেছে, সংক্ষেপে হার্বার্ট সবাইকে খুলে বললে। পেনক্র্যাফট তো শুনেই চেঁচিয়ে উঠল : মহামূখ!

কিন্তু নেব বললে : আমাদের কোনো দোষ নেই! আমরা ওটাকে উলটে রেখে এসেছিলাম।

তাহলে তোমরা ভালো করে উলটে রাখোনি। বললে পেনক্র্যাফট।

তখন হাবার্ট খুলে বললে কচ্ছপটা যাতে পালাতে না-পারে তার জন্যে কী সতর্ক ব্যবস্থা তারা অবলম্বন করেছিল।

শুনে পেনক্র্যাফ্ট বললে : ব্যাপারটা তাহলে সম্পূর্ণ অলৌকিক!

ক্যাপ্টেন, আমি ভেবেছিলুম, হার্বার্ট বললে, একবার কচ্ছপদের উলটে দিতে পারলে তারা আর-কখনো পালাতে পারে না।

সে-কথা সত্যি। হার্ডিং বললেন : আচ্ছা, বলো তো সমুদ্র থেকে কত দূরে তোমরা ওটাকে উলটে রেখে এসেছিলে?

খুব বেশি হলে পনেরো ফুট দূরে হবে। তখন ভাটার সময়, না?

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন।

হার্ডিং বললেন : বালির মধ্যে কচ্ছপরা যা করতে পারে না জলের মধ্যে তা পারে। জোয়ার এলে পর জলের মধ্যে এটা হয়তো নিজেই উলটে গিয়েছিল, তারপর আস্তে-আস্তে

গভীর সমুদ্রে চলে গেছে।

কী গর্দভ আমরা! নেব বললে : এই সোজা ব্যাপারটাও আমরা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি।

পেনক্র্যাফট বললে, ঠিক এই কথাটাই আমি তোমাদের বলতে যাচ্ছিলাম।

সাইরাস হার্ডিং যে-ব্যাখ্যাটা দিলেন, নিঃসন্দেহে তা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তিনি নিজেই কি সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন? এমন কথা কোনোমতেই বলা চলে না।

***

নয়ই অক্টোবর ক্যানুটা তৈরি হয়ে গেল। পেনক্র্যাফট তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে, পাঁচ দিনের মধ্যেই ক্যানু সম্পূর্ণ করেছে। লম্বায় বারো ফুট হবে ক্যানুটা, আর ওজনে কোনোমতেই দুশো পাউণ্ডের বেশি নয়। ক্যানুটাকে জলে ভাসাতে কোনো অসুবিধেই হল না। ক্যানুটাকে বয়ে নিয়ে-যাওয়া হল তীরের বেলাভূমিতে-ভরা জোয়ারের সময় আপনা থেকেই জলে ভাসল ক্যানটা? পেনক্র্যাফট উৎফুল্ল কণ্ঠে জানালে যে ভালোভাবেই কাজ সাঙ্গ হয়েছে। প্রথমে একে পরীক্ষা করে দেখা হবে ঠিক হল।

সবাই গিয়ে বসলেন ক্যানুতে। পেনক্র্যাফ্ট ক্যানু ছেড়ে দিলে। আবহাওয়া তখন চমৎকার। জলও শান্ত। নিরাপদেই ক্যানুটা মার্সি নদীর ধীর স্রোতে এগিয়ে চলল। হার্বার্ট আর নেব বৈঠা চালাতে লাগল, আর পেনক্র্যাট হাল ধরে বসে রইল। দক্ষিণ থেকে একটু হালকা হাওয়া বইছিল। দুই বৈঠার জোরে অনায়াসেই এগিয়ে চলতে লাগল ক্যানু। গিডিয়ন স্পিলেট একহাতে পেনসিল অন্য হাতে নোটবুক নিয়ে আলতোভাবে তীরের একটা স্কেচ করে চলছিলেন।

নেব, হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট দ্বীপের এই নতুন অংশে ভ্রমণ করতে-করতে কথা বলছিল। সাইরাস হার্ডিং নিঃশব্দে তীরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তার দৃষ্টি দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো আশ্চর্য দেশে এসে পড়েছেন।

প্রায় পৌনে-এক ঘণ্টা চলবার পর ক্যানু ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপের একেবারে সম্মুখবিন্দু পর্যন্ত এসে পৌঁছল। পেনক্র্যাফট তখন ফেরবার উদ্যোগ করতে লাগল। এমন সময় হার্বার্ট উঠে দাঁড়িয়ে একটা কালো জিনিশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললে তীরের ওই জিনিশটা কী, বলুন তো?

তক্ষুনি নির্দিষ্ট দিকে তাকালেন সকলে। সাংবাদিক বললেন : কিছু-একটা আছে ওখানে। মনে হচ্ছে কোনো জাহাজের ভাঙা টুকরো।

আমি দেখতে পেয়েছি জিনিশটা! চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : সিন্দুক, সিন্দুক! মনে হয় জিনিশপত্রে ভরা।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, তীরে নৌকো ভেড়াও।

বারকয়েক বৈঠা চালানোর পর নৌকো এসে ঠেকল। সবাই তীরে নামলেন। না, পেনক্র্যাফট কোনো ভুল করেনি। দুটো সিন্দুক সেই তীরের বালুরাশির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত হয়ে পড়ে আছে।

হার্বার্ট বললে : তাহলে এই দ্বীপের কোনো অংশে জাহাজডুবি হয়েছে!

তা-ই তত মনে হচ্ছে, উত্তর করলেন স্পিলেট।

সদা-অস্থির পেনক্র্যাফটের কৌতূহল আর-কোনো বাধা মানল না। কিন্তু কী আছে এই সিন্দুকে? কী আছে? বন্ধ দেখছি সিন্দুকটা-খুলবো কী করে? একটা বড়ো-শড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে অবিশ্যি—এই বলে সে বড়ো একটা পাথর তুলে নিলে হাতে।

তক্ষুনি হার্ডিং তাকে বাধা দিলেন : পেনক্র্যাফট, বললেন তিনি : একঘণ্টার জন্যেও কি তুমি একটু সুস্থির হতে পারবে না?

কিন্তু ক্যাপ্টেন, ভাবুন তো—হয়তো এখানে আমাদের অভাব মেটানোর উপযোগী সবকিছুই আছে!

সে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পাবো, পেনক্র্যাফট, উত্তর করলেন হার্ডিং : কিন্তু এখন সিন্দুকটা ভাঙবার কোনো দরকার নেই। আর-কিছু কাজে লাগুক না-লাগুক, ভেঙে এটাকে নষ্ট করবে কেন? আগে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাই, সেখানে সহজেই সিন্দুক না-ভেঙে খোলবার ব্যবস্থা করা যাবে।

ঠিক, বললে পেনক্র্যাফট, আপনার কথাই ঠিক, ক্যাপ্টেন।

তখন সিন্দুক দুটিকে জলে ভাসিয়ে দেয়া হল, তারপর বেঁধে দেয়া হলো ক্যান সঙ্গে। এইভাবে সহজেই ভাসিয়ে-ভাসিয়ে সিন্দুকটিকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে অনেক পরিশ্রমও বাঁচবে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হল, এই সিন্দুক দুটি এলো কোত্থেকে? চারদিক আঁতিপাঁতি করে খুঁজে দেখলেন সকলে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই চোখে পড়ল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে, কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই কোনো জাহাজডুবি হয়েছে। বুলেটের সঙ্গে কি এই জাহাজডুবির কোনো সম্পর্ক আছে? দ্বীপের অন্য-কোনো অংশে কি নতুন-কোনো আগন্তুক দলের আবির্ভাব ঘটেছে? এখনও আছে কি তারা এখানে? তবে এ-কথা ঠিক যে, এই আগন্তুকরা মালয় বোম্বেটে নয়, কেননা সিন্দুকের গড়ন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, এর নির্মাতা কোনো মার্কিন কিংবা ইওরোপীয়।

গ্র্যানাইট হাউসে এনে সিন্দুক দুটিকে অতি সন্তর্পণে খোলা হল। সিন্দুক দুটি তখনও খুব ভালো অবস্থায় ছিল, তাতে বোঝা গেল যে খুব বেশিক্ষণ জলে ভাসেনি। সিন্দুক খুলতে গিয়ে বোঝা গেল যে, যাতে স্যাৎসেতে না-হয়ে যায় সেইজন্যে খুব ভালো করে প্যাক করা হয়েছিল।

সিন্দুকের ডালা খুলতেই সবাই একসঙ্গে ঝুঁকে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন। এমন-কোনো জিনিশ নেই যা এই সিন্দুকে নেই। যেন দ্বীপবাসীদের সুবিধের দিকে নজর রেখেই কেউ জিনিশপত্রগুলো সিন্দুকে থরেথরে সাজিয়ে রেখেছে। যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার তৈরির সূক্ষ্ম কলকজা, কাপড়-চোপড় বই-পত্র-কী-যে ওই সিন্দুক

দুটোয় নেই তা ভেবে বলা অসম্ভব। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্পিলেট তার নোটবইয়ে জিনিশপত্রগুলোর একটা তালিকা তৈরি করে ফেললেন। সেই ফিরিস্তিতে কী-কী ছিল পাঠকদের সুবিধের জন্যে তা হুবহু নিচে তুলে দেয়া হল :

যন্ত্রপাতি : একাধিক-ফলাওলা তিনটি ছুরি, দুটি কুঠার, দুটি করাত, তিনটি হাতুড়ি, স্কেল, দুটি অ্যাজ (adzcs), একটি শাবল, ছ-টি চিজেল, দুটি ফাইল, তিনটি ব্র্যাদা, দুটি খুন্তি, দশটি ব্যাগ-ভর্তি পেরেক আর স্ক্রু, বিভিন্ন আকারের তিনটি দা, দু-বাক্স সূঁচ।

হাতিয়ার : দুটি ফ্লিট-লক বন্দুক, দুটি কার্তুজ বন্দুক, দুটি হালকা ওজনের রাইফেল, পাঁচটি বড়ো কুঠার, চারটি কৃপাণ, পচিশ পাউণ্ড ওজনের দুটি বাক্স-ভর্তি বারুদ, বারোটি কার্তুজের বাক্স।

সূক্ষ্ম কলকজা একটি সেক্সটান্ট, একটি অপেরা-গ্লাস, একটি টেলিস্কোপ, একবাক্স জ্যামিতিক যন্ত্রপাতি, একটি নাবিকদের কম্পাস, একটি ফারেনহাইট থার্মোমিটার, একটি ব্যারোমিটার, একটি বাক্সের মধ্যে ফোটো তোলবার সব সরঞ্জাম।

কাপড়-চোপড় : দু-ডজন শার্ট-দেখে মনে হয় পশমের তৈরি—আসতে কোনো অজ্ঞাত উদ্ভিদ থেকে প্রস্তুত, ঐ জিনিশেরই তিন ডজন মোজা, আর কয়েক জোড়া দস্তানা।

রান্নাবান্নার জিনিশ : একটি লোহার কড়াই, দুটি সস্প্যান, তিনটি ডিশ, দশটি ধাতুনির্মিত থালা, দুটি কেটলি, একটি স্টোভ, দু-প্রস্থ ছুরি-কাটা।

বইপত্র : একটি বাইবেল, একটি পৃথিবীর মানচিত্র, বিভিন্ন পলিনেশীয় ইডিয়মের একটি অভিধান, একটি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অভিধান (ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ), তিন রীম শাদা কাগজ, দুটি মোটা বাঁধানো খাতা—তবে প্রত্যেকটির পাতাই শাদা।

এ-কথা মানতেই হবে, বললেন স্পিলেট : এই সিন্দুকের মালিক যিনি ছিলেন, তিনি একজন ব্যবহারিক মানুষ 1 যন্ত্রপাতি, কলকজা, অস্ত্রশস্ত্র, জামা-কাপড়, রান্নাবান্নার জিনিশ, পুঁথিপত্র—সবকিছুই তিনি সিন্দুকে ভরেছিলেন। তিনি বোধহয় আগে থেকেই আঁচ করেছিলে, আঁচ করেছিলেন যে জাহাজডুবি অনিবার্য, আর সেজন্যেই আগে থাকতে প্রস্তুত হয়ে ছিলেন।

গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন হার্ডিং : আর-কিছুই চাইবার নেই!!

আর-একটা জিনিশও মানতেই হবে, বললে হার্বার্ট : সিন্দুকের মালিক কোনোক্রমেই কোনো মালয় বোম্বেটে নয়। এমনও হতে পারে, কোনো মার্কিন বা ইওরোপীয় জাহাজ এ-অঞ্চলে ঝঞ্চা-তাড়িত হয়ে এসেছিল, তখন দরকারি জিনিশপত্র রক্ষা করবার জন্যে যাত্রীরা এইগুলি সিন্দুকে ভরেছিল। আপনি কী বলেন, ক্যাপ্টেন?

খুব সম্ভব তোমার কথাই ঠিক। বললেন সাইরাস হার্ডিং : জাহাজডুবির সম্ভাবনা দেখা দেয়াতেই হয়তো ওই জিনিশপত্রগুলো সিন্দুকে ভরা হয়েছিল।

ফোটো তোলবার সরঞ্জামগুলো পর্যন্ত? পেনক্র্যাফট বিস্মিত কণ্ঠে বললে।

সত্যি-বলতে কি, ফোটো তোলবার সরঞ্জামগুলো বাক্সে ঢোকানোর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না। তার চেয়ে আরো গুলিবারুদ কিংবা কাপড়-চোপড় বেশি দরকারি।

আচ্ছা, সাংবাদিকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল : এই জিনিশপত্রগুলোর মালিক বা নির্মাতার নাম-ধাম দেখলে হয় না?

তখন প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করা হল, কিন্তু কোথাও নির্মাতার কোনো নাম-ঠিকানা পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা রহস্যময়। বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্রে। নির্মাতার নাম-ধাম পাওয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু সেখানেও কিছু লেখা নেই। আরেকটা আশ্চর্য ব্যাপার হল, প্রত্যেকটি জিনিশই আনকোরা নতুন—একেবারে চকচক করছে। আর এমনভাবে জিনিশগুলো সিন্দুকে সাজানো ছিল যে, বোঝা গেল ধীরে-সুস্থে একটি-একটি করে প্রত্যেকটি জিনিশ সিন্দুকে ভরা হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে বইপত্রগুলোতে কোথাও প্রকাশক বা মুদ্রাকরের নাম দেখা গেল না। এ-রকমটা সচরাচর দেখা যায় না। সবমিলিয়ে গোটা ব্যাপারটাই সাইরাস হার্ডিং-এর কাছে কেমন-কেমন ঠেকল। কিন্তু যেখান থেকেই সিন্দুক দুটো আসুক না কেন, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের কাছে এদের মূল্য অসীম। অবশ্য এ-পর্যন্ত দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদকে প্রভূত বুদ্ধি ও পরিশ্রমের দ্বারা তারা উপযুক্তভাবে কাজে লাগিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় এটাই যে তারা যেন জীবনযাত্রা অনায়াসে নির্বাহ করেন। নইলে অকস্মাৎ এই সিন্দুক দুটো পাওয়া যাবে কেন?

এতসব জিনিশ পেয়েও পেনক্র্যাফট অবিশ্যি পুরোপুরি সন্তুষ্ট হল না। তার মনে হল, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিশটাই সিন্দুকে নেই। তা হল তামাক। সে বললে, অন্তত আধ পাউণ্ড তামাক যদি থাকতো তবে আমি একেবারে দুনিয়ার বাদশা হয়ে যেতে পারতুম?

তার কথা শুনে না-হেসে পারলেন না কেউ।

এই সিন্দুক-দুটো হাতে আসবার দরুন একটা ব্যাপারে সবাই একমত হলেন : তন্নতন্ন করে গোটা দ্বীপে অভিযান চালাতে হবে। ঠিক হল, পরদিন ভোরবেলাতেই যাত্রা শুরু হবে। মার্সি নদীর একেবারে পশ্চিম প্রত্যন্তে পৌঁছুতে হবে। যদি জাহাজডুবির ফলে কোনো ভাগ্যহত এই দ্বীপে উঠে থাকে, তবে সম্ভবত সে রসদবিহীন। সুতরাং অবিলম্বে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য।

ওই নতুন জিনিশপত্রগুলো গোছগাছ করে গ্র্যানাইট হাউসে রাখতে-রাখতেই বাকি দিনটুকু কেটে গেল।

এই দিনটা—এই উনত্রিশে অক্টোবর—ছিল রবিবার। রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে হার্বার্ট হার্ডিংকে অনুরোধ করলে বাইবেল থেকে একটা অংশ পড়ে শোনাতে। হার্ডিং বাইবেলটা হাতে নিয়ে যেই খুলতে যাবেন অমনি পেনক্র্যাফট বললে : দাঁড়ান, ক্যাপ্টেন, একটু থামুন। আমার একটা কুসংস্কার আছে। বইটার যে-কোনো পাতা খুলে, প্রথম যেখানে আপনার চোখ পড়ে সে-জায়গাটা পড়ে শোনান। আমাদের এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় কি না মিলিয়ে দেখা যাক।

পেনক্র্যাফটের কথা শুনে হার্ডিং একটু হাসলেন। তারপর চোখ বুজে বইটা খুললেন। আগে থেকেই যেন কেউ ওই পাতাটা চিহ্নিত করে রেখেছিল, তা চোখ খুলেই বুঝতে পারলেন হার্ডিং। প্রথমেই তার চোখ পড়ল, পেনসিলের দাগ-দেয়া একটি শ্লোকের উপর। সেন্ট ম্যাথুর সুসমাচারের সপ্তম অধ্যায়ে আছে সেই শ্লোকটি। উদাত্ত কণ্ঠে হার্ডিং শ্লোকটি পাঠ করলেন : যে প্রার্থনা করে, পূর্ণ হয় তার সর্ব কামনা; যে পরিশ্রম করে, সে প্রাপ্ত হয় তার সর্ব-আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

.

২.২ আরো আশ্চর্য ঘটনা

পরদিন তিরিশে অক্টোবর সবাই অভিযানের জন্যে তৈরি হলেন। দ্বীপবাসীরা এখানে এসে বর্তমানে এমন অবস্থায় পৌঁছেছেন যে, এখন আর অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের নেই, বরং তারাই অন্যদের সাহায্য করতে পারেন। মার্সি নদী বেয়ে যত-দূর-সম্ভব ততদূর পর্যন্তই তাঁরা যাবেন বলে ঠিক হলো। অস্ত্রশস্ত্র, রসদপত্র সব ক্যানুতে ওঠানো হলো। দুটো কুঠার নেয়া হলো যাতে ঘন অরণ্যের মধ্যে পথ করে চলা যায়। আর নেয়া হল টেলিস্কোপ আর পকেট-কম্পাস। যাত্রার আগে সাইরাস হার্ডিং সবাইকে সতর্ক করে দিলেন এই বলে যে, বন্দুক সঙ্গে নেয়ায় তার আপত্তি নেই, কিন্তু একটি গুলিও যেন বাজে খরচ করা না-হয়।

ছ-টার সময় সবাই ক্যানুতে উঠলেন। টপও সঙ্গে চলল। তারপর মার্সি নদীর মুখ থেকে দ্বীপের নতুন অংশের দিকে এগিয়ে চলল ক্যানু। ঘণ্টা-দেড়েক আগেই জোয়ার শুরু

হয়েছিল। সুতরাং ক্যানু দ্রুতবেগেই গন্তব্যস্থানের দিকে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ বাদে নদী আস্তে-আস্তে একটু-একটু করে প্রসারিত হচ্ছে বলে মনে হল। দু-দিকে চিরহরিৎ উদ্ভিদের ঘন ঝোপ শূন্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। তীরের সেই বন আর উঁচু ঝোপঝাড়ের জন্যে ক্যানু ছায়ার মধ্যে দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুদূর এগিয়ে ক্যানু থামল। তীরে নেমে চারদিকে খুঁজলেন তাঁরা। কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। আবার তখন নৌকোয় উঠে সবাই এগিয়ে চললেন। এইভাবে চারদিক তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে এলেন সকলে। মাইল-চারেক যাওয়ার পর সবাই আবার তীরে নামলেন। ঘন অরণ্যের মধ্যে কুঠার দিয়ে পথ করে নিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি হল। এই নিয়ে চলতে চলতে সপ্তম বার তীরে নামলেন তারা। কিন্তু মানুষের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। পেনক্র্যাফট এবার দুটো জ্যাকামার পাখি মারলে। এই পাখির নাম থেকে অরণ্যের নাম দেয়া হল জ্যাকামার অরণ্য।

অভিযান এগিয়ে চলল। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের পশ্চিম প্রত্যন্ত তখনো মাইল পাঁচেক দূরে। সাইরাস হার্ডিং একেবারে মার্সি নদীর শেষ সীমা পর্যন্ত অভিযান চালাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। হয়তো একেবারে দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে জাহাজডুবির ফলে ভাগ্যহত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

মার্সি নদীর তীরে এক ধরনের উঁচু গাছের সারি দেখতে পাওয়া গেল। এই গাছপালাগুলো প্রধানত অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, মধ্য ইওরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। এইসব গাছকে ইংরেজিতে বলে ফিবার-ট্রি, বাংলায় তর্জমা করলে যার মানে দাঁড়ায়, জ্বর-গাছ। এই গাছগুলো জ্বরকে প্রতিরোধ করে বলেই এগুলোর এই

নাম। মার্সি নদীর তীর ঘেঁসে জুর-গাছের সারি দূর পশ্চিমে এগিয়ে গেছে। তারই মধ্য দিয়ে আরো মাইল-দুয়েক এগিয়ে গেল ক্যানু।

ইতিমধ্যে বেলা গড়িয়ে আসছে। সাইরাস হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে, একদিনের মধ্যে কোনোরকমেই দ্বীপের পশ্চিম প্রত্যন্তে পৌঁছোনো যাবে না। সুতরাং তিনি ঠিক করলেন যে একটা সুবিধেমতো জায়গা বেছে রাত কাটানোর জন্যে তাঁবু ফেলবেন। ইতিমধ্যে মার্সি নদীর জল ক্রমশ অগভীর হয়ে পড়ছিল ভাটার দরুন; অথচ তখনও আরো পাঁচ মাইলের মতো এগুনো বাকি। সুতরাং সেখানেই, সেই অজানা অরণ্য অঞ্চলেই, রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। করবেন বলে ঠিক করলেন হার্ডিং।

পেনক্র্যাফট ক্যানু তীরের দিকে নিয়ে গেল। তীরের গাছপালার মধ্যে একঝাক বানর বসে কিচির-মিচির করছিল। বানরগুলো তাদের দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু বানরদের হাবভাবে ভীতির কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এই প্রথম তারা দ্বীপে মানুষের দেখা পেল।

তখন বেলা চারটে বাজে ক্যান নিয়ে আর এনো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এদিকে তীরও ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠেছে। হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে তারা ক্রমশই মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের পাদদেশের নিকটবর্তী হচ্ছেন। সুতরাং শিগগিরই তীরে নৌকো ভেড়ানো কর্তব্য।

হার্বার্ট শুধোলে : এখন আমরা গ্র্যানাইট হাউস থেকে কত দূরে সরে এসেছি?

প্রায় মাইল-সাতেক, উত্তর করলেন হার্ডিং : আন্দাজ করে বলছি অবশ্য। স্রোতের টানে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে এসেছি। আজ আমরা এখানে নৌকো ভিড়িয়ে রাতটা

কাটাবো, আর কাল ভোরবেলাতেই নৌকো তীরে বেঁধে রেখে পায়ে হেঁটে চারদিকে ঘুরে-ফিরে দেখবো। পেনক্র্যাফট, তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো, আরো-একটু এগুনো যায় কি না।

একটু পরেই হার্ডিং নৌকো থেকে জলপ্রপাতের গম্ভীর ধ্বনি শুনতে পেলেন। নদী এখানে প্রায় কুড়ি ফুট চওড়া হবে; আরো সামনে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। হার্ডিং-এর বুঝতে বিলম্ব হল না যে তারা একেবারে মার্সি নদীর উৎসমুখের কাছে এসে পৌঁছেছেন।

তখন বিকেল পাঁচটা 1 শেষ বিকেলের সোনালি রশ্মি মার্সির উৎসমুখের জলে পড়ে ঝিকমিক করছে। একটু দূরেই মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গা থেকে অঝোর ধারায় বিশাল জলরাশি নেমে আসছে। সূর্যের রক্তিম আলো সেই ঝরনার জলে পড়ে একটা রামধনুর বর্ণালি সৃষ্টি করেছে। হার্ডিং ঠিক করলেন, এবার তীরে নৌকো ভেড়াতে হবে।

তক্ষুনি তীরে নৌকো ভেড়ানো হল। জায়গাটা দেখতে ভারি সুন্দর। ঘন একসার গাছের নিচে বেশ খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করে নেয়া হল। ঠিক হল সেখানেই রাত্রিবাস করা হবে। শিগগিরই কিছু কাঠ-কুটো জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে-দেয়া হল, যাতে বন্যজন্তুরা আগুন দেখে ওঁদের আক্রমণ করতে সাহস না-পায়। সারাদিন পরিশ্রম করার দরুন খুব খিদে পেয়েছিল। শিগগিরই আহার সেরে নেয়া হল। তারপর ঠিক হল, রাত্রে নেব আর পেনক্র্যাফট পালা করে পাহারা দেবে। অবশ্য রাত্রে কোনো-কিছুই ঘটল না। পরদিন, একত্রিশে অক্টোবর, ভোর পাঁচটার সময় সবাই যাত্রার জন্যে তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে বেলা দুটোর সময়ে দ্বীপের পশ্চিমে উপকূলের সন্ধানে রওনা হয়ে পড়লেন। বলা বাহুল্য, আজকের যাত্রাটা পদব্রজেই শুরু হলো।

পশ্চিম উপকূলে পৌঁছতে কত সময় লাগবে, হার্ডিং তা মোটামুটি একটা আন্দাজ করে নিয়েছিলেন। পথে যদি কোনো বাধা-বিপদ উপস্থিত না-হয়, তাহলে দু-ঘন্টা লাগবে, একটু কম-বেশি হতে পারে। গত রাত্রে বুনো জানোয়ারদের হাঁক-ডাক শোনা গিয়েছিল বলে অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করেই সবাই রওনা হলেন। সাইরাস হার্ডিং চললেন সকলের আগে-আগে।

দ্বীপের এই অংশের জমি অসমতল। কোথাও চড়াই, কোথাও উরাই। প্রথম-প্রথম বনের মধ্যে অসংখ্য বানরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। তারা যে কখনো এর আগে মানুষ দ্যাখেনি, তার প্রমাণ পাওয়া গেল এঁদের দেখে তাদের বিস্ময়চকিত ভঙ্গি থেকে। বিভিন্ন জাতের বরাহ, হরিণ, ক্যাঙারু ইত্যাদির সাক্ষাতও পাওয়া গেল পথে। শিকারের জন্যে অবশ্য পেনক্র্যাফটের হাত নিশপিশ করছিল, তবে এভাবে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না বলেই সে অনেক কষ্টে তার লোভ সামলালে। তবে, ফেরার পথে সে-যে জানোয়ারগুলোকে একহাত দেখে নেবে, স্বভাবসিদ্ধ উচ্চ কণ্ঠে বারবার সে-কথা জাহির করতে সে মোটেই ভুলল না।

প্রায় সাড়ে-নটার সময় অকস্মাৎ তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল খরস্রোতা একটি ঝরনাধারা।

নৌকো চালানোর সুবিধেও নেই, অথচ পায়ে হেঁটেও পার হওয়া একরকম অসম্ভব।

হার্ডিং বললেন, খুব-সম্ভব এই ঝরনার জল সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। এই জলধারা অনুসরণ করে গেলেই আমরা বোধহয় দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে পৌঁছতে পারবো। একটু এগিয়ে দেখা যাক।

স্পিলেট বললেন, এক মিনিট দাঁড়ান। আগে এটার একটা নাম দিয়ে নেয়া যাক। দ্বীপের ভূগোল অসম্পূর্ণ রাখা উচিত হবে না। হার্বার্ট, তুমিই একটা নাম দাও না এই ঝরনার।

আগে দেখা যাক ঝরনাটা কোথায় গিয়ে পড়েছে, বললে হার্বার্ট।

বেশ বললেন হার্ডিং, তবে খামকা এখানে না দাঁড়িয়ে এগিয়ে চলো।

অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ চলতে যত-সময় লাগছিল, এবার ঝরনাধারার গা ঘেঁষে চলতে তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগল। মাঝে-মাঝে পথের মধ্যে বড়ো-বড়ো জানোয়ারের পায়ের ছাপ দেখা গেল। বোঝা গেল, তৃষ্ণার্ত জানোয়ারেরা এই ঝরনার জল পান করতে প্রায়ই এসে থাকে। ইতিমধ্যে ঝরনার স্রোতের তীব্রতা দেখে হার্ডিং বুঝতে পারলেন যে, দ্বীপের পশ্চিম উপকূল তারা যত দূরে বলে আন্দাজ করেছিলেন—আসলে সেটা তারও দূরে।

ক্রমশ ঝরনার জলধারা প্রসারিত হয়ে পড়তে লাগল। স্রোতের তীব্রতাও আস্তে-আস্তে কমতে লাগল। দু-তীরের গাছপালা এমনভাবে জড়াজড়ি করে ছিল যে, তার মধ্য দিয়ে দৃষ্টি চলে। কিন্তু এ-অঞ্চলে যে কোনো মানুষের বাস নেই, তা অবশ্য স্পষ্টই বোঝা গেল। কেননা টপ একবারও ডাকছিল না। অথচ আশপাশে যদি কোনো আগন্তুকের পদসঞ্চার

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

ঘটে থাকে, কিংবা কারু উপস্থিতি থেকে থাকে তবে নিশ্চয়ই টপের মতন চালাক কুকুর না-ডেকে ছাড়তো না। এবার হার্বার্ট সবার আগে-আগে চলতে লাগল।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় হঠাৎ হার্বার্ট যখন সমুদ্র! সমুদ্র! বলে চেঁচিয়ে উঠল তখন হার্ডিং বিস্মিত হলেন। আরো কয়েক মিনিটের মধ্যে সবাই সমুদ্র সৈকতে এসে দাঁড়ালেন। তাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে পড়ল দ্বীপের জনশূন্য পশ্চিম উপকূল।

কিন্তু দ্বীপের উপকূলভাগের সঙ্গে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য পূর্ব উপকূলের! গ্র্যানাইট পাথরের কোনো খাড়াই পাহাড়ের গা, কিংবা বিশালাকার কোনো পাথরের চাই, অথবা হলুদ রঙের বালুময় বেলাভূমি—কিছুই ওদিকে নেই। শুধু তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার ভরা ঘন অরণ্য।

এবার সেই খরস্রোতা স্রোতস্বিনীটির নামকরণ করা হল। এর নাম দেয়া হল ফলস্ রিভার। ফলস্ রিভার থেকে রেপ্টাইল এণ্ড পর্যন্ত গহীন অরণ্যের অপর্যাপ্ত শ্যামলিমা।

সেই সমুদ্রসৈকতের একদিকে ঈষৎ উঁচু একটি ঢিবির মতন দেখা গেল। সেখানে গিয়ে বসলেন সবাই। বেশ খিদে পেয়েছিল। এবার সবাই আহার সেরে নিলেন।

উঁচু ঢিবির মতো থাকায় উপরদিকে সমুদ্রের দিগন্ত পর্যন্ত দৃষ্টিক্ষেপ করা গেল। সেই সীমাহারা নীলকান্তমণির মতো সমুদ্রে একটিও পালের চিহ্ন নেই। তীরের কোথাও কোনো কিছু দেখা গেল না। একটু জিরিয়ে, সাড়ে এগারোটার সময়, হার্ডিং প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলেন।

রেপ্টাইল এণ্ড থেকে ফলস্ রিভার, প্রায় বারো মাইল দূরে হবে। এমনিতে এইটুকু পথ অতিক্রম করতে ঘণ্টা-চারেক সময় লাগে। কিন্তু ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ করে চলতে হবে বলে প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগবার কথা।

সমুদ্রের এইদিকে কখনও যে কোনো জাহাজডুবি হয়েছিলে, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। অবশ্য স্পিলেট বললেন যে সমুদ্রের ঢেউয়ের দরুন হয়তো জাহাজডুবির কোনো চিহ্নই এখানে দেখা যাচ্ছে না, তাই বলে এ-কথা মনে করা অসংগত যে এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়নি। সাংবাদিকের এই যুক্তি ন্যায়সংগত। এ ছাড়া, বুলেটের ঘটনাটি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিন মাসের মধ্যে কেউ এই দ্বীপে নিশ্চয়ই বন্দুক ছুঁড়েছে। সুতরাং বুলেট-রহস্যের কোনো সমাধানই এখন পর্যন্ত হল না।

তখন পাঁচটা বাজে—কিন্তু রেপ্টাইল এণ্ড তখনও মাইল দু-এক দূরে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মার্সি নদীর তীরে কাল যেখানে তারা রাত কাটিয়েছিলেন সেখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে অন্ধকার হয়ে যাবে। সাতটার সময় সবাই রেপ্টাইল এণ্ডে এসে পৌঁছুলেন। এখানেই সমুদ্রতীরের অরণ্য শেষ হয়েছে। নুড়ি-পাথর আর বালি-ভরা বেলাভূমি শুরুই হয়েছে এখান। থেকেই। রাত্রি নেমে আসায় এখানে এসেই সেদিনকার মতো যাত্রা স্থগিত রাখা হল। দূর পশ্চিমে অরণ্য যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে হার্বার্ট বাঁশঝাড় আবিষ্কার করলে। এই বাঁশঝাড় দ্বীপবাসীদের কাছে এক মূল্যবান সামগ্রী রূপে দেখা দিল। কেননা বাঁশ নানান কাজেই ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে এমন ধরনের বাঁশ দেখা গেল, যার মূল সেদ্ধ করে খেতে বেশ সুস্বাদু।

এমন সময় হঠাৎ একটা বুনো জানোয়ারের গর্জন শোনা গেল। সচমকে হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট তাকিয়ে দেখলে, হাত-কয়েক দূরেই একটা জাগুয়ার, লাফ মারবার উদ্যোগ করছে। সঙ্গে-সঙ্গেই গর্জন করে উঠল পেনক্র্যাফটের বন্দুক। কিন্তু দুর্ভাগবশত গুলি ব্যর্থ হল। অন্ধকারে ভীষণভাবে জ্বলে উঠল জাগুয়ারের ভাটার মতো চোখদুটো। গিডিয়ন স্পিলেট শিকারী হিশেবে নাম কিনেছিলেন। এবার উপর্যুপরি কয়েকবার গর্জন করে উঠল তার রাইফেল। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আঘাতে ছিটকে পড়ল জাগুয়ারটা–দু-একবার এঁকেবেঁকে উঠল তার দেহটা, তারপরই নিঃসাড় হয়ে গেল।

তখন সবাই জাগুয়ারটার কাছে দৌড়ে গেলেন। দেখা গেল অব্যর্থলক্ষ্য স্পিলেটের একটি গুলি জাওয়ারটার চোখে লেগেছে। জাগুয়ারটার চামড়াটাকে গ্র্যানাইট হাউসের একটি মূল্যবান সামগ্রী হিশেবে ব্যবহার করা যাবে বলে সবাই খুশি হয়ে উঠলেন।

হার্বার্ট তো উচ্ছ্বসিত হয়ে স্পিলেটকে অভিনন্দন জানালেন। স্পিলেট বললেন, কেউ যদি কোনোরকমে জাওয়ারের চোখে গুলি চালাতে পারে, তবে তার সাফল্য অনিবার্য।

ইতিমধ্যে হার্ডিং কাছেই একটা গুহা আবিষ্কার করেছিলেন। সবাই সেই জায়ারটাকে বয়ে নিয়ে এলেন গুহায়। ঠিক হল এই গুহাতেই রাত্রিবাস করবেন সবাই। নেব গুহার বসে জাগুয়ারটার চামড়া ছাড়াতে লাগল। অন্যরা বন থেকে শুকনো কাঠ-কুটো নিয়ে এলেন। তারপর গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হল যাতে কোনো জানোয়ার গুহায় ঢুকতে না পারে। হার্ডিং-এর নির্দেশমতো বেশ কিছু বাঁশও ঝাড় থেকে কেটে আনা হয়েছিল।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে শুলেন সবাই। শোবার আগে হার্ডিং গুহামুখের অগ্নিকুণ্ডে একরাশ বাঁশ গুঁজে দিয়ে এলেন। একটু বাদেই বাঁশের গাঁটগুলো ভীষণ শব্দ করে ফাটতে লাগল। এই শব্দে যে বুনো জানোয়াররা ভয় পাবে, এ-বিষয়ে হার্ডিং-এর কোনো সন্দেহ ছিল না। বুদ্ধিটা অবিশ্যি হার্ডিং-এর আবিষ্কার নয়। মার্কো পোলোর ভ্রমণবৃত্তান্তে আছে, তাতাররা নাকি বহু শতাব্দী আগে থেকেই এভাবে বুনো জানোয়ারদের তাদের তাঁবুর কাছ থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্থা করতো।

রাত্রিটা নিরাপদেই কাটল। পরদিন সকালে ওঁদের সামনে এই প্রশ্ন জাগল : এখন কি ফিরে যাবেন, না দ্বীপের বাকি অংশটুকু অর্থাৎ দক্ষিণ উপকূলও পর্যবেক্ষণ করে আসবেন? গিডিয়ন স্পিলেট প্রস্তাব করলেন যে অভিযানে যখন একবার বেরিয়ে পড়েছেন, তখন তা সম্পূর্ণ করে যাওয়াই উচিত। শুধোলেন : এখান থেকে ক্ল অন্তরীপ কতটা দূরে হবে?

প্রায় তিরিশ মাইল— বললেন হার্ডিং, কেননা, সমুদ্রতীর তো এঁকেবেঁকে গেছে।

তিরিশ মাইল! উত্তর করলেন স্পিলেট, গোটা দিনই লেগে যাবে তবে। তবুও আমার মনে হয়, দক্ষিণ উপকূল ধরেই গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছুনো ভালো।

কিন্তু হার্বার্ট বললে, ক্ল অন্তরীপ থেকে গ্র্যানাইট হাউস অন্তত দশ মাইল দূরে।

মোট তাহলে চল্লিশ মাইল হল— বললেন হার্ডিং। কিন্তু তবু মিস্টার স্পিলেটের প্রস্তাব মতো কাজ করা ভালো। আজকেই যদি ঐ-দিকটা দেখে আসা যায়, তবে পরে অভিযানে না-বেরুলেও চলবে।

সে-কথা তো বুঝলুম বললে পেনক্র্যাফট, কিন্তু ক্যান? ক্যানুটা যে মার্সি নদীর উৎসমুখে বাঁধা রইল।

তা থাক না। উত্তর করলেন স্পিলেট, একদিন যখন রয়েছে, তখন আরো দু দিন না-হয় রইলোই। তাতে কিছু একটা এসে-যাবে না।

এবার নেব বললে, সমুদ্রতীর ধরে যদি আমরা ক্ল অন্তরীপে পৌঁছুতে চাই তবে তো আমাদের মার্সি নদী পেরুতে হবে।

পেনক্র্যাফট বললে, তার আর ভাবনা কী? ডালপালা দিয়ে না-হয় একটা ভেলা তৈরি করে নেয়া যাবে। ঐ ভেলা বানানোর ভার আমিই নিচ্ছি, তোমাদের সেজন্যে আর মাথা ঘামাতে হবে না। এখনও আমাদের কাছে আরেক দিনের উপযোগী খাবার আছে। এছাড়া এ-দ্বীপে শিকারেরই বা অভাব কোথায়? চলো নেব,-খামকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ভোর ছটার সময়েই অভিযাত্রীদল রওনা হয়ে পড়ল। গুলিভরা বন্দুক নিয়ে এগিয়ে চলল সবাই। এবারকার যাত্রায় টপ চলল সবার আগে-আগে। বেলা একটার সময় সকলে ওয়াশিংটন বে-র অন্য প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন। ইতিমধ্যে তারা প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করেছেন। এত হাঁটাহাঁটির দরুন সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। একটু জিরিয়ে সবাই আহার সেরে নিলেন।

এখান থেকেই উপকূলরেখা অমসৃণ হতে শুরু করেছে। বড়ো-বড়ো পাথরের চাই ইতস্তত ছড়িয়ে আছে উপকূলে। সেই পাথরের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। পথে অগুনতি পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ছিল বলে তাদের হাঁটতে কষ্ট হতে লাগল রীতিমতো। তীক্ষ্ণ চোখে চারদিকে তাকাতে-তাকাতে চললেন সকলে। কিন্তু সেই উপকূলে এমন কোনো চিহ্ন দেখা গেল না, যাতে সম্প্রতি এখানে কোনো জাহাজডুবি হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কোথাও কোনো জাহাজের ভগ্নাংশের ক্ষুদ্রতম চিহ্নও নেই।

বেলা তিনটে বাজল। অভিযাত্রীদল নীরবে এগিয়ে চললেন। এমন কোনো চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না যাতে বোঝা যেতে পারে যে কখনও এই দ্বীপে কোনো মানুষ বাস করতে কিংবা এখনও করে। নীরবতা ভাঙলেন গিডিয়ন স্পিলেট। বললেন, তাহলে এ-কথা ভেবেই আমাদের সান্ত্বনা পেতে হবে যে, লিঙ্কন আইল্যান্ডের আধিপত্য নিয়ে কেউ আমাদের সঙ্গে কোনো কলহ করতে আসছে না।

কিন্তু সেই বুলেটটা? বললে হার্বার্ট, সেটা তো আর কল্পনা নয়।

সে-প্রশ্ন উঠতেই পারে না! ভাঙা দাঁতের কথা স্মরণ করে বলে উঠল পেনক্র্যাফট।

তাহলে গোটা ব্যাপারটা থেকে কী সমাধান বার করবো আমরা? সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন।

এই সমাধান, উত্তর করলেন ক্যাপ্টেন : তিন মাস কিংবা তারও আগে একটি জাহাজ, ইচ্ছে করেই হোক আর অনিচ্ছাসত্ত্বেই হোক, এই দ্বীপে এসে ভিড়েছিল। অবিশ্যি প্রশ্ন

উঠতে পারে যে এই দ্বীপে যদি একদা জাহাজ ভিড়েছিল, তার কোনো চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কিন্তু এ-কথা মানতেই হবে যে এই দ্বীপে বর্তমানে আমরা ছাড়া অন্য–কোনো মানুষ থাকে না। অন্তত আমরা তো তার প্রমাণ পাইনি।

নেব বললে, তাহলে সেই জাহাজটি লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে আবার চলে গেছে? ঈশ! আগে যদি জানা যেতো তবে হয়তো দেশে ফেরা যেতো!

হয়তো যেতো, বললে পেনক্র্যাফট, কিন্তু সে সুযোগ আমরা যখন হারিয়েছি তখন সে সম্পর্কে আর-কোনো প্রশ্ন উঠছে না। বরং গ্র্যানাইট হাউসকে আরো ভালো করে গড়তে হবে এখন।

এমন সময় টপ সাংঘাতিকভাবে ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল। একটু পরেই দেখা গেল, সামনের ঘন গাছপালার মধ্য থেকে টপ কাদা-চটচটে একটা ছেড়া কাপড়ের টুকরো মুখে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে নেব ঐ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো হাতে তুলে নিলে। টপ আবারও ডাকতে শুরু করলে। উত্তেজিত হয়ে সে যেভাবে একবার বনে প্রবেশ করছিল আবার বেরিয়ে আসছিল, তা দেখে বোঝা গেল যে সে সবাইকে তার সঙ্গে আসবার জন্যে প্রার্থনা করছে।

এবার বুলেট-রহস্যের নিষ্পত্তি হবে-বললে পেনক্র্যাফট : আহত কিংবা মৃত কোনো জাহাজডুবি-হওয়া লোকের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে আমাদের।

সকলে টপের পেছনে-পেছনে বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। হার্ডিং-এর নির্দেশমতো সবাই বন্দুকও প্রস্তুত করে নিলেন। কিন্তু বনের বেশ-খানিকটা দূর যাওয়ার পরও

কোনো জনমানবের সাক্ষাৎ না-পেয়ে তাঁরা হতাশ হয়ে পড়লেন। সেই বনের মধ্যে কোনো দূরকালে কোনো মানুষ একবারের জন্যেও পদার্পণ করেছিল কি না বোঝা গেল না। খানিকটা সামনে ঘন গাছপালার মধ্যে হঠাৎ গাছের সংখ্যা একটু বিরল হয়ে যাওয়ায় চৌকো-মতন একফালি জমি দেখা গেল। টপ সেখানে পৌঁছেই থমকে দাঁড়ালো। তারপর আবার ডাকতে লাগলো।

সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকালেন সবাই। কিন্তু না, কোথাও কিছু নেই। গাছে কিংবা ঝোপে-ঝাড়ে কেউ বসে নেই-কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, টপ, ব্যাপার কী তোমার?

টপ আরো জোরে জোরে ডেকে উঠল। ঠিক সেই সময় পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে উঠল; বাঃ! চমৎকার! আশ্চর্য!

কী? জানতে চাইলেন স্পিলেট।

আমরা সমুদ্র পার হলেই যা-কিছুর দেখা পাবো বলে ভেবেছিলুম। বললে পেনক্র্যাফট, কিন্তু শূন্যের কথা আমাদের মনেই হয়নি।ওই দেখুন-উপরে, গাছের ডগায়।

পেনক্রাফটের নির্দেশ মতো উপরে তাকালেন সবাই। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠলেন স্পিলেট : আরে! বেশ মজা তো! এ যে আমাদের হাওয়াই নৌকো—আমাদের বেলুনটা। বাতাসে ভাসতে-ভাসতে এই গাছের মাথায় এসে আটকে গেছে!

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

তক্ষুনি উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : এখনও বেশ ভালো আছে বেলুনের কাপড়! তাই থেকেই কয়েক বছরের জামা কাপড় পাবো আমরা। কী মজা! রুমাল আর শার্ট বানানোর হ্যাঙামাও অনেকখানি কমে গেল। মিস্টার স্পিলেট, যে-দ্বীপের গাছে শার্ট ঝোলে, সে-দ্বীপকে আপনি কী বলবেন?

লিঙ্কন আইল্যাণ্ড। হেসে বললেন গিডিয়ন স্পিলেট।

এই আবিষ্কারও যে সৌভাগ্যসূচক, তাতে আর সন্দেহ কী! বেশ কয়েকশো গজ কাপড় বেলুনটি করতে লেগেছিল। সুতরাং এইভাবে বেলুনটির দেখা পেয়ে সবাই খুশি হয়ে উঠলেন। এখন প্রধান কর্তব্য, গাছের মগডালে উঠে বেলুনটাকে নিচে নামিয়ে আনা। এবং সে-কাজটা খুব সহজ নয়। নে, হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফট তক্ষুনি তরতর করে গাছে উঠে গেল। তারপর বেলুনটাকে নামিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

ঘণ্টাদুয়েক চেষ্টার পর বেলুনটাকে নিচে নামানো গেল। বেলুনটার নিচের দিকটাই শুধু সাংঘাতিকভাবে ফেঁসে গেছে, নইলে এখনও বাকি অংশটা ভালোই। এছাড়া একরাশ দড়ি-দড়াও পাওয়া গেল বেলুনের কল্যাণে। ভাগ্য যখন প্রসন্ন থাকে তখন আকাশ থেকে সম্পদ আসে এই প্রবাদও যে মিথ্যে নয়, এটা বুঝতে আর কারু বাকি রইল না।

বেলুনটার ওজন নেহাত কম নয়। এত ভারি জিনিশ এখান থেকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া মুশকিলের ব্যাপার। সুতরাং একটা নিরাপদ জায়গায় এটা রেখে যাওয়া কর্তব্য। আধঘণ্টা ঘোরাঘুরির পর একটা অপরিসর গুহায় মতো দেখা গেল। সেটাই আপাতত

গুদাম ঘরের কাজ করল। এখানেই বেলুনটাকে এখনকার মতো রেখে দেয়া হল। গুহার কল্যাণে ঝড়-বৃষ্টি এবার বেলুনটির ক্ষতি করতে পারবে না।

জায়গাটার নাম দেয়া হল পোর্ট বেলুন। তারপর ছটার সময় সবাই আবার তাদের অভিযাত্রায় রওনা হয়ে পড়লেন।

এবার খানিকটা এলেই সামনে পড়বে মার্সি নদী। নদী পার হওয়ার জন্যে একটা সেতু তৈরি করা প্রয়োজন। তা যদি এখন সম্ভব না-হয়, তবে আপাতত কাজ চালাবার জন্যে একটা ভেলা বানাতে হবে। পরে সময়মতো সেতু তৈরি করে কাঠের গাড়ি এনে বেলুনটাকে গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া যাবে। ক্যানুটা হাতের কাছে থাকলে অবিশ্যি এক্ষুনি বেলুনটিকে নিয়ে যাওয়া যেতো, কিন্তু ক্যানুটা তো মার্সি নদীর উৎস-মুখে বেঁধে রেখে আসা হয়েছে। মনে-মনে এইসব কথা আলোচনা করতে-করতে সবাই এগিয়ে চললেন।

ইতিমধ্যে সন্ধে নেমে এল। আলো ঝাপসা হয়ে-হয়ে একসময় অন্ধকার হয়ে গেল।

এমন সময় সবাই ফ্লোটসাম পয়েন্টে এসে পৌঁছলেন। এই জায়গাতেই সেই মূল্যবান সিন্দুকদুটো পাওয়া গিয়েছিল। ফ্লোটসাম পয়েন্ট থেকে গ্র্যানাইট হাউসের দূরত্ব চার মাইল। মার্সি নদী অভিমুখে এবার এলেন সবাই। ওঁরা যখন মার্সি নদীর তীরে এসে পৌঁছলেন, তখন মধ্যরাত্রি।

মার্সি নদী সেখানে প্রস্থে প্রায় আশি ফুটের মতো। এবার এই আশি ফুট কী করে অতিক্রম করা যায়, সেই হল সমস্যা। পেনক্র্যাফট আগে বলেছিল যে ভেলা বানিয়ে সে নদী পেরুবার ব্যবস্থা করবে, সুতরাং এবার সেই কাজে রত হতে হল তাকে।

সারাদিনের পরিশ্রমে সকলের দেহে-মনে তখন একটা অবসাদ নেমে আসছে। খিদেয়, তেষ্টায় তখন সবাই অতিরিক্ত ক্লান্ত, গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমনোর জন্যে ব্যস্ত। নদী পেরুতে পারলেই হল-তারপর তো গ্র্যানাইট হাউস মিনিট পনেরোর রাস্তা...।

ঘন অন্ধকার-ঢালা রাত্রি। পেনক্র্যাফট তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল কাজে। সে আর নেব দুটো গাছ কাটতে শুরু করে দিলে। সাইরাস হার্ডিং আর স্পিলেট নদীর তীরে বসে-বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন, গাছ কাটা কখন সাঙ্গ হয়। হার্বার্ট কাছেই নদীর তীরে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগল। হঠাৎ মার্সি নদীর দিকে তর্জনী নির্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠল : আরে! কী ভাসছে এখানে?

পেনক্র্যাফট তক্ষুনি কুঠার হাতে নদীতীরে ছুটে এল। জলের মধ্যে কী-একটা অস্পষ্ট জিনিশ ভাসছিল। সেদিকে তাকিয়েই সে বলে উঠল : ক্যান! একটা ক্যানু!

সবাই এগিয়ে গেলেন। অবাক চোখে দেখতে পেলেন যে একটা ক্যানু স্রোতের টানে ভেসে আসছে তীরের দিকে।

পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে ডাকলে : নৌকোয় কে আছো!

কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। নৌকোটা তীরের দিকে ভেসে আসতে লাগল।

তীর থেকে তখন নৌকোটা মাত্র ফুট বারো দূরে, এমন সময় অবাক কণ্ঠে পেনক্র্যাফট বলে উঠল : আরে! এ-যে আমাদেরই নৌকোটা! কোনোমতে বাঁধন ছিঁড়ে স্রোতের টানে ভাসতে-ভাসতে চলে এসেছে! ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে নৌকোটা!

আমাদের নৌকো! গম্ভীর অথচ ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন সাইরাস হার্ডিং।

পেনক্র্যাফটের কথাই ঠিক। এঁদেরই নৌকো এটি। কোনো কারণে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় স্রোতে ভাসতে ভাসতে এদিকপানে এসেছে।

লম্বা একটা বাঁশের সাহায্যে তক্ষুনি নৌকোটা তীরে টেনে আনল পেনক্র্যাফট আর নেব। নৌকো তীরে ভিড়তেই হার্ডিং উঠে প্রথমে দড়িটা পরীক্ষা করলেন। দেখা গেল, পাথরে ঘষা খেয়ে-খেয়ে দড়িটা ছিঁড়ে গেছে। স্পিলেট ফিশফিশ করে হার্ডিংকে বললেন : তবু ব্যাপারটা আমার কাছে আশ্চর্য লাগছে।

আশ্চর্য? কী যেন ভাবতে ভাবতে বললেন হার্ডিং : হ্যাঁ, আশ্চর্য তো নিশ্চয়ই!

আশ্চর্য হোক বা না-হোক, ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছে ক্যানটা। তারা যদি মধ্যযুগে বাস করতেন, তবে হয়তো মনে করতেন এ কোনো অপার্থিব ব্যাপার। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে অলৌকিককাণ্ডে বিশ্বাস করেন কী করে! হার্ডিং মনে-মনে বললেন : তবু আমি জানি কেউ-একজন অলক্ষে থেকে আমাদের সাহায্য করে চলেছে। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? এত খোঁজাখুঁজি সত্ত্বেও তাকে দেখতে পেলুম না কেন?

কোনো উত্তর না-পেয়ে হার্ডিং-এর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

একটু বাদেই তারা নদীর অপর তীরে পৌঁছুলেন। ক্যানুটা ধরাধরি করে চিমনির কাছেই সমুদ্র সৈকতে তুলে আনা হল। তারপর সবাই গ্র্যানাইট হাউসের দড়ির সিঁড়ির দিকে এগুলেন।

এমন সময় কেন যেন টপ রুদ্ধ কণ্ঠে গজরাতে লাগল। নেব ছিল সকলের আগে। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ালে।

কী সর্বনাশ! সিঁড়ি কোথায় গেল?

.

২.৩ ঘটনার আবর্ত

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সাইরাস হার্ডিং। একটা কথাও বেরুলো না তার মুখ দিয়ে।

অন্যরা অন্ধকারেই হাড়ে হাড়ে দেখল গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল। তবে কি হাওয়ায় একটু নড়ে গিয়েছে সিঁড়িটা?.. কিন্তু না সিঁড়িটা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়েছে।

মিনিট কয়েক পরে পেনক্র্যাফটের হতভম্ব স্বর শোনা গেল : লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দেখছি শেষ পর্যন্ত অলৌকিকের রাজত্ব হয়ে উঠল।

অলৌকিক নয়, পেন্যাফট, বললেন স্পিলেট : খুব সহজ ব্যাপার। আমাদের সবার অনুপস্থিতির সুযোগে কেউ-একজন এসে গ্র্যানাইট হাউস দখল করেছে এবং সিঁড়ি উপরে তুলে ফেলেছে।

কেউ-একজন। চেঁচিয়ে উঠল নাবিক। কিন্তু কে সে?

যে বুলেট ছুঁড়েছিল, সে ছাড়া আর কে! সাংবাদিক জবাব দিলেন।

অধৈর্য হয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, পরক্ষণেই ভীষণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল : কে আছো গ্র্যানাইট হাউসে? কে?

উত্তরে মৃদু-একটা হাসির শব্দই শোনা গেল। সে-হাসি মানুষের, না অন্য কোনো জীবের, তা ভালো বোঝা গেল না। দ্বীপে তারা আছেন সাত মাস হল। এতদিনের মধ্যে একের পর এক রহস্যময় ঘটনা ঘটেই চলেছে, এর মীমাংসা তাঁরা এখনও করতে পারেননি। কিন্তু এবার ঘটনার আবর্তে তারা যে আশ্চর্য বিস্ময়ের সম্মুখীন হয়েছেন, তার সঙ্গে আগেকার অন্য-কোনোকিছুর তুলনাই হয় না। এই ব্যাপারটির গুরুত্বের কথা মনে পড়তেই একটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব আচ্ছন্ন করল সবাইকে। বিস্ময়ে দু-চোখ যেন বিস্ফারিত হয়ে ফেটে পড়তে চাইছে।

অবশেষে বহুক্ষণ বাদে সাইরাস হার্ডিং-এর গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : বন্ধুগণ! এখন আমাদের সামনে একটিমাত্র পথ খোলা আছে—সে হল দিনের জন্যে অপেক্ষা করা। দিনের আলোয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে আমাদের। কিন্তু এখন সবাই

চিমনিতে ফিরে চলল। হয়তো আহারের ব্যবস্থা করা চলবে না, কিন্তু চিমনিতে নিরাপদে ঘুমুনো যাবে।

পেনক্র্যাফট হতভম্ব কণ্ঠে আবার জিগেস করলে : কিন্তু কে আমাদের এ-রকম করে বিপদে ফেলল?

সে কে—তা জানা গেল না। হার্ডিং-এর প্রস্তাব কাজে পরিণত করা ছাড়া এখন তাদের করবার অন্য কিছু ছিল না। সবাই চিমনির দিকে রওনা হলেন। চিমনিতে প্রবেশ করে সবাই শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু কারু চোখেই ঘুম এলো না। গ্র্যানাইট হাউসে তাদের সবকিছু রয়েছে-অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, রসদ-সবকিছু। কে সেই ব্যক্তি, যার জন্যে গ্র্যানাইট হাউস তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল?

পুবের আকাশ দিনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে-না-উঠতেই গুলিভরা বন্দুক হাতে করে সবাই গ্র্যানাইট হাউসের নিচের জমিতে এসে দাঁড়ালেন। তখনও একটু-একটু কুয়াশা ছিল। তবু গ্র্যানাইট হাউসের বন্ধ জানলাগুলো স্পষ্টই দেখা গেল। ওঁরা যে-রকম দেখে গিয়েছিলেন সেইরকমই পড়ে আছে গ্র্যানাইট হাউস। তফাতের মধ্যে, সদর দরজাটা একেবারে হাট করে খোলা। কেউ-একজন যে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করেছে, সে-বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহই নেই। সিঁড়ির উপরের অংশটা আগের মতোই ঝুলছে, শুধু নিচের দিকটাই টেনে তোলা হয়েছে মধ্যবর্তী প্ল্যাটফর্মে।

অবাঞ্ছিত আগন্তুকরা যে আর-কাউকে গ্র্যানাইট হাউসে ঢুকতে দিতে চায় না, তা স্পষ্টই বোঝা গেল। আবারও চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হলুদ রঙ ছড়াতে-ছড়াতে আকাশে উঠে এসেছে। রোদের আলোয় স্নান করতে লাগল গ্র্যানাইট হাউস। কিন্তু গ্র্যানাইট হাউসের ভিতর-বাহির তবু মৃত্যুর মতো নীরব হয়ে পড়ে রইল। যদিও সিঁড়ির অবস্থা দেখে সকলের মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যিই কি কেউ গ্র্যানাইট হাউসে ঢুকেছে? যদি কেউ তাদের অনুপস্থিতিতে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এখনও সে ওখানেই আছে। কিন্তু কী করে এই খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা যায়!

হঠাৎ হার্বার্টের মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সিঁড়ির যে-শেষাংশ পাহাড়ের গায়ে ঝুলছে। কোনোরকমে যদি তা একবার নিচে নামানো যায়, তাহলেই সব মুশকিল আসান হয়ে যায়। হার্বার্ট ভাবলে, ওদের কাছে তীরধনুক আছে, তীরের পেছনে দড়ি বেঁধে যদি সেই সিঁড়ির শেষ পা-দানির ফাঁকের মধ্য দিয়ে তীর ছোড়া যায়, তবে হয়তো সিঁড়িটা আবার ভূমি স্পর্শ করবে। সৌভাগ্যবশত বেলুনের দড়িদড়াগুলো সঙ্গেই নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা। সুতরাং হার্বার্ট তক্ষুনি তার বুদ্ধিকে কাজে পরিণত করতে লেগে গেল। বারকয়েক চেষ্টার পর দড়িবাঁধা তীর সিঁড়ির শেষ পা-দানির মধ্যকার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই কে যেন সজোরে হ্যাচকা টান মেরে সিঁড়িটা আরো উপরে তুলে নিয়ে গেল।

রাস্কেল! চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : যদি বন্দুক ছোড়বার সুযোগ পাই তবে তোমাদের মজা দেখিয়ে দেবো!

কিন্তু কে সিঁড়িটা টেনে তুলল? জিগেস করলে নেব।

কে? কেন, তুমি দ্যাখোনি? পেনক্র্যাফট বললে : একটা বানর-ওরাংওটাংও হতে পারে! ব্যাবুন গোরিলা হওয়াও বিচিত্র নয়। গ্র্যানাইট হাউস দখল করেছে বানরের দল– আমাদের অনুপস্থিতিতে ওই বানরগুলোই উপরে উঠে সিঁড়ি টেনে তুলে নিয়েছে।

পেনক্র্যাফটের কথা যে মিথ্যে নয়, পরমুহূর্তেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় একপাল বানরের মাথা দেখা গেল। পেনক্র্যাফট তখুনি বন্দুক তুলে ট্রিগারে চাপ দিল। বন্দুকের গর্জন থামতে-না-থামতেই একটি বানর গ্র্যানাইট হাউসের জানলা থেকে ছিটকে পড়ল শূন্যে, তারপর সেই বানরের মৃতদেহটা সশব্দে নিচে পড়ে গেল। অন্য বানরগুলো কিন্তু সেই মুহূর্তে জানলা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

যে-বানরের মৃতদেহটা নিচে পড়ল দেহ তার বিশাল শিম্পাঞ্জি, গোরিলা কিংবা ওরাংওটাং হবে। প্রাণীবিজ্ঞানের ছাত্র ভালো করে লক্ষ করে জানালে যে মৃতদেহটা ওরাংওটাং-এর।

মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে নেব বললে : জানোয়ারটা সত্যিই জানোয়ার।

কিন্তু তবু সমস্যার নিষ্পত্তি হল কই? বললে পেনক্র্যাফট : কী করে আমরা উপরে উঠবো?

ঠিক এমন সময় ঘটনার ধারা একেবারে পালটে গেল। সবাই যখন নিচু হয়ে ওরাংওটাংটাকে দেখছে, এমন সময় টপ হঠাৎ সাংঘাতিকভাবে চেঁচিয়ে উঠল। দেখা গেল, কোনো অজ্ঞাত কারণে ভীত-গ্রস্ত হয়ে ওরাংওটাং-এর দল পালাতে শুরু করেছে। তারা সাংঘাতিকভাবে চাচাতে শুরু করলে, তারপর একটার ঘাড়ে আরো-একটা পড়ে

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা গ্র্যানাইট হাউস পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল। কেউ-বা উপর থেকে সোজা লাফ দিলে নিচে, তারপর একেবারে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল, আস্তে-আস্তে গড়িয়ে সিঁড়ি নেমে আসছে।

কী ব্যাপার! বললে পেনক্র্যাফট : ভারি আশ্চর্য তো!

সিঁড়িতে পা দিতে-দিতে নাতিস্ফুট কণ্ঠে সাইরাস বললেন : ভারি আশ্চর্য!

একটু সাবধান হয়ে, ক্যাপ্টেন, বললে পেনক্র্যাফট : এখনও হয়তো গোটাকয়েক রাস্কেল উপরে আছে!

দেখা যাক, বলতে-বলতে ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। অন্যরা তাকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই গ্র্যানাইট হাউসে উঠে এলেন। তন্ন-তন্ন করে চারদিক খুঁজলেন সবাই। না, কেউ কোথাও নেই। কিন্তু তাহলে সিঁড়িটা নিচে ফেললে কে? ঠিক এমন সময় একটা চ্যাঁচামেচি শোনা গেল, চীৎকার করতে করতে একটা বিশালদেহী ওরাংওটাং প্রবেশপথ থেকে বেরিয়ে এসে ভাড়ার ঘরে ঢুকল। পেনক্র্যাফট তার কুঠার তুলে ওরাংওটাংটার মুণ্ডচ্ছেদের ব্যবস্থা করতে যেতেই হার্ডিং বললেন : একে মেরো না, পেনক্র্যাফট। মনে রেখো, এ-ই আমাদের জন্যে সিঁড়ি নিচে ফেলে দিয়েছিল।

এমন স্বরে হার্ডিং কথাগুলো বললেন যে, তিনি যে ঠাট্টা করছেন না তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না।

তারপর বেশ খানিকক্ষণ চেষ্টা করে সবাই মিলে ওরাংওটাংটিকে গ্রেপ্তার করলেন। ওরাংওটাংটি প্রতিরোধের বিশেষ চেষ্টা করলে না, বোঝা গেল কোনো অজ্ঞাত কারণে সে ভয় পেয়েছে।

ওরাংওটাংরা খুব চালাক। শুধু আকারেই মানুষের সঙ্গে ঈষৎ তফাৎ, নইলে মানুষই বলা চলতো ওদের। আর পেনক্র্যাফটের কথামতো ওরাংওটাংরা যে কথা বলতে পারে না সেইটে ভারি আপশোশের ব্যাপার। তবে ডারউইনের কথামতো বলা যায় যে, ওরাংওটাংরা মানুষেরই পূর্বপুরুষ! সেই কারণেই ক্যাপ্টেন এ-কথা বললেন যে, একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে ওরাংওটাংটা ওঁদের ভৃত্যের কাজ করতে পারবে। অবিশ্যি এর মধ্যে একটি যদি আছে। যদি পোষ মানে, তবেই তো।

পেনক্র্যাফট তো তক্ষুনি ওরাংওটাংটার কাছে গিয়ে বলল : কী হে ওরাং সাহেব, ভালো তো।

ওরাংওটাংটা জবাবে এমন একটা শব্দ করে উঠল, যার মধ্যে রাগের কোনো আভাস নেই।

আবারও পেনক্র্যাফট শুধোলে : তুমি আমাদের দলে যোগ দেবে তো? না কি, সাইরাস হার্ডিং-এর দলে যোগ দেয়া তোমার অপছন্দ?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আবারও ওরাংওটাংটা অমনি একটা শব্দ করলে।

কিন্তু বাছা, আগেই তোমাকে বলে রাখছি, খাবার-দাবার ছাড়া মাইনে কিন্তু আমরা দিতে পারবো না।

আবারও ওরাংওটাংটি যা শব্দ করলে তাকে ইতিবাচক বলা যেতে পারে।

গিডিয়ন স্পিলেট মন্তব্য করলেন : তোমাদের কথাবার্তা বন্ধ করো তো, পেনক্র্যাফট। অসহ্য লাগছে আমার।

পেনক্র্যাফট উত্তর দিলে : আর যা-ই হোক, বাছা আমার বিশেষ অবাধ্য নয়। কম কথা বলে–এটা একটা সুলক্ষণ।–হ্যাঁ বাছা, মনে থাকবে তো, কোনো মাইনে পাবে প্রথমটা। তবে যদি তোমার কাজ দেখে আমরা খুশি হই, তাহলে একসঙ্গে দ্বিগুণ মাইনে পাবে।

এইভাবেই ওদের দল ভারি করলে ওরাংওটাংটি। পেনক্র্যাফট তার নাম দিল জুপিটারসংক্ষেপে জাপ। কেউ সে নামে আপত্তি করল না। সুতরাং মাস্টার জাপ গ্র্যানাইট হাউসেই থেকে গেলেন।

এরপর তাদের প্রথম কর্তব্য হল, নিচে-পড়ে-থাকা মৃত ওরাংওটাংগুলো সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করা। সবাই মিলে ওরাংওটাংগুলোকে বনের ধারে নিয়ে কবর দিয়ে দিলেন। সেকাজ সাঙ্গ হবার পর হার্ডিং জানালেন, এবার তাঁদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল, মার্সি নদী পারাপারের জন্যে একটি সেতু নির্মাণ করা। তারপর মুসমন ইত্যাদি জর জন্যে একটি বাসস্থান তৈরি। এই দুই কাজ সাঙ্গ হলে অসুবিধে অনেক কমে যাবে। মুসমনদের

বাসস্থান কোথায় হবে, সে-জায়গাটার কথাও ক্যাপ্টেন সবাইকে জানালেন। তিনি বললেন, রেড ক্রীকের আশপাশে কোনোখানে সেটা তৈরি করলে সুবিধে হয়।

পরদিন তেসরা নভেম্বর থেকে সবাই উঠে-পড়ে লাগলেন মার্সি নদীর উপর সেতু নির্মাণে। সমস্ত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম নিয়ে সবাই মার্সি নদীর তীরে এসে পৌঁছুলেন। সেতুটা এমন জায়গায় নির্মাণ করা হবে ঠিক হল, যে-জায়গা থেকে দ্বীপের সর্বত্র চলাচলের একটা সুরাহা হয়। মার্সি নদীর এই সেতু তৈরি করতে তিন সপ্তাহ সময় লাগল। এই সময়টুকু সাংঘাতিক খাটতে হল সবাইকে। তারপর বিশে নভেম্বর সেতুর কাজ সম্পূর্ণ হল। বাঁশ আর কাঠ দিয়েই সেতুটা তৈরি করা হল বটে, কিন্তু তবু খুব মজবুত হল।

এ ক-দিনের মধ্যে মাস্টার জাপ আস্তে-আস্তে ওঁদের পোষ মেনেছে জাপকে যা করতে দেখিয়ে দেয়া হয়, নীরবে সে তা পালন করে। এ ছাড়া টপ আর জাপের মধ্যে বন্ধুত্বও হয়েছে। অবসর সময়ে দুজনে একসঙ্গে বসে খেলা করে।

ইতিমধ্যে সেই একদানা গম থেকে বেশ-খানিকটা গম পাওয়া গেল। দশটি অঙ্কুর। বেরিয়েছে সেই গমের দানা থেকে, আর এক-একটা অঙ্কুরে আশিটা করে গমের দানা পাওয়া গেল। সুতরাং আটশো গমের দানা পেলেন তাঁরা। অবিশ্যি পেনক্র্যাফটের সতর্কতা ব্যতীত তাঁদের এই প্রথম চাষ সফল হত কি না বলা দুষ্কর।

এবার দ্বিতীয় চাষের জন্যে একটা জমি তৈরি করা হল, আর সেই জমির চারদিকে উঁচু করে বাঁশের বেড়া দেয়া হল। আর পাখিদের তাড়াবার জন্যে কাকতাড়ুয়াও তৈরি করা হল। তারপর সেই আটশোটি গমের দানা রোপণ করলেন তারা।

একুশে নভেম্বর হার্ডিং দ্বীপের মধ্যে জল সরবরাহের জন্যে একটা খাল কাটবার মৎলব করলেন। ঠিক হল, পশ্চিম সমভূমি ঘুরে লেক গ্ল্যান্টের দক্ষিণ কোণ বেষ্টন করে সেই খাল এসে পড়বে মার্সি নদীর প্রথম বাঁকে। বারো ফুট চওড়া আর ছ-ফুট গভীর হবে সেই খাল।

ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষের মধ্যেই সেই খাল কাটা হয়ে গেল। অবিশ্যি এজন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করলেন সবাই।

ডিসেম্বর মাসে গরম পড়ল অত্যন্ত ভয়ানক। তবু সেই ভয়ানক গরমের মধ্যেই সবাই মিলে কাজ চালিয়ে গেলেন। এবার তাদের প্রথম কাজ হল, পোষমানা পশুপাখির জন্যে খোয়াড় তৈরি করা। লেক গ্ল্যান্টের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দুশো বর্গগজ জমি জুড়ে সেই খোঁয়াড় তৈরি করা হবে ঠিক হল। খুব শক্ত করে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে চারদিকে বেড়া দেয়া হল। তারপর পাখিদের জন্যে কাঠ দিয়ে কয়েকটা খুপরিও তৈরি করা হল। তারপর সবাই খোঁয়াড়ের অধিবাসী সংগ্রহের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

প্রথমে ধরা হল দুটি টিনামুস, তারপর লেক গ্ল্যান্টের কাছ থেকে এক-ডজন হাঁস। পেলিক্যান, জল-মুরগি ইত্যাদি ধরবার জন্যে আর কষ্ট করতে হল না, আপনা থেকেই তারা খোয়াড়ের অধিবাসীদের দল ভারি করলে। তারপর আস্তে-আস্তে পাঁচটি ওনাগা

(জিব্রা এবং কনাগার মধ্যবর্তী একজাতীয় চতুষ্পদ; খুব ভালো দৌড়ুতে পারে), গোটা-সাতেক মুসমন এবং আরো দু-এক জাতের জীব এসে খোঁয়াড়ে ভিড় করলে। তারা অবিশ্যি আপনা থেকে আসেনি, অনেক হ্যাঙ্গামার পর ধরতে হয়েছে তাদের। তারপর একটা বেশ বড়ো-শড়ো গাড়ি প্রস্তুত করলেন সবাই। ঘোড়া না-পাওয়া গেলেও ওনাগা পাওয়া গেছে। ওনাগার সাহায্যেই গাড়ি চালানো যাবে।

পেনক্র্যাফট নিয়েছিল খোয়াড়ের ভার। কয়েক দিনের মধ্যেই সে ওনাগাদের পোষ মানিয়ে ফেললে। তারও কয়েক দিন পর প্রথম যেদিন ওনাগার গাড়ি ছুটল দ্বীপে, সেদিন তো পেনক্র্যাফট রীতিমত হৈ-চৈ বাধিয়ে বসল।

ইতিমধ্যে বেলুন থেকে পাওয়া লিনেনের সাহায্যে পরনের কাপড়ের একটা সুরাহা হয়ে গেল। সিন্দুকের মধ্যে উঁচ ছিল, তারই সাহায্যে লিনেনের জামা-কাপড় বানানো হল। বিছানার চাদর ইত্যাদিও তৈরি করা হল। অর্থাৎ, এক কথায়, বেশ-একটু স্বাচ্ছন্দ্য এলো তাদের জীবন-যাত্রায়।

বলা বাহুল্য যে, এ ক-দিন জাপ দ্বীপবাসীদের ঘর-গেরস্থালির কাজে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে শুরু করেছে। এভাবেই জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত কেটে গেল।

আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকেই ভয়ানক গরম পড়ল। তাই বলে ওঁদের শিকার কিন্তু বন্ধ রইল না। আশুতি, পিকারি, ক্যাশিবরা, ক্যাঙারু ইত্যাদি শিকারও করা হল, ধরাও হল খোয়াড়ের অধিবাসীদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্যে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ইতিমধ্যে জাপ রীতিমতো ওস্তাদ খানশামা হয়ে উঠেছে। একদিন দেখা গেল ন্যাপকিন হাতে সে ওঁদের ডিনার টেবিল তদারক করবার জন্যে তৈরি। মনোযোগী জাপ থালা পালটে, ডিশ এনে, গেলাশে জল দিয়ে, এমন গম্ভীরভাবে আপন কাজ করে চলল যে, হার্ডিং পর্যন্ত না-হেসে পারলেন না। সবচেয়ে বেশি হৈ-চৈ করতে লাগল পেনক্র্যাফট। একটু পরেপরেই সে বলতে লাগল : জাপ, একটু সুপ! জাপ, লক্ষ্মী জাপ, একটু জল!— ইত্যাদি। ইত্যাদি।

প্রত্যেকবারই নীরবে জাপ সকলের চাহিদা সরবরাহ করতে লাগল। তা কাজে একটুও গোলমাল হল না। তাই দেখে পেনক্র্যাফট বললে : সত্যি জাপ, এবার তুমি দ্বিগুণ মাইনে চাইতে পারো।

বলা বাহুল্য যে, জাপ গ্র্যানাইট হাউসের ঘরকন্নার ভার এবার থেকে, বলতে গেলে, পুরোপুরিই নিয়ে নিলে নিজ হাতে। এখন তো সে গ্র্যানাইট হাউসের একজন পুরোদস্তুর মেম্বার। তার গাল-গল্প, হাসি-খেলা সব চলে টপের সঙ্গে। টপ বোধহয় এবার জাপের জন্যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, আর টপের জন্যে প্রাণ দিতে জাপও সর্বদা তৈরি।

জানুয়ারির শেষ দিকে দ্বীপের একেবারে মাঝখানে তাঁদের কাজ শুরু হল। ঠিক হল যে, রেড ক্রীকের উৎসের কাছে ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের পাদদেশে একটি কোর্যাল তৈরি করা হবে। গ্র্যানাইট হাউস থেকে পাঁচ মাইল দূরে কোর্যালের নির্মাণস্থান ঠিক করা হল। হার্ডিং তাঁর এঞ্জিনিয়ারসুলভ নৈপুণ্যের সঙ্গে শিগগিরই কোর্যালের একটা প্ল্যান তৈরি করে ফেললেন। জানোয়ারদের আশ্রয় নেয়ার জন্যে শেডও থাকবে কোর্যালে। তারপরেই সবাই কোর্যাল তৈরির কাজে উঠে-পড়ে লাগলেন। খুব মজবুত করে বানানো হল

www.bengaliebook.com

কোর্যাল। চারপাশে দেয়া হল শক্ত বেড়া। কোর‍্যালের কাজ শেষ হতে-হতে তিন সপ্তাহ লেগে গেল। তারপর শুরু হল কোর‍্যালের জন্যে জানোয়ার সংগ্রহের পালা। যদিও অনেক পরিশ্রম করতে হল, তবুও কোনো নালিশ রইল না তাদের। কেননা, শিগগিরই কোর‍্যাল প্রায় ভর্তি হয়ে গেল।

সারা ফেব্রুয়ারি মাসে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটল না। যন্ত্রচালিতের মতো এতে লাগল সকলের কাজ। কোর‍্যালে যাওয়ার জন্যে রাস্তাটা সুগম করা হল, পোর্ট বেলুনের সঙ্গেও যাতে সহজে সংযোগ করা যায়, সেইজন্যে সেখানে যাওয়ার জন্যেও ভালো করে রাস্তা তৈরি করা হল।

শীত আসবার আগেই যাতে রসদের একটা ব্যবস্থা করা যায়, সেইজন্যে নানান রকম শাকসজিরও একটি বাগান করা হল। উদ্ভিদতত্ত্ব হার্বার্টের ভালো পড়া ছিল বলে সে-ই এই কাজে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলে। দ্বীপের সমতল ভূমির জমি বেশ উর্বর ছিল বলে বাগানের কাজেও তাদের ব্যর্থতা বরণ করতে হল না। ক্রমশ গরমের দিন প্রায় শেষ হয়ে গেল। এই গ্রীষ্মকালে দিনের তীব্র উত্তাপের পর সন্ধেবেলা সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রসপেক্ট হাইটের উপর বসে-বসে ভঁরা গল্পগুজব করতেন।

সেখানে শুধু গল্পগুজবই হত না, নির্ধারিত হত ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা। মাঝে-মাঝে স্বদেশের কথাও উঠতো। যুদ্ধ কি শেষ হয়েছে এতদিনে? কে জিতল লড়াইয়ে? নিঃসন্দেহে জেনারেল গ্র্যান্ট রিচম দখল করেছেন। আহা! যদি একটা খবরের কাগজ পাওয়া যেত কোনোরকমে! এদিকে চব্বিশে মার্চ আসছে শিগগিরই। প্রায় এক বৎসর পূর্ণ হতে চলল লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসবার পর থেকে। যখন তারা দ্বীপে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন

ছিলেন ভাগ্যহত কয়েকজন ব্যক্তিমাত্র। আর এখন? জ্ঞানবৃদ্ধ ক্যাপ্টেনের আশ্চর্য প্রখর বুদ্ধি আর সকলের সম্মিলিত পরিশ্রমের দরুন এই নির্জন দ্বীপকে তারা বাসযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন। এইসব কথা আলোচনা করতে-করতে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে নতুন-নতুন পরিকল্পনা করতেন তারা।

অবিশ্যি সাইরাস হার্ডিং এই ধরনের আলাপ-আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরব হয়ে থাকতেন। নিঃশব্দে তিনি শুনতেন তার সঙ্গীদের কথাবার্তা, কখনো-কখনো তরুণ হাবার্টের কল্পনাবিলাসে তার ঠোঁটে হাসির ঝিলিক খেলে যেতো, কখনো-বা পেনক্র্যাফটের আজব বা আজগুবি প্ল্যান শুনে সশব্দে হেসে উঠতেন তিনি। কিন্তু সবসময়েই তাঁর মাথায় ঘুরে বেড়াতে একটি জিনিশ। সে হল সেই রহস্যময় ঘটনাবলি, সেই আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার, যার কোনো মীমাংসা করা এখনও সম্ভব হয়নি। দ্বীপে যে কোনো-একজন লোক আছে, সে-বিষয়ে হার্ডিং প্রায় নিঃসন্দেহ। কিন্তু সে কে? থাকেই বা কোথায়? তাদের সাহায্য করছে অথচ দেখা দিচ্ছে না কেন?-না এ করছে অথচ দেখা দিচ্ছে না কেন?-না, এর কোনো উত্তরই খুঁজে পাননি হার্ডিং।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে হঠাৎ আবহাওয়া বদলে গেল। পয়লা তারিখ ছিল পূর্ণিমা, গরমও পড়েছিল অসহ্যরকম। কিন্তু দুই তারিখে আকাশে গজরাতে লাগল বজ্র, পূর্বদিক থেকে বইল হাওয়া, ঝড়ের সম্ভাবনা জাগল বায়ুকোণে। সেই সম্ভাবনা সত্যি-সত্যিই উন্মত্ত ঝঞ্ঝায় পরিণত হল। এই বিশ্রী আবহাওয়ার স্থিতিকাল হয়েছিল এক সপ্তাহ। বাইরের কোনো কাজ আপাতত হাতে না-থাকায় এই ঝড়ের সময় সবাই গ্র্যানাইট হাউসের গেরস্থালির কাজে মন দিলেন। বন্দুক রাখবার জন্যে র‍্যাক বানালেন, রান্নাবান্নার কিছু-কিছু সরঞ্জাম তৈরি করা হল, টেবিল আর তাকও বানানো হল গোটাকয়েক।

মাস্টার জাপের কথা কেউ ভুলে যায়নি। এবার ভাড়ার ঘরের পেছনে একটা পার্টিশন দিয়ে সম্পূর্ণ একটা ঘর ছেড়ে দেয়া হল তার দখলে। ইতিমধ্যে জাপ তার কাজে-কর্মে আরো দুরন্ত হয়ে উঠেছে। তার কাজের ধারা দেখে সবসময়েই হৈ-চৈ করতে পেনক্র্যাফট। দিন-দিন তার কাজের উন্নতি হচ্ছে দেখে পেনক্র্যাফটের উৎসাহও বেড়ে চলল।

দ্বীপবাসীদের স্বাস্থ্যে কোনো দোষত্রুটি ছিল না। এই এক বছরে হার্বার্ট তো দু ইঞ্চি লম্বাই হয়ে গেছে। অন্য-সবার স্বাস্থ্যও নিখুঁত ছিল।

মার্চের নয় তারিখে এই তুমুল ঝড় থামল, কিন্তু সারা মার্চ মাস জুড়েই আকাশ মেঘ মুড়ি দিয়ে রইল। প্রায়ই বৃষ্টিপাত হত, মাঝে-মাঝে বেজায় কুয়াশাও পড়তো। এরই মধ্যে একটি স্ত্রী-ওনাগার বাচ্চা হল। কোর‍্যালে মুসমনের সংখ্যাও বেশ বৃদ্ধি পেলে।

একদিন কথায়-কথায় পেনক্র্যাফট ক্যাপ্টেন হার্ডিংকে বললে : ক্যাপ্টেন, আপনি একবার বলেছিলেন যে, সিঁড়ির পরিবর্তে গ্র্যানাইট হাউসে ওঠবার জন্যে একটা যন্ত্র বানানো সম্ভব। এবার সেই কাজে লাগলে হয় না?

খুবই সহজ ওটি বানানো। কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো প্রয়োজন আছে?

নিশ্চয়ই, ক্যাপ্টেন। নিছক প্রয়োজনের তাগিদেই তো এতদিন কাজ করে এসেছি, এবার একটু স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দিলে কোনো ক্ষতি নেই। আমাদের কাছে হয়তো এ-স্বাচ্ছন্দ্যের জিনিশ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মালপত্র তোলবার ব্যাপারে এ আমাদের

প্রয়োজনের কোঠায় পড়ে। মালপত্র নিয়ে এই লম্বা সিঁড়ি বেয়ে ওঠা ভারি অসুবিধে, তাছাড়া বিপজ্জনকও।

বেশ, পেনক্র্যাফট, তোমার কথা রাখতে পারি কি না চেষ্টা করে দেখা যাক। বললেন সাইরাস হার্ডিং।

কিন্তু আপনার তো কোনো মেশিন নেই।

বানিয়ে নেবো।

স্টীম মেশিন? শুধোল পেনক্র্যাফট : বাষ্প-চালিত?

না, একটি হাইড্রলিক লিফট বানাবো। তার জন্যে দরকার তীব্রস্রোত জলের।

আর, বলা বাহুল্য, এই যন্ত্র তৈরি করবার প্রধান উপাদানের কোনো অভাবই ছিল না। ছোট্ট ঝরনাটির তীব্র স্রোতধারা গ্র্যানাইট হাউসের অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত হত, তাকে কাজে লাগাবার পরিকল্পনা করেছেন হার্ডিং। যে-সংকীর্ণ ফাটল দিয়ে এই জলধারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে প্রথমে তাকে আরো চওড়া করা হল—এমনভাবে, যাতে তীব্রবেগে তার জলধারা প্রবাহিত হয়। ভিতরের কূপটি দিয়ে এই জল গিয়ে পড়তো সমুদ্রে। সেই নিম্নগামী জলধারার নিচে ক্যাপ্টেন প্যাডেল-সমেত একটি সিলিণ্ডার লাগালেন। শক্ত, লম্বা একটা তার দিয়ে সেই সিলিণ্ডারের সঙ্গে একটি চাকা যোগ করে দেয়া হল। এইভাবে একটি দড়ির সাহায্যে গ্র্যানাইট হাউসের নিচের ভূমি স্পর্শ করা

গেল। আর সেই দড়ির সঙ্গে একটি ঝুড়ি সংযুক্ত করে দেয়া হল এইভাবেই জলধারাকে কাজে লাগিয়ে ক্যাপ্টেন তাঁর হাইড্রলিক লিফট তৈরি করলেন।

সতেরোই মার্চ হাইড্রলিক লিফট প্রথম কাজ করল। সাফল্য দেখে সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো, এবার সিঁড়ির ব্যবস্থা বাতিল করে দেয়া হল। মালপত্র তো বটেই, এছাড়াও টপ এবং জাপ সেই লিফটের সাহায্যেই ওঠানামা করতে লাগলে।

এবার সাইরাস হার্ডিং কাচ বানানোর পরিকল্পনা করলেন। মৃৎপাত্র নির্মাণের জন্যে যে-চুল্লিটা প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবারে সেটি কাজে লাগল। কাচ তৈরি অবিশ্যি সহজ নয়। সম্মিলিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উপর্যুপরি বেশ কয়েকবার সেই কাজে ব্যর্থ হতে হল ওঁদের।

অবশেষে ক্যাপ্টেন হার্ডিং কাচের কারখানা তৈরি করতে সক্ষম হলে তুমুল হৈ-চৈ–এর সঙ্গে সবাই তাকে অভিনন্দন জানালে। কাচ বানাতে যে-সব উপকরণ লাগে, যেমন– বালি, খড়ি, সোড়া (কার্বনেট অথবা সালফেট-যে-কোনো একটি) কিছুরই অভাব ছিল দ্বীপে। এইভাবে অল্পদিনের মধ্যেই কারখানা তৈরি হয়ে গেল। কাচ তৈরির জন্যে যে-পাইপের প্রয়োজন লোহা দিয়ে একটি টিউব তৈরি করে সে অভাব পূরণ করা হল। জলের টিউবটা হল ছ-ফুট লম্বা—দেখতে অনেকটা বন্দুকের ব্যারেলের মতো। আটাশে মার্চ থেকে কাচ তৈরি শুরু হল। প্রথম-প্রথম বালি খড়ি আর সোডার সংমিশ্রণ উপযুক্ত পরিমাণে না-হওয়ায়, যে-কাচ তৈরি হল তা মোটেই স্বচ্ছ হল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই অবিশ্যি সেই ত্রুটি সংশোধন করে নিলেন হার্ডিং। তার পর থেকে স্ফটিকের মতো চকচকে, উজ্জ্বল স্বচ্ছ কাচ পেতে মোটেই অসুবিধে হল না। সেই কাচ দিয়ে প্রথমে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা তৈরি করা হল। তারপর তৈরি করা হল নানান ধরনের পাত্র।

প্রায় শ-খানেক বোতল, পাঁচ জন গেলাশও তৈরি হল। এইসব কাচের জিনিশের গড়ন মোটেই সুদৃশ্য হল না, কেমন তেড়াবেঁকা, দেখলেই হাসি পায়। এই কাজের ভার ছিল প্রধানত হার্বার্টের উপর। হার্বার্টকে উৎসাহ দেয়ার জন্যেই হার্ডিং সবাইকে এই নিয়ে হাসিহাসি করতে বারণ করে দিলেন। অবিশ্যি অন্যরা এমনিতেও হাসত না। কেননা, ছাঁচ ছাড়াই যে এভাবে কাজ চালাবার উপযোগী জিনিশপত্র তৈরি করা যাচ্ছে, এ তো আর কম প্রশংসার ব্যাপার নয়।

ইতিমধ্যে একদিন শিকার করতে বেরিয়ে হার্বার্ট আর হার্ডিং একটি মূল্যবান গাছ আবিষ্কার করলেন। গাছটি হল কাইকাস রিভল্যুতা। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্র বলে হার্বার্টই গাছটিকে চিনতে পেরেছিল। হার্বার্ট জানালে যে এই গাছের টিশু এক ধরনের ময়দার মতো পদার্থ পাওয়া যায়, খাদ্য হিশেবে যার আস্বাদ নিতান্ত ফ্যালনা নয়।

তার কথা শুনে হার্ডিং বললেন : সোজা কথায়, এটি তাহলে রুটি-গাছ?

হ্যাঁ, একে রুটি-গাছই বলা চলে। ব্রেডফ্রুট ট্রি।

এটি একটি মূল্যবান আবিষ্কার, বললেন হার্ডিং:যতদিন না আমরা আমাদের খেতের ফসল পাচ্ছি, ততদিন এই গাছ আমাদের আহার জোগাবে। কিন্তু তোমার গাছটা চিনতে ভুল হয়নি তো, হার্বার্ট?

না, হার্বার্টের ভুল হয়নি। হার্বার্ট গাছের একটা ডাল ভেঙে নিলে। এক ধরনের ময়দার মতো গুড়ো টিশু দিয়েই সেই ডাল গঠিত। প্রকৃতির আহার জোগানোর ক্ষমতা কত অসীম, এ-কথা চিন্তা করে হার্ডিং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। আশপাশে আরো-কয়েকটি

এই জাতের গাছ দেখা গেল। যে-জায়গায় তাঁরা গাছগুলো পেলেন, সে-জায়গার অবস্থান দ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে। গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে হার্ডিং এই মূল্যবান আবিষ্কারের কথা সবাইকে জানালেন। পরদিন সবাই মিলে সেই জায়গার উদ্দেশ্যে বেরুলেন। যখন তারা ফিরে এলেন, দেখা গেল তারা বিপুল পরিমাণে কাইকাসের ডাল সংগ্রহ করে এনেছেন। যদিও এটি অবিকল শাদা রঙের ময়দার মতো হল না, তবু দেখতে অনেকটা সেই রকমই হল।

কোর‍্যালের প্রাণীদের একটি বৃহৎ সংখ্যা রচনা করেছিল ওনাগা, ছাগল আর ভেড়া। তাদের দুধ এবার পেতে লাগলেন তারা। ওনাগার গাড়ির সাহায্যে কোর্যাল আর গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে সংযোগ রক্ষার বিশেষ অসুবিধে হত না।

যত দিন গেল, ততই উন্নতি হতে লাগল তাঁদের অবস্থার। খুঁতখুঁত করবার মতো কিছুই ছিল না তাদের। ক্রমে-ক্রমে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডই যেন তাদের স্বদেশ হয়ে উঠতে লাগল।

দ্বীপে প্রয়োজনীয় কোনোকিছুরই অভাব না-থাকায়, ক্রমশ এই দ্বীপকে ভালোবাসতে শুরু করলেন তাঁরা। কিন্তু তবু মাতৃভূমির মাটি টানে সকলের মন। মনের মণিকোঠায় উঁকিঝুঁকি মারে ক্ষীণ আশা। আহা! একবার যদি একটি জাহাজ যায় এই দ্বীপের পাশ দিয়ে! তখন হয়তো-বা সংকেতের সাহায্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে সেই জাহাজের।

সেদিন পয়লা এপ্রিল, রবিবার। দিনটা ছিল ঈস্টার ডে। হার্ডিং আর তার সঙ্গীরা সেদিন খানিকক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। আবহাওয়া ছিল প্রসন্ন। প্রার্থনার পরে সেই আবহাওয়ার মতোই শুচি হয়ে উঠল তাদের মন।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে সবাই প্রসপেক্ট হাইটের উপরে একটি বারান্দার মতো জায়গায় গা এলিয়ে বসলেন। খানিকক্ষণ সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অন্ধকার দিকচক্রবালের দিকে। তারপর দ্বীপের কথাই আলোচনা করতে লাগলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের এমন-এক নিরালা অঞ্চলে তাদের দ্বীপ অবস্থিত যে, কোনো জাহাজ তৈরি করে সমুদ্র পাড়ি দেয়া সহজসাধ্য নয়।

এমন সময় গিডিয়ন শিলেট প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা ক্যাপ্টেন হার্ডিং, সিন্দুকে সেক্সট্যান্ট পাওয়ার পর আপনি কি আর আমাদের দ্বীপের অবস্থান নিরূপণের চেষ্টা করেছেন?

না, উত্তর করলেন সাইরাস।

আপনি তো আগে নক্ষত্র দেখে, আর গাছের ছায়া ইত্যাদি দেখে দ্বীপের অবস্থান আন্দাজ করেছিলেন। সেক্সট্যান্ট ব্যবহার করলে সেই সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতো না কি?

কী দরকার খামকা? বললে পেনক্র্যাফট : দ্বীপটার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাংশ যা-ই হোক না কেন, দিব্যি আরামে-গরমে আছি তো।

এমনও তো হতে পারে, বললেন স্পিলেট, এই দ্বীপের কাছাকাছি কোনো লোকালয় আছে, অথচ আমরা জানি না।

বেশ। কালকেই আমরা দ্বীপের সঠিক অবস্থিতি জেনে নেবো, বললেন হার্ডিং : অন্যসব কাজে ব্যস্ত না-থাকলে আরো আগেই তা জানতে পারতুম।

আমার কিন্তু মনে হয়, বললে পেনক্র্যাফট, ক্যাপ্টেন আগে যা নিরূপণ করেছিলেন তাই ঠিক। যদি দ্বীপটি এর মধ্যে স্থানচ্যুত না-হয়ে থাকে, তবে ক্যাপ্টেনের হিশেবে কোনোই ভুল হয়নি।

সে দেখা যাবে কাল।

পরদিন দোসরা এপ্রিল সেক্সট্যান্টের সাহায্যে হার্ডিং সতর্ক হয়ে দ্বীপের অবস্থিতি নির্ধারণে রত হলেন। তার পর্যবেক্ষণের ফল থেকে জানা গেল যে, যন্ত্র ব্যতিরেকে তিনি যা নিরূপণ করেছিলেন, প্রায় সেইটেই দ্বীপের অবস্থিতি। তাঁর প্রথম পর্যবেক্ষণের ফল ছিল এইরকম :

পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা : ১৫০° থেকে ১৫৫°-র মধ্যে।

দক্ষিণ অক্ষাংশ : ৩০° থেকে ৩৫°-র মধ্যে।

এবারের পর্যবেক্ষণের ফলে সঠিক অবস্থান দাঁড়াল :

১৫০°৩ দ্রাঘিমারেখা এবং ৩৪°৫৭ দক্ষিণ অক্ষাংশ।

দেখা গেল, আগের বারে যন্ত্রপাতি না-থাকা সত্ত্বেও সাইরাস হার্ডিং হিশেবে খুব-বেশি। তফাৎ করেননি।

স্পিলেট বললেন, আমাদের তো একটি মানচিত্র আছে। প্রশান্ত মহাসাগরের ঠিক। কোনখানটায় আমাদের দ্বীপ, এবার তা দেখা যাক।

হাবার্ট তক্ষুনি মানচিত্র নিয়ে এল। প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র বের করা হল।

কম্পাসের সাহায্যে হার্ডিং লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থিতি নিরূপণ করে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন : আরে! প্রশান্ত মহাসাগরের এ-অঞ্চলে আগে থেকেই আরেকটা দ্বীপ আছে!

একটা দ্বীপ! চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : কী নাম?

টেবর আইল্যাণ্ড।

গুরুত্বপূর্ণ কোনো দ্বীপ?

না, জনমানবহীন একটা হারানো দ্বীপ এটি।

আমরা তবে টেবর আইল্যাণ্ডে যাবো, বললে পেনক্র্যাফট।

আমরা!

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। আমি একটা ডেক-সমেত নৌকো তৈরি করবার ভার নিচ্ছি। তার সাহায্যেই আমরা টেবর আইল্যাণ্ডে যাবো। আমাদের দ্বীপ থেকে কত দূরে ওই দ্বীপ?

উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে। উত্তর করলেন হার্ডিং।

দেড়শো মাইল? এত কাছে? বললে পেনক্র্যাফট : আবহাওয়া ভালো থাকলে, অনুকূল হাওয়া পেলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওই দ্বীপে পৌঁছুনো যাবে।

এ-কথা শুনে সবাই ঠিক করলেন যে, অক্টোবরের আগেই একটা পালের জাহাজ তৈরি করতে হবে। তারপর বের হওয়া যাবে সীমাহারা নীল সমুদ্রে, নতুন অ্যাডভেনচারের সন্ধানে।

.

২.৪ সন্দেহ তবু গেল না

পেনক্র্যাফটের মগজে যখন কোনো কাজের কথা ঢোকে, তখন সে-কাজ শেষ না হওয়া। অব্দি তার আর শান্তি নেই; অক্টোবর মাস এলেই টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে হবে, সুতরাং উপযুক্ত নৌকো তৈরি করবার জন্যে তার মন ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠল। অক্টোবরের অবিশ্যি এখনও ছ-মাস বাকি। এই সময়ের মধ্যে নৌকো তৈরি করতেই হবে। হার্ডিং এক-একজনের ওপর এক-একরকম কাজ ভাগ করে দিলেন। তিনি আর পেনক্র্যাফট নিলেন নৌকো তৈরির ভার; স্পিলেট আর হাবার্টের উপর পড়ল শিকার করে খাদ্যের ব্যবস্থা করবার ভার; আর ঠিক হল, নেব জাপকে নিয়ে রান্নাবান্না করবে।

উপযুক্ত গাছ বেছে নিয়ে সেই গাছ চিরে তা করা হল। চিমনি আর প্রসপেক্ট হাইটের মাঝখানে ডকইয়ার্ড বানিয়ে পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকোর কাঠামো তৈরি করা হল। তারপর শুরু হল হার্ডিং আর পেনক্র্যাফটের সকাল-সন্ধে পরিশ্রম।

এদিকে হার্বার্টকে নিয়ে স্পিলেট শিকারে বেরুতে লাগলেন প্রত্যহ।

তিরিশে এপ্রিল তারা পশ্চিম দিকে গহন বনে শিকার করতে গেলেন।স্পিলেট চললেন আগে-আগে, হাবার্ট পেছন-পেছন। একটু খোলামেলা জায়গায় এলে পর স্পিলেট ঝোঁপের মতে নিবিড় এক ধরনের গাছ দেখতে পেলেন। তার পাতার গন্ধ কী-রকম যেন কটু। আঙুরের মতো থোকা-থোকা ফুল ফুটে আছে। তার মধ্যে আবার ছোটো-ছোটো ফলও রয়েছে। ডালগুলো সোজা। পাতাগুলো একটু লম্বাটে ধরনের। একটা ডাল ভেঙে হার্বার্টকে দেখালেন স্পিলেট। শুধোলেন : হার্বার্ট, এটা কী গাছ?

গাছ দেখেই চিনতে পারলে হার্বার্ট। বললে : মিস্টার স্পিলেট, খুব মূল্যবান গাছ আবিষ্কার করেছেন আপনি! এর জন্যে পেনক্র্যাফট আপনার কাছে চিরজীবন কেনা হয়ে থাকবে।

স্পিলেট জিগেস করলেন, এটা কি তামাকের গাছ?

হ্যাঁ, বললে হার্বার্ট। যদিও খুব ভালো তামাক নয়, তবু এটা যে তামাকের গাছ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তাহলে তো পেনক্র্যাফটের জোর বরাত বলতে হবে, হাসলেন স্পিলেট। আনন্দে ও একেবারে দিশেহারা হয়ে যাবে!

হার্বার্টের মাথায় তক্ষুনি একটা মৎলব এলোমিস্টার স্পিলেট, বললে সে : এখন পেনক্র্যাফটকে এই সম্পর্কে কিছু বলা চলবে না। গোপনে তামাক তৈরি করে একেবারে পাইপে ভরে নিয়ে, ওকে উপহার দেয়া হবে।

স্পিলেট আর হার্বার্ট অনেক তামাকপাতা সংগ্রহ করে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন। পাতাগুলো গোপনে রাখা হল। তারপর চুপি-চুপি সাইরাস হার্ডিং আর নেবকে এর কথা জানিয়ে দেয়া হল। পাতাগুলো শুকিয়ে কেটে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তুলতে লাগল প্রায় মাস-দুয়েক। পেনক্র্যাফট এই সম্পর্কে একটি কথাও জানতে পারলে না। সে সবসময় নৌকোর কাজ নিয়েই থাকতো। গ্র্যানাইট হাউসে আসতো মাত্র একবার—আহার ও বিশ্রামের জন্যে।

ইতিমধ্যে, প্রকাণ্ড একটা জন্তু লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের চারদিকে প্রায় দু-মাইল দূরে সমুদ্রে সাঁৎরে বেড়াতে লাগল। দ্বীপবাসীরা জন্তুটাকে দেখে বুঝতে পারলেন যে সেটা একটা বিরাট তিমি।

পেনক্র্যাফট বললে, আহা! তিমিটা শিকার করতে পারলে চমৎকার হত? এই বলে আপশোশ করতে-করতে সে তার কাজে চলে গেল।

এদিকে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। দেখা গেল, তিমিটা যেন কিছুতেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে যেতে চাইছে না। পেনক্র্যাফট তো একেবারে অস্থির! তিমিটাকে মারতেই হবে! কী কাজের সময়, কী বিশ্রামের সময়—সবসময়েই যেন তিমিটা তার চোখের সামনে ভেসে। বেড়াতে লাগল। অবশেষে তেসরা মে দ্বীপবাসীদের পক্ষে যা আশার অতীত ছিল, আপনা

থেকেই তা ঘটে গেল। নেব রান্নাঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল, আরে! কী আশ্চর্য! তিমিটা সমুদ্রতীরে আটকা পড়ে গেছে।

গিডিয়ন স্পিলেট আর হার্বার্ট তখন শিকারে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে তারা ছুটলেন সমুদ্রের দিকে! হার্ডিং আর নেবুও তাঁদের অনুসরণ করলেন। বলা বাহুল্য, পেনক্র্যাফ্টও ছুট লাগালে সেই দৃশ্য দেখতে।

গ্র্যানাইট হাউস থেকে তিন মাইল দূরে ফ্লোটসামী পয়েন্ট, সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল মাল-সমেত সিন্দুক। দেখা গেল জোয়ারের সময় সেখানে এসেই আটকা পড়েছে তিমিটা। উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সবাই বল্লম, কুড়ল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছুটলেন। মার্সি নদীর উপরকার সেতুটি পেরিয়ে সমুদ্রতীরে তিমিটার কাছে পৌঁছুতে প্রায় বিশ মিনিট সময় লাগল। দূর থেকে দেখতে পাওয়া গেল, বিশালকায় তিমিটার দেহের উপরে অগুনতি পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে। তিমিটা পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে, একটুও নড়াচড়া নেই। আরো কাছে গিয়ে দেখা গেল, সেটা মরে পড়ে আছে। তার বাঁ-পাশে পাঁজরের মধ্যে একটা হারপুন বিধে আছে।

স্পিলেট বললেন, তাহলে দেখছি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছেই তিমি-শিকারী কেউ রয়েছে!

তা না-ও হতে পারে— বললে পেনক্র্যাফট-অনেক সময় দেখা গেছে পাঁজরে হারপুন নিয়ে তিমি হাজার-হাজার মাইল চলে যায়। এই তিমিটা হয়তো অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে আহত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে চলে এসেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এই বলে পেনক্র্যাফট হারপুনটা টেনে বার করল। দেখা গেল সেটার বাঁটের মধ্যে লেখা রয়েছে :

মারিয়া স্তেলা,
ভিনিয়ার্ড।

ভিনিয়ার্ড হল নিউ-ইয়র্কের একটা বন্দর, সেখানেই পেনক্র্যাফটের জন্ম হয়েছিল। মারিয়া স্তেলা জাহাজটি সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় তিমি-শিকারের জন্যেই।মারিয়া স্তেলার কথাও পেনক্র্যাফট জানতো। সে হারপুন মাথার উপর ঘোরাতে-ঘোরাতে মনের আবেগে বারবার বলতে লাগল : মারিয়া স্তেলা আমি চিনতুম। পয়লা শ্রেণীর জাহাজ! হবে না-ই বা কেন? ভিনিয়ার্ডের জাহাজ তো!

তিমিটা পচতে শুরু করার আগেই তার শরীর থেকে দরকার-মতো মাংস আর হাড় বের করে নিতে হবে। পেনক্র্যাফট আগে একবার একটা তিমি-ধরা জাহাজে কাজ করেছিল। তিমির চর্বিটারই সবচেয়ে বেশি দরকার। সেজন্যে পেনক্র্যাফট বেছে-বেছে শুধু চর্বিটুকুই কেটে নিলে। যে-সব হাড় ভবিষ্যতে কাজে লাগবে, সেগুলোও কেটে বার করা হল।

বহুদিনের খাদ্যের সন্ধান পেয়ে ইতিমধ্যেই অনতি পাখি এসে ভিড় করেছিল। সহজে তারা তিমিটাকে ছেড়ে যেতে চায়নি। শেষটায় বন্দুক ছুঁড়ে তাদের তাড়ানো হল। দ্বীপবাসীরা অবিশ্যি কাজের অংশটুকু কেটে নিয়ে তিমির বাকি শরীরটুক পাখিদের ছেড়ে দিলেন।

এরপর ফের নবোদ্যমে নৌকোর কাজ শুরু হল। শ্রান্তিহীন পেনক্র্যাফ্ট আশ্চর্য পরিশ্রম করতে লাগল দিনরাত। সবাই মিলে ঠিক করলেন, পেনক্র্যাফটকে এত পরিশ্রমের

পুরস্কার দিতে হবে। দিন ঠিক হল একত্রিশে মে। সেদিন পেনক্র্যাফটকে সেই পুরস্কার দিয়ে দস্তুরমতো তাক লাগিয়ে দেয়া হবে।

সেদিন রাত্রিবেলা খাওয়ার পর পেনক্র্যাফট যখন টেবিল ছেড়ে উঠতে যাবে, তখন গিডিয়ন স্পিলেট তাকে বাধা দিলেন। বললেন : আর-একটু জিরিয়ে নাও হে—এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে হবে না। এখনও একটা জিনিশ বাকি আছে।

না, মিস্টার স্পিলেট–বললে পেনক্র্যাফট, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আমি এখন আমার কাজে যাবো।

বেশ, তাহলে অন্তত এককাপ কফি খেয়ে যাও।

না-না-আর-কিছুরই দরকার নেই।

আহা! বললেন স্পিলেট : তাহলে একটু তামাকই খেয়ে যাও না-হয়!

তামাক! পেনক্র্যাফট একেবারে লাফিয়ে উঠল।

সঙ্গে-সঙ্গে স্পিলেট তামাক-ভরা পাইপটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, আর হার্বার্ট একটুকরো জ্বলন্ত কয়লা হাতে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো। কী-যেন বলতে চেষ্টা করলে পেনক্র্যাফট, কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না। হাত বাড়িয়ে পাইপটা নিয়ে মুখে দিলে সে। তারপর পাইপে আগুন ধরিয়ে চোখ বুজে কেবল টানের পর টান!

তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে পূর্ণ তৃপ্তির স্বরে বলে উঠল : তামাক! একেবারে সত্যি-সত্যি তামাক! এ-যে আশাতীত!

একটু বাদে সে আবার প্রশ্ন করলে : তা, এ-আবিষ্কারটা কার? হার্বার্টের বুঝি?

না, পেনক্র্যাফট!—বললে হার্বার্ট : এটি মিস্টার স্পিলেটেরই আষ্কিার।

মিস্টার স্পিলেট! এই কথা বলেই পেনক্র্যাফট স্পিলেটকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরলে যে স্পিলেটের একেবারে দম বন্ধ হয়-হয়।

কোনোমতে পেনক্র্যাফটের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি বললেন : ধন্যবাদ সকলকেই দাও তুমি। হার্বার্ট গাছটাকে চিনতে পেরেছিল, হার্ডিং তামাক তৈরি করেছিলেন, আর এমন-একটা কথা চেপে রাখতে নেবেরও কম কষ্ট হয়নি!

জুন মাসের গোড়া থেকেই বেশ শীত পড়ল। এবার সকলের প্রধান কাজ হল শীতের পোশাক তৈরি করা। কোর‍্যালে যতগুলো মুসমন ছিল সবগুলোরই লোম কেটে ফেলা হল–এই লোম দিয়ে গরম কাপড় তৈরি করতে হবে। কাজটা খুব সোজা নয়। সুতো কাটবার কল নেই, কাপড় বোনবার কল নেই—এককথায়, কোনো সরঞ্জামই নেই। উপায় ঠিক করলেন সাইরাস হার্ডিং। প্রথমে লোমগুলোকে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়া হল। তারপর আবার সোডার জলে ধুয়ে নেয়া হল। এখন ওগুলোকে চেপে পাৎলা চাদরের মতো করে নিতে পারলে ফেল্টের মতন একটা জিনিশ প্রস্তুত হবে। দ্বীপবাসীদের কাপড় হিশেবে এই হালকা ফেল্টের চাদরই ঢের। খুব বড়ো-বড়ো কাঠের ডিশ বানিয়ে তাতে সাবান-মাখানো পশম রাখা হল। তারপর কাঠের মুগুর দিয়ে সজোরে

একনাগাড়ে চাপ দিতে-দিতে সমস্ত পশমকে জমাট বাঁধিয়ে বেশ পাৎলা ফেল্টের মতো তৈরি করে নেয়া হল। এই ফেল্টের চাদর দিয়ে কোট-প্যান্ট হল। এবার আর ভাবনা কীসের? এখন শীত এলেও কোনো পরোয়া নেই।

পরোয়া নেই বলাতেই বোধহয় বিশে জুন থেকে ভয়ানক শীত পড়ল। বাইরে কাজ করা একেবারে অসম্ভব হয়ে উঠল। কাজেই বাধ্য হয়ে পেনক্র্যাফটকে নৌকোর কাজ স্থগিত রাখতে হল। পেনক্র্যাফটের খুব ইচ্ছে, নৌকো তৈরি হলেই টেবর আইল্যাণ্ডের উদ্দেশে সমুদ্রে পাড়ি জমানো।

লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে টেবর আইল্যাণ্ড দেড়শো মাইল দূরে। শুধু-শুধু দ্বীপ দেখতে যাওয়ার জন্যে সমুদ্রপথে একটা নৌকোয় চড়ে যাওয়াটা সাইরাসের পছন্দ হল না। নৌকো যদি মাঝপথে কোনো ঝড়ের পাল্লায় পড়ে, তবে আর বাঁচোয়া নেই। তবু পেনক্র্যাফটের জেদ, টেবর আইল্যাণ্ডে যাবেই। হার্ডিং ওকে বোঝালেন, কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। বরং বললে : আমি তো আর লিঙ্কন আইল্যাণ্ড ছেড়ে একেবারে চলে যেতে চাইছি।, একবার টেবর আইল্যাণ্ড দেখেই চলে আসবো।

হার্ডিং বললেন : দেখবার আর কী আছে? টেবর আইল্যাণ্ড নিঃসন্দেহে লিঙ্কন আইল্যান্ডের চেয়ে ভালো নয়।

সে আমি জানি, একগুয়ের মতো ঘাড় নাড়লে পেনক্র্যাফট : তবু একবার দেখে আসবো। আপনি ভাববেন না। ভালো আবহাওয়া দেখে রওনা হলেই তো ঝড়বৃষ্টির ভয় থাকবে না। আমি শুধু হার্বার্টকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, আপনি এতে আর কোনো আপত্তি করবেন

না। আমার ভরসা আছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কোনো বিপদেই পড়বো না। নৌকোটা শেষ হলে একবার যখন সেইটেতে চড়ে দেখবেন কেমন মজবুত, তখন আর আপনার কোনো ভাবনা থাকবে না।

জুন মাসের শেষে বরফ পড়তে শুরু হল। কোর‍্যালে অনেক জন্তু ছিল, সুতরাং সেখানে খাবার-দাবারের নিয়মিত জোগান দেয়া দরকার। তাই ঠিক হল সপ্তাহে একদিন কোর‍্যালে গিয়ে খবর নিয়ে আসতে হবে। অবিশ্যি কোর‍্যালে জন্তুদের খাদ্যের পরিমাণ যথেষ্ট রাখা হয়েছিল, তবু সবাই সতর্কতার জন্যে এই ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

এদিকে গিডিয়ন স্পিলেট ভাবছিলেন তাঁদের লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের খবরটা কোনোরকমে কোনো মহাদেশে পৌঁছে দেয়া যায় কি না। দুটি উপায় অবিশ্যি আছে। এক হলকাগজে সমস্ত ঘটনা লিখে সেই কাগজটুকু বোতলে বন্ধ করে তাতে এমনভাবে ছিপি এঁটে দেয়া, বো‍েতলের মধ্যে যাতে একফোঁটাও জল না-ঢোকে। সেই বোতল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলে, সেটা হয়তো একদিন কোনো দেশে গিয়ে লাগতে পারে। আর দু-নম্বর হল, চিঠি লিখে পায়রার গলায় বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দেয়া। কিন্তু পায়রাই হোক আর বোতলই হোক–বারোশো মাইল বিস্তৃত সমুদ্র পেরিয়ে যাওয়া কোনোটার পক্ষেই সম্ভব নয়। এমনধারা কথা ভাবাও বাতুলতা। কিন্তু এই কল্পনা-বিলাসের সাফল্যের একটা সুযোগ হঠাৎ একদিন এসে হাজির হল।

বিশে জুন হার্বার্ট একটা আলবাট্রস পাখিকে গুলি করেছিল। গুলিটা লেগেছিল পাখিটার পায়ে সবাই মিলে অনেক চেষ্টার পর পাখিটাকে পাকড়াও করলেন। অ্যালবাট্রস

হাঁসজাতীয় পাখি। রঙ শাদা ধবধবে। পাখা মেললে দশ ফুট লম্বা হয়। এর মতো ওড়বার শক্তি অন্যকোনো পাখির নেই।

স্পিলেট সব ঘটনা লিখে ফেললেন। সেই কাগজটা ব্যাগের মধ্যে পুরে ব্যাগটা অ্যালবাট্রসের গলায় বেঁধে দেয়া হল। এই লেখার সঙ্গে একটা আবেদনও ছিল। তাতে ছিল : এই ব্যাগটা কারু হাতে পড়লে অনুগ্রহ করে নিউইয়র্ক হেরাল্ড কাগজের আপিশে পাঠিয়ে দেবেন। এরপর পাখিটাকে ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার পাখা ঝটপট করে উঠল, তারপর গলায় ব্যাগটি নিয়ে সে দেখতে-দেখতে সমুদ্রের উপর দিয়ে সীমাহারা নীল আকাশে মিলিয়ে গেল।

শীত শুরু হতেই সবাই গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে থেকে ঘরোয়া কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নৌকোর জন্যে একটা পাল তৈরি করতে হবে। বেলুনের আবরণের কল্যাণে কাপড়ের কোনো অভাব নেই। পেনক্র্যাফট উঠে-পড়ে লাগল পাল তৈরির কাজে।

জুলাই মাসে ভয়ানক শীত পড়ল। খাবার-ঘরেও আরেকটা চুল্লির ব্যবস্থা করা হল। খাওয়াদাওয়ার পর এই চুল্লির ধারে বসে সবাই যে যার কাজ করেন, পড়াশোনা করেন, কখনোবা গল্প-গুজব করেন। একদিন সবাই চুল্লির ধারে বসে কাজ করছিলেন, এমন সময় টপ হঠাৎ ভীষণভাবে ডেকে উঠল। শুধু ডাকা নয়, সেইসঙ্গে কুয়োটার মুখের চারপাশে ছুটোছুটি করতে লাগল। এই সময় জাপও গরু-গর করতে লাগল। ঠিক রাগের গর্জন নয়-টপ আর জাপ যেন কোনো কারণে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছে।

স্পিলেট বললেন : কুয়োটার যোগ আছে সমুদ্রের সঙ্গে। বোধহয় কোনো সমুদ্রের কন্তু কুয়োর তলায় জিরোতে আসে।

পেনক্র্যাফট ধমক দিয়ে জাপ আর টপকে চুপ করালে! ধমক খেয়ে জাপ তার ঘরে চলে গেল। টপ চুপ করলে বটে, কিন্তু সেই ঘরেই রইল, আর মধ্যে মধ্যে গোঁ-গোঁ করে শব্দও করতে লাগল। এই সম্পর্কে আর-কোনো আলোচনা হল না। কিন্তু এই ঘটনায় কেন যেন সাইরাস হার্ডিং খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গোটা জুলাই মাস ধরেই একটানা তুষার-ঝড় চলল। শীত গত বছরের মতো তেমন নাহলেও, তুষারঝড়ের তীব্রতা এবার হল বেশিরকম। এই ঝড়ের সময় বাইরে বেরুনো বিপজ্জনক। চারদিকেই গাছ-গাছালি ভেঙে পড়তে থাকে। এই দুর্যোগের মধ্যেও সপ্তাহে একদিন করে কোর‍্যালের খবর নেয়া বাদ পড়ত না। মাউন্ট ফ্রাঙ্কলিনের আড়ালে থাকার দরুন ঝড়ে কোর‍্যালের কোনো ক্ষতি হয়নি বটে, কিন্তু ওঁরা প্রসপেক্ট হাইটের উপরে যে পাখির বাসা তৈরি করেছিলেন, তার খুব ক্ষতি হয়েছিল।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আকাশ অনেকটা শান্ত হল বটে, কিন্তু হিম পড়ল বেশি। তেসরা আগস্ট স্পিলেট, পেনক্র্যাফট, হার্বার্ট আর নেব একদিন শিকারে বেরুলেন। ট্যাড়ন মার্শ-এ বিস্তর বুনো হাঁস, স্নাইপ, টীল প্রভৃতি পাখি চরে বেড়ায়। সবাই ট্যাডর্ন মার্শ-এর দিকে রওনা হল। সাইরাস হার্ডিং তাদের সঙ্গে গেলেন না; বললেন : গ্র্যানাইট হাউসে বসে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে, তোমরা যাও।

সবাই পোর্ট বেলুনের পথে রওনা হলেন। সেই পথেই জলাভূমিতে যেতে হয়। যাওয়ার আগে তারা জানিয়ে গেলেন যে সন্ধের আগেই তারা গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে আসবেন। টপ আর জাপও তাঁদের সঙ্গে গেল। সবাই মার্সি নদীর সেতুটা পেরিয়ে গেলে হার্ডিং গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন। তার মনে একটা উদ্দেশ্য ছিল, সেজন্যেই তিনি শিকারে যাননি। তার উদ্দেশ্য ছিল, গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োটা খুব ভালো করে পরীক্ষা করা। টপ কেন কুয়োর মুখের চারদিকে ডেকে ডেকে ছুটে বেড়ায়? আর যখনই এ-রকম করে, তখনই কেন অমন অস্থির হয়ে ওঠে? সেদিন জাপও কেন টপের মতো অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল? সমুদ্র ছাড়া অন্যকিছুর সঙ্গে কি কুয়োটার যোগ আছে? দ্বীপের দিকেও কি এর কোনো পথ গিয়েছে?-এইসব প্রশ্নের উত্তর বের করবার জন্যেই হার্ডিং ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক করেছিলেন যে অন্যদের অনুপস্থিতিতে একলা এ-কাজটা করবেন। এবার সেই সুযোগ এসেছে। লিফট তৈরি হবার পর থেকে দড়ির সিঁড়িটা ব্যবহার হত না। এই সিঁড়ির সাহায্যে কুয়োর নিচে নামা খুব সহজ। এর একটা মাথা শক্ত করে বেঁধে হার্ডিং গোটা সিঁড়িটা কুয়োর মধ্যে ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর রিভলভার আর ছুরি কোমরবন্ধের মধ্যে খুঁজে লণ্ঠন হাতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন।

কুয়োর ধারটা অসমান নয়, তবে মধ্যে-মধ্যে ছুঁচলো পাথর যেন মাথা বাড়িয়ে আছে। এইসব পাথরের সাহায্যে কোনো চটপটে জর পক্ষে কুয়োটার মুখ পর্যন্ত উঠে আসা বিচিত্র নয়। কিন্তু হার্ডিং এমন-কোনো চিহ্ন দেখতে পেলেন না যা থেকে মনে হতে পারে যে সম্প্রতি কোনো জন্তু এই পাথরের সাহায্যে উপরে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

আরো নিচে নামলেন হার্ডিং। কিন্তু তবু সন্দেহজনক কিছুই তার নজরে পড়ল না।

সিঁড়ির শেষ ধাপ পর্যন্ত নামবার পর জল দেখা গেল। নিষ্কম্প, স্থির জল। হার্ডিং কুয়োর দেয়াল ঠুকে দেখলেন। একবারে নিরেট গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল। না, এর মধ্যে দিয়ে কোনো পথ নেই।

অনুসন্ধান শেষ করে সাইরাস হার্ডিং উপরে উঠে এলেন। তারপর সিঁড়িটা তুলে নিয়ে কুয়োর মুখ বন্ধ করে দিলেন। এরপর খাবার-ঘরে বসে ভাবতে লাগলেন।

কিছুই তো দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহলেও কিছু-একটা কুয়োর মধ্যে আছেই। অত মধ্যে-মধ্যে যে এসে থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। অনুসন্ধানের। ফলে সন্দেহজনক কিছুই দেখতে পাওয়া না-গেলেও, সন্দেহ গেল না হার্ডিং-এর।

ভাসমান লিপি

২.৫ ভাসমান লিপি

সন্ধের আগেই রাশি-রাশি শিকার নিয়ে ফিরল হার্বার্টরা। সবার কাঁধেই শিকারের বোঝা; টপের গলায় টীল পাখির মালা, জাপেরও সারা গায়ে স্নাইপ পাখির পালক ঝোলানো।

সাইরাস হার্ডিং তাঁর অনুসন্ধানের কথা গোপনে স্পিলেটকে বললেন। সব শুনে স্পিলেট বললেন : খুঁজে কিছু দেখতে না-পেলেও কোনো জন্তু নিশ্চয়ই কুয়োর মধ্যে থাকে কিংবা মাঝে-মাঝে সেখানে আসে। দেখা যাক, ভবিষ্যতে তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

নেব স্পিলেটের সাহায্যে শিকারগুলির ব্যবস্থায় মন দিল। প্রচুর পরিমাণ শিকার। এত ঠাণ্ডায় নষ্ট হয়ে যাওয়ারও কোনো ভয় নেই। রাশি-রাশি পাখি ও জন্তুর মাংস ভবিষ্যতের জন্যে নুন মাখিয়ে জারিয়ে রেখে দেয়া হল।

পেনক্র্যাফট হার্বার্টকে নিয়ে ফের নৌকোর কাজে মন দিলে। বেলুনের কাপড় দিয়ে নৌকোর জন্যে সুন্দর একটা পাল তৈরি হল। নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম সবকিছুই নৌকো শেষ হওয়ার আগেই প্রস্তুত হল। নৌকোর মাস্তুলে টাঙিয়ে দেয়ার জন্যে একটা নিশানও প্রস্তুত করলে পেনক্র্যাফট। বলা বাহুল্য নিশানটি হল মার্কিন মুলুকের জাতীয় নিশান। আমেরিকার জাতীয় নিশানে সাঁইত্রিশটা নক্ষত্র থাকে, এই নিশানে আটত্রিশটা নক্ষত্র এঁকে দেয়া হল। এই অতিরিক্ত নক্ষত্রটা হল লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের নামে। নৌকো তখনও

শেষ হয়নি, তাই নিশানটিকে গ্র্যানাইট হাউসের জানালায় টাঙানো হল। সবাই তিনবার জয়ধ্বনি করে নিশানটিকে অভিবাদন জানালেন।

শীত প্রায় শেষ হয়ে এলো। সেপ্টেম্বরের শেষে শীত একেবারে চলে গেল।

পেনক্র্যাফটও দ্বিগুণ উৎসাহে মন দিলে নৌকোয় কাজে। তার উপরেই নৌকোর সব কাজের ভার। শুধু নৌকো নয়, নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম—মাস্তুল, হাল, ডেক, ক্যাবিন — সবই হল পেনক্র্যাফটের পছন্দমতো। নৌকোর কাজে লোহার জিনিশ যা-কিছু লাগল, সবই চিমনির কারখানায় প্রস্তুত। এইভাবে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নৌকোটি শেষ হল : এবার চড়ে দেখলেই হয়।

দশই অক্টোবর নৌকোটি জলে ভাসানো হল। পেনক্র্যাফটের তখন আনন্দ দ্যাখে কে! সে হৈ-চৈ করে রীতিমতো একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে বসল। এমন সুন্দর নৌকো হয়েছে দেখে সবাই খুশি হয়ে উঠলেন। এবার নৌকোর একটা নাম দেয়া চাই। ঠিক হল নৌকোর নাম দেয়া হবে বোনাভেনতুর, অর্থাৎ বন-অ্যাডভেনচার। সকালবেলা প্রাতরাশ সেরেই নৌকো চালিয়ে পরখ করে দেখা হবে বলে ঠিক হল। সঙ্গে খাবার-দাবার নেবারও ব্যবস্থা করা হল। ফিরতে দেরিও হতে পারে তো।

সাড়ে-দশটার সময় সবাই নৌকোয় চড়লেন। বলা বাহুল্য, টপ আর জাপও বাদ গেল। পাল তুলে দেয়া হল। মাস্তুলের আগায় পৎ-পৎ করে উড়তে লাগল নিশানটি। পেনক্র্যাফটকে কাপ্তেন করে বন-অ্যাডভেনচার নীল সমুদ্রে অ্যাডভেনচারে বেরিয়ে পড়ল।

www.bengaliebook.com

দেখতে-দেখতে এই নতুন নৌকো পোর্ট বেলুন পেরিয়ে আরো তিন-চার মাইল চলে আসার পর নৌকোর ডেক থেকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের দৃশ্যটি দেখালো আশ্চর্য সুন্দর।

চারদিকের দৃশ্য দেখে সবাই রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে গেলেন। পেনক্র্যাফট বললে : নৌকো কেমন লাগছে, ক্যাপ্টেন? খুশি হয়েছেন তো?

একটু হাসলেন হার্ডিং : বেশ ভালোই চলছে বলে তো মনে হচ্ছে।

এখন কি আপনার মনে হয়, বললে পেনক্র্যাফট, যে এতে চড়ে নির্ভয়ে দূরে যাওয়া যায়?

দূরে আবার যাবে কোথায়?

কেন? বললে পেনক্র্যাফট, টেবর আইল্যাণ্ডে!

হার্ডিং বললেন : দ্যাখো পেনক্র্যাফট, খুব দরকারে পড়লে বন-অ্যাডভেনচারে চড়ে টেবর আইল্যাণ্ডের চেয়ে দূরে যেতেও আমার কোনো আপত্তি হবে না। কিন্তু কোনো দরকার নেই, অথচ খামকা-খামকা টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়াটা আমার ভালো মনে হয় না। এ ছাড়া তুমি তো আর একা টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে পারো না?

একজন মাত্র সঙ্গী পেলেই হয়।

তবেই তো! বললেন সাইরাস হার্ডিং: লিঙ্কন আইল্যান্ডের মোট পাঁচজন লোকের মধ্যে দু-জনের জীবনই খামকা বিপন্ন হবে।

কিন্তু এতে বিপদের তো কোনোই সম্ভাবনা নেই, ক্যাপ্টেন।

হার্ডিং কোনো জবাব দিলেন না। পেনক্র্যাফ্টও মনে-মনে একটু বিরক্ত হয়ে চুপ করে গেল। সে ভাবলে, এখন আর ঘাঁটাঘাঁটি না-করে পরে এ-সম্পর্কে আরো আলোচনা করা যাবে। এই ভেবে সে চুপ করে রইল। টেবর আইল্যান্ডে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে উপস্থিত হতে পারে, তা সে তখন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

একটু পরেই বন-অ্যাডভেনচার ফিরে তীরের দিকে চলল। লক্ষ্য তার পোর্ট বেলুন। পোর্ট বেলুনের কাছেই চ্যানেলের মধ্যে নৌকোটা রাখতে হবে, সুতরাং এই চ্যানেলগুলো ভালো করে দেখা দরকার। নৌকো তখন তীর থেকে আধ মাইল দূরে, হার্বার্ট দাঁড়িয়েদাঁড়িয়ে পথ বলে দিচ্ছে, এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : পেনক্র্যাফট, ওই দ্যাখো, একটা বোতল জলে ভেসে আসছে! এই বলেই উপুড় হয়ে জলে হাত ডুবিয়ে দিলে সে। একটু পরেই দেখা গেল, তার হাতে একটা ছিপি-আঁটা বোতল।

সাইরাস হার্ডিং হার্বার্টের হাত থেকে বোতলটা নিলেন। ছিপিটা খুলে ফেললেন। তারপর বোতলের ভিতর থেকে বার করলেন একটুকরো কাগজ। তাতে লেখা : একজন নির্বাসিত ভাগ্যহত ব্যক্তি ...টেবর আইল্যাণ্ড...১৫৩° পশ্চিম-দ্রাঘিমা এবং ৩১°১১ দক্ষিণ-অক্ষাংশ।

.

২.৬ অ্যাডভেনচারের ডাকে

সাইরাস হার্ডিং লেখাটুকু পড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যস্ত হয়ে উঠল পেনক্র্যাফট। বললে : টেবর আইল্যাণ্ডে নির্বাসিত ব্যক্তি! লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে মোটে দুশো মাইলের মধ্যে একজন লোক রয়েছে! ক্যাপ্টেন হার্ডিং, এখন নিশ্চয়ই টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়া সম্পর্কে আপনি আর আপত্তি করবেন না?

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : না, পেনক্র্যাফট। এখন যত শিগগির সম্ভব তোমাকে টেবর আইল্যাণ্ডে যেতে হবে। তুমি কালকেই রওনা হয়ে পড়ো।

তারপর সেই কাগজের টুকরোটুকু আবার পড়ে হার্ডিং বললেন : এই লেখাটুকু পড়ে মনে হচ্ছে টেবর আইল্যাণ্ডের লোকটির নৌ-বিদ্যা সম্পর্কে বেশ জ্ঞান আছে। দ্বীপটা সমুদ্রের কোনখানে, ঠিকভাবে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে। আর, লোকটি হয় ইংরেজ, নয়তো আমেরিকান। নইলে ইংরেজিতে চিঠি লিখত না।

এদিকে পেনক্র্যাফট নৌকো ঘুরিয়ে ক্ল অন্তরীপের দিকে নিয়ে চলল। সবার মনেই এবার টেবর আইল্যাণ্ডের লোকটির কথা তোলপাড় করছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে লোকটি বেঁচে থাকতে থাকতেই সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়। ক্ল অন্তরীপে ঘুরে বেলা বারোটার সময় বন-অ্যাডভেনচার মার্সি নদীর মুখে এসে নোঙর ফেলল।

সেদিন সন্ধের আগেই যাত্রার সমস্ত আয়োজন ঠিক হয়ে গেল। পরদিন এগারোই। অক্টোবর রওনা হলে অনুকূল হাওয়ার সাহায্যে টেবর আইল্যাণ্ডে পৌঁছুতে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি লাগবে না। দ্বীপে একদিন থাকতে হবে, ফিরে আসতে আরো তিন-চার

দিন; তাহলে সতেরোই নাগাদ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে ফিরে আসা যাবে। হার্ডিং আর স্পিলেট নেবকে নিয়ে ততদিন গ্র্যানাইট হাউসে কাটাবেন।

এই ব্যবস্থায় কিন্তু স্পিলেট তুমুল আপত্তি করলেন। বললেন : আমি নিউইয়র্ক হেরাল্ডের নিজস্ব প্রতিনিধি। এমন খাশা সুযোগটা কি আমি ছাড়তে পারি? আমিও পেনক্র্যাফটের সঙ্গে যাবো। যদি দরকার হয়, তবে সাঁৎরে যেতে হলেও যাবো।

এ-কথার আর কী উত্তর দেয়া যায়! বাধ্য হয়ে হার্ডিং স্পিলেটকেও যেতে দিলেন।

পরদিন ভোরবেলা বন-অ্যাডভেনচার তিনজন যাত্রী নিয়ে টেবর আইল্যাণ্ড অভিমুখে চলল।

প্রায় সিকি মাইল যাওয়ার পর যাত্রীরা ফিরে তাকিয়ে দেখলে, গ্র্যানাইট হাউসের পাহাড়ে দাঁড়িয়ে হার্ডিং আর নেব টুপি ও রুমাল উড়িয়ে তখনও শুভযাত্রা জানাচ্ছেন। পেনক্র্যাফট, হার্বার্ট আর শিলেট রুমাল উড়িয়ে তার উত্তর দিতে লাগলো। তারপর দেখতে-দেখতে ক্ল অন্তরীপের উঁচু পাহাড়ের আড়ালে গ্র্যানাইট হাউস অদৃশ্য হয়ে গেল। দিনের গোড়ার দিকে অনেক দূর থেকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দেখা যাচ্ছিল যেন সবুজ রঙের একটা ঝুড়ি, আর তার মধ্যিখানে মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন। বিকেলের দিকে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের আর-কোনো চিহ্নই দেখা গেল না।

প্রসন্ন মৃদু হাওয়ায় ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে-নাচতে বন-অ্যাডভেনচার চলল।

পেনক্র্যাফটের মনে তো আনন্দ আর ধরে না! কখনো-বা হালের ভার হার্বার্টকে দিয়ে সে স্পিলেটের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। এমনি করে সারাদিন কেটে গেল, তারপর নেমে এল অন্ধকার রাত্রি। রাত্রি অন্ধকার হলেও আকাশ বেশ পরিষ্কার-অগুনতি তারার আলোয় কম্পাসের সাহায্যে অবিরাম এগিয়ে চলল বন-অ্যাডভেনচার।

নিরাপদেই রাতটা কেটে গেল। পরের দিনটাও ভালোয়-ভালোয় কাটল। হিশেব করে দেখা গেল, ততক্ষণে বন-অ্যাডভেনচার লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে প্রায় একশো মাইল পথ এসেছে। হিশেব ঠিক হয়ে থাকলে আর বন-অ্যাডভেনচার ঠিক পথে এসে থাকলে, পরদিন ভোরবেলা টেবর আইল্যা নজরে পড়ার কথা। সে-রাত্রে আর কারু ঘুম এলো না। দারুণ উদ্বেগে কাটল রাত ভোরবেলা টেবর আইল্যাণ্ড দেখা যাবে কি? পরিত্যক্ত লোকটি কি এখনও দ্বীপেই আছে? এক কারাগার ছেড়ে অন্য কারাগারে যেতে কি সে রাজি হবে? এইসব ভাবনা তোলপাড় করতে লাগল মনে, তাই রাত্রি কাটল অতন্দ্র।

ভোরবেলা ছ-টার সময় পেনক্র্যাফট চেঁচিয়ে উঠল : ঐ-যে ডাঙা! ঐ দূরে তার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে!

পেনক্র্যাফটের মতন অভিজ্ঞ নাবিকের পক্ষে ভুল হওয়া অসম্ভব। ডাঙার দেখা পেয়ে তাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। আর ঘণ্টা-কয়েক বাদেই টেবর আইল্যাণ্ডে নামা যাবে। আস্তে আস্তে সত্যিই টেবর আইল্যাণ্ডের তীররেখা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আর মাইল-পনেরো দূরেই দ্বীপ। সামনের দিকে এগিয়ে চলল নৌকো।

বেলা এগারোটার সময় বন-অ্যাডভেনচার দ্বীপ থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে এসে পৌঁছুল। পেনক্রাফট এবার খুব সতর্ক হয়ে আস্তে-আস্তে অগ্রসর হতে লাগল। অজানা পথ জলের নিচে হঠাৎ কোনো কিছুতে ঘা খেয়ে নৌকোর বিপদ হতে পারে তো। ছোটো দ্বীপটা আস্তে আস্তে চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল। দ্বীপের গাছপালা অনেকটা লিঙ্কন আইল্যান্ডের মতোই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, গোটা দ্বীপে কোথাও কোনো ধোঁয়া দেখতে পাওয়া গেল না, কিংবা মানুষের অস্তিত্বের কোনো চিহ্নও দেখা গেল না। কিন্তু বোতলের কাগজটুকুতে পরিষ্কার লেখা ছিল, পরিত্যক্ত ব্যক্তি, টেবর আইল্যাণ্ড। লোকটির উচিত ছিল সমুদ্র, তীরে নজর রাখা, তার উদ্ধারের জন্যে কেউ আসে কি না।

বেলা বারোটার সময় বন-অ্যাডভেনচার-এর তলা টেবর আইল্যান্ডের বালিতে আটকে গেল। নোঙর ফেলে সবাই তীরে নামলেন। তীর থেকে আধ মাইল দূরে প্রায় তিনশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়। তার উপর থেকে গোটা দ্বীপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সবাই সেদিকে এগুলেন।

পাহাড়টার নিচে পৌঁছুনোর পর তার চুড়োয় উঠতে কয়েক মিনিটের বেশি লাগল না। উঠে দেখা গেল, দ্বীপটা ছোটো; পরিধি ছ-মাইলের বেশি হবে না। পাহাড়-পর্বত, নদীনালা ইত্যাদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের মতো তেমন-কিছুই নেই, সমতল ভূমি ও বনসমেত একটা দ্বীপ, আর ডিমের মতো তার আকৃতি। চারদিক দেখে-শুনে পেনক্র্যাফট বললে : চলুন, নেমে গিয়ে ভালো করে খোঁজা যাক।

সবাই বন-অ্যাডভেনচার-এর কাছে ফিরে এসে ঠিক করলেন, গোড়ায় দ্বীপটার চারদিক ঘুরে দেখবেন, তারপর ভিতরে ঢুকে খবর নেয়া যাবে। সমুদ্রের তীর ধরে চলাই সুবিধে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মধ্যে-মধ্যে ছোটো ছোটো পাহাড় পড়ল সামনে, কিন্তু তাতে চলার কোনো ব্যাঘাত হল না।

সবাই দক্ষিণ দিকে চললেন। পথে দলে-দলে সামুদ্রিক পাখি আর সীল তাদের দেখেই ছুটে পালাতে লাগল। তাতে মনে হল ইতিপূর্বে এরা মানুষ দেখেছে, সেইজন্যেই তাদের দেখে ভয়ে পলায়ন করল। এক ঘণ্টা চলে যাত্রীরা দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হলেন। এইভাবে চার ঘণ্টা চলবার পর দ্বীপের চারদিক ঘুরে দেখা গেল। কিন্তু জনমানবের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। মনে হল টেবর আইল্যাণ্ডে যেন কোনোকালে মানুষ আসেনি, কিংবা এসে থাকলেও সে এখন অন্যত্র প্রস্থান করেছে। হয়তো-বা বোতলটা অনেকদিন ধরেই জলে ভাসছিল, ইতিমধ্যে সেই ব্যক্তি কোনো উপায়ে দেশে ফিরে গেছে, কিংবা অনেক কষ্টভোগের পর লোকান্তরিত হয়েছে।

এরপর বন-অ্যাডভেনচারে ফিরে সবাই খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর বিকেল পাঁচটার সময় চললেন দ্বীপের অভ্যন্তরটায় সন্ধান করবার জন্যে। তাদের দেখে বনের জানোয়াররা সশব্দে পালাতে লাগল। তার মধ্যে বেশির ভাগই ছাগল আর শুয়োর। আগে কোনো সময়ে যে টেবর আইল্যাণ্ডে মানুষ এসেছিল, সে-বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। বনের মধ্যে মানুষের চলাফেরার পথের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল! মধ্যে-মধ্যে বড়ো-বড়ো গাছ পড়ে আছে—পরিষ্কার দেখা গেল কুড়ুল দিয়ে কাটা।

স্পিলেট বললেন : এ-সব দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, মানুষ যে শুধু এখানে এসেছিল তা-ই নয়, কিছুকাল এখানে বাসও করেছে। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে-এরা কারা? এদের কেউ কি এখনও দ্বীপে আছে?

হার্বার্ট বললে : বোতলের কাগজে লেখা ছিল : একজন এই দ্বীপে আছে।

সে-লোক যদি এখনও এখানে থেকে থাকে, বললে পেনক্র্যাফট : তবে নিশ্চয়ই তাকে খুঁজে বার করতে পারব।

দ্বীপের ঠিক মাঝখান দিয়ে কোনাকুনিভাবে একটা পথ গেছে। সে-পথে একটা নদীর তীর বেয়ে চললেন সবাই। নদীটা গিয়ে পড়েছে সীমাহারা নীলকান্ত সমুদ্রে। মধ্যে-মধ্যে খোলামেলা জায়গা দেখা গেল। কে যেন কোনোদিন শাক-সজির চাষ করেছিল।

হার্বার্ট চিনতে পারলে : বাঁধাকপি, গাজর, টারনিপ প্রভৃতির চাষ করা হয়েছিল। এদের বীজ লিঙ্কন আইল্যান্ডে নিয়ে যেতে হবে।

স্পিলেট বললেন : তা না-হয় নেয়া যাবে। কিন্তু চাষের অবস্থা দেখে তো মনে হয়, সে-লোক বেশিদিন এখানে থাকেনি। তা নইলে এ এমনভাবে নষ্ট হয়ে যেতো না। আমার মনে হয় সেই লোক চলে গেছে। বোতলটা বোধহয় সেই কাগজটুকু নিয়ে অনেকদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছিল।

সন্ধে হয়ে গেছে দেখে সবাই ফিরবার উদ্যোগ করলেন। এমন সময় হঠাৎ হার্বার্ট বলে উঠল : ওই দেখুন, গাছের ফাঁক দিয়ে একটা কুঁড়েঘর দেখা যাচ্ছে!

www.bengaliebook.com

সবাই, তখন সেদিকে ছুটলেন। গিয়ে দেখা গেল, ঘরটা কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি, চালটা মোটা টাপলিনের। ঘরটার দরজা অর্ধেক ভেজানো ছিল। পেনক্র্যাফট ঠেলে ভিতরে ঢুকল। ঢুকে দেখল, ঘরটা খালি।

হাবার্ট, পেনক্র্যাফট, আর স্পিলেট সেই অন্ধকার ঘরে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন।

খানিকক্ষণ পরে চেঁচিয়ে ডাকলে পেনক্র্যাফট : কে আছো?

কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

পেনক্র্যাফট আগুন জ্বাললে। এবার সব স্পষ্ট দেখা গেল। শূন্য ছোট্ট একটা ঘর, তার পেছনের দিকে একটা চুল্লি, কিছু সাঁৎসেঁতে কয়লা, আর একবোঝা কাঠ পড়ে আছে। কাছে। ঘরে একটা বিছানাও আছে। কিন্তু স্যাৎসেঁতে, হলদে চাদর দেখে মনে হল, সেবিছানা অনেকদিন ধরে কেউ ব্যবহার করেনি। চুল্লির এককোণে দুটো কেটলি পড়ে আছে; জং ধরে গেছে তাতে। একটা র্যাকের উপর নাবিকের জীর্ণ, ময়লা কামিজ। একটা টেবিলের উপর একটা টিনের প্লেট আর একটি বাইবেল। ঘরের এককোণে কিছু যন্ত্রপাতি, কোদাল, কুড়ল, আর দুটো বন্দুক। একটা বন্দুক আবার ভাঙা। দেয়ালের গায়ে তক্তার তাক। সেই তাকে একপিপে বারুদ, একপিপে গুলি আর অনেকগুলো ক্যাপের বাক সব ধূলিধূসর।

পেনক্র্যাফট বললে, ঘর তো খালি। আর, অনেকদিন ধরে কেউ এখানে বাস করেনি বলেই মনে হচ্ছে। আমি বলি, নৌকোয় ফিরে না গিয়ে আজ রাতটা এখানেই কাটানো যাক।

স্পিলেট বললেন : ঠিক বলেছো। ঘরের মালিক যদি ফিরে আসে, তবে হয়তো আমাদের দেখে দুঃখিত হবে না।

মালিক আর ফিরে আসবে না, বললে পেনক্র্যাফট : এই দ্বীপ ছেড়েও সে চলে যায়নি। দ্বীপ ছেড়ে চলে গেলে কি সে তার অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি সব ফেলে যেতো? জাহাজডুবির লোকদের কাছে এ-সব জিনিশ যে কী-রকম মূল্যবান, সেটা তো বুঝতে পারছেন। সে-যে দ্বীপ ছেড়ে চলে যায়নি, সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। কিন্তু এ–ঘরে আর ফিরে আসবে কি না, সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। হয়তো মারা গেছে। যদি মারা গিয়ে থাকে, তবে শরীরটা তো আর সে নিজে কবর দেয়নি, তার চিহ্ন কিছু-না-কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে।

সেই রাত্রে ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিয়ে তিনজনে বসে রইলেন। বলা যায় না, লোকটি যে-কোনো একসময়ে এসে হাজির হতে পারে। রাত ভোর হয়ে এলো, কিন্তু ঘরের দরজাও কেউ খুলল না, বাইরেও কারু সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। সবাই ঠিক করলেন, রাত ভোর। হলেই আবার খুঁজতে বেরুবেন। লোকটির মৃতদেহের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেলে তা কবর দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

ভোর হলে ওঁরা তিনজনে প্রথমে বাড়ির বাগান, মাঠ ইত্যাদি ঘুরে দেখলেনবাড়ির সামনে মাঠ, তারপর নীলের উচ্ছ্বাস। একটা পাহাড়ের নিচে বড়ো-বড়ো কতগুলো গাছের মধ্যিখানে কুটিরটা। জায়গাটা ভারি সুন্দর। বাড়ির সামনের মাঠের চারদিকে কাঠের বেড়া। এখন অবিশ্যি সব ভেঙে-চুরে গেছে। এই বেড়ার একটু দূরেই সমুদ্র। বেড়ার বাঁ দিকে সেই সমুদ্রের মুখ। ঘরটার কাঠ, ও—সবই কোনো জাহাজ থেকে নেয়া। সম্ভবত

দ্বীপের কাছাকাছি কোনো জাহাজ ডুবেছিল, তারই তক্তা দিয়ে এই লোকটি ঘর তৈরি করেছিল। স্পিলেট দেখতে পেলেন একটা তক্তার অস্পষ্টভাবে লেখা : Br-tan-ia—অর্থাৎ জাহাজটির নাম ছিল Britannia (ব্রিটানিয়া), কয়েকটা হরফ একেবারে উঠে গেছে। এরপর তিন জনে বন-অ্যাডভেনচারে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করলেন। একটু বেশিই খেয়ে নিলেন। সারাদিন ঘোরাঘুরিতে কাটিয়ে আবার কখন খাওয়ার সুবিধে হবে, কে জানে! আহারের পর তন্নতন্ন করে দ্বীপের অর্ধেকের বেশি খুঁজে দেখা হল, কিন্তু কোথাও কারু কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

তবে কি লোকটি মরে গেছে, আর বুনো জানোয়ারে তার শরীরটা খেয়ে ফেলেছে? একেবারে হাড়-টাড় সমেত!

পেনক্র্যাফট বললে : খুঁজে আর কী লাভ? আমরা তাহলে কাল সকালেই ফিরে যাবো।

বেলা দুটোর সময় একটা গাছের নিচে বসে জিরোতে-জিরোতে পরামর্শ করলেন তিনজনে।

যাওয়ার সময়, বললে হার্বার্ট : পরিত্যক্ত ব্যক্তির বাসনকোশন, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র সবই নিয়ে যাবো। দু-একটা শুয়োর আর ছাগলও ধরে নিয়ে যেতে হবে।

ঠিক বলেছো, বললেন স্পিলেট : কিন্তু তাহলে তা আরো-একদিন টেবর আইল্যাণ্ডে থাকা দরকার।

না, বললে পেনক্র্যাফট : আমরা কাল ভোরেই রওনা হবো। মনে হচ্ছে শিগগিরই পশ্চিমের হাওয়া শুরু হবে। আসার সময় নিরাপদে এসেছি, যাবার বেলায়ও তা-ই চাই। হার্বার্ট, তুমি তাহলে এখুনি গিয়ে শাক-সব্জির বীজ যা পাও জোগাড় করে নাও। আমি আর মিস্টার স্পিলেট চেষ্টা করে দেখি দু-একটা শুয়োর ধরতে পারি কি না।

তক্ষুনি খেতের দিকে গেল হার্বার্ট, পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট গেলেন বনের দিকে। ঘণ্টাখানেক চেষ্টার পর একটা ঝোঁপের মধ্যে দুটো শুয়োর পাকড়াও করলেন স্পিলেটরা। এমন সময় উত্তর দিকে একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ভীষণ একটা গর্জন।

কী সর্বনাশ। এ-যে হার্বার্টের চীৎকার!

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন দুজনে। পথটার বাঁক ফিরেই দেখলেন, সামনে একটা ভোলা জায়গায় হার্বার্ট মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে, আর তার বুকের উপরে ঠিক মানুষের মতো দেখতে ভীষণ-একটা হিংস্র জন্তু বসে তাকে আঘাত করবার চেষ্টা করছে। পলকের মধ্যে ছুটে গিয়ে হার্বার্টকে মুক্ত করে সেই হিংস্র জন্তুটাকে ওঁরা বেঁধে ফেললেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখা গেল, আততায়ী পশু নয়, একজন মানুষ; কিন্তু এমন ভীষণ বুনো আর হিংস্র চেহারার মানুষ কল্পনাও করা যায় না। ঠিক সময়ে মুক্ত করতে না-পারলে হার্বার্ট নির্ঘাৎ মারা পড়তো তার হাতে।

স্পিলেট বললেন : নিঃসন্দেহে এই লোকটিই টেবর আইল্যাণ্ডের পরিত্যক্ত ব্যক্তি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর মধ্যে এখন আর মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। আকারে-প্রকারে লোকটি

একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছে।

স্পিলেট মিথ্যে বলেননি। নির্জনে একলা বাস করবার দরুন সত্যিই লোকটির মনুষ্যত্ব একেবারে লোপ পেয়েছে। মুখ দিয়ে কথার বদলে শুধু ভাঙা-ভাঙা আওয়াজ বেরোয়। দাঁতগুলো প্রায় মাংস-খেকো হিংস্র জানোয়ারের মত ছুঁচলো। তার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত। নিজের অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবারও ক্ষমতা নেই। কী করে আগুন জ্বালাতে হয়, তা পর্যন্ত ভুলে গেছে। স্পিলেট তাকে উদ্দেশ করে কথা বললেন, কিন্তু সে-যে কিছু বুঝেছে এমনটা মনে হল না। শুনতে পেলো কি না সে-বিষয়েও সন্দেহ। কিন্তু স্পিলেট তার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলেন, তার জ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। চুপ করে বাঁধনে পড়ে আছে, দাঁড়ানোর কোনো চেষ্টা নেই। তবে কি বহুকাল পরে তারই মতো মানুষ দেখে স্মৃতিশক্তি ফিরে এসেছে? কে জানে।

স্পিলেট অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললেন : লোকটি যে-ই হোক, আর ভবিষ্যতে এর অবস্থা যা-ই হোক না কেন, একে লিঙ্কন আইল্যান্ডে নিয়ে যেতেই হবে।

নিয়ে তো যেতে হবেই, বললে হাবার্ট : আর আমার বিশ্বাস, ঠিক মতো শুশ্রূষা হলে এর বুদ্ধিশুদ্ধিও সব ফিরে আসবে।

স্পিলেট সে-কথায় সায় দিলেন : আমারও তা-ই বিশ্বাস। কিন্তু একে এখন নৌকোয় নিয়ে যেতে হবে। আমার মনে হয়, এর পায়ের বঁধন খুলে দিলে বোধহয় এখন আমাদের সঙ্গে হেঁটেই যেতে পারবে।

কয়েদির হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়ার পর সে নিজেই উঠে দাঁড়ালে। পালাবার কোনো চেষ্টা করলে না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই চলল। মাঝে-মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে ওঁদের পানে তাকালে। কিন্তু সে যে ওঁদের মানুষ বলে চিনতে পেরেছে, এমনটা বোঝা গেল না।

পিলেটের কথামতো প্রথমে তাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হলনিজের জিনিশপত্র দেখে যদি তার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসে। কিন্তু তার স্মৃতি ফিরে এলো না। মনে হল, সে যেন সবকিছুই ভুলে গেছে। স্পিলেট ভাবলেন, হয়তো আগুন দেখলে তার মনে কোনো স্মৃতি জাগতে পারে। আগুন জ্বালানোর পর পলকের জন্যে তার দৃষ্টি সেদিকে গেল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে।

কী আর করা যায়? এবার তাকে বন-অ্যাডভেনচারে নিয়ে-যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। নৌকোয় যাওয়ার পর তাকে পেনক্র্যাফটের পাহারায় রেখে স্পিলেট আর হার্বার্ট তাদের কাজগুলো শেষ করতে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টা বাদেই তারা বাসনকোশন, অস্ত্রশস্ত্র আর একরাশ শাকসজি আর বীজ, আর দু-জোড়া শুয়োর নিয়ে ফিরে এলেন। জিনিশপত্র সবই ব-অ্যাডভেনচারে তোলা হল।

ভোরবেলা জোয়ার এলেই নৌকো ছেড়ে দেয়া হবে। কয়েদিকে রাখা হল সামনের ক্যাবিনে। সে কালা-বোবার মতো চুপচাপ রইল সবসময়। পেনক্র্যাফট তাকে খেতে দিলে সে অপছন্দের ভঙ্গিতে রান্না-করা খাবার সব ঠেলে সরিয়ে দিলে। হার্বার্ট কতকগুলো হাঁস শিকার করে এনেছিল। পেনক্র্যাফট একটা হাঁস তার সামনে ধরবার সঙ্গে-সঙ্গেই বুনো বেড়ালের মতো ছোঁ মেরে হাঁসটা নিয়ে কাঁচাই খেয়ে ফেলল।

পেনক্র্যাফট বললে : না, আর-কখনও এর জ্ঞান ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়! তবে, অবিশ্যি নির্জন-বাসের জন্যেই বেচারির এমনধারা দুরবস্থা হয়েছে। তাই আমাদের সঙ্গে থেকে, আমাদের সেবা-যত্নে, খানিকটা বদল হওয়া বিচিত্র নয়।

রাত কেটে গেল। রাত্রে লোকটি ঘুমিয়েছিল কি না বলা যায় না। তবে তার বাঁধন খুলে দেয়া সত্ত্বেও সে আর নড়াচড়া করেনি। বুনো জানোয়ারকে প্রথমে ধরলে সে যেমন হতবুদ্ধি হয়ে যায়, লোকটির অবস্থাও বোধহয় তেমনি হয়েছে।

পনেরোই অক্টোবর ভোর পাঁচটার সময় বন্‌অ্যাডভেনচার ছেড়ে দেয়া হল। পাল তুলে দিয়ে পেনক্র্যাফট উত্তর-পুব দিকে নৌকো চালালে। এবার সোজা লিঙ্কন আইল্যাণ্ড।

প্রথম দিন বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটল না, কিন্তু পরদিন হাওয়ার বেগ খানিকটা বেড়ে যেতে সবাই একটু ভাবনায় পড়লেন। সমুদ্র ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠল। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে পৌঁছুতে দেরি হতে পারে। পেনক্র্যাফটের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল বটে, কিন্তু সে এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না।

সতেরোই অক্টোবর ভোরবেলা আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু তবুও মনে হল নৌকো লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি এসেছে। আরো চব্বিশ ঘণ্টা লাগল। কিন্তু তবু ডাঙার দেখা পাওয়া গেল না। সমুদ্র ক্রমেই উথাল-পাথাল হয়ে উঠতে লাগল। বাড়তে লাগল বাতাসের বেগও। আঠারো তারিখে একটা উত্তাল ঢেউ নৌকোর উপর বেগে এসে আছড়ে পড়ল। যাত্রীরা সবাই আগে থেকে সতর্ক না-হলে সেই ঢেউ সকলকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো।

তারপর ক্রমশ গুরুতর হয়ে উঠল সবার অবস্থা। পেন্যাফটের ভয় হল, বিশাল বিরাট সীমাহারা সমুদ্রে দিগভ্রান্ত হয়ে বুঝি-বা লিঙ্কন আইল্যান্ডে আর পৌঁছুনো গেল না।

তারপর আস্তে-আস্তে নেমে এলো নিদারুণ অন্ধকার রাত্রি বইতে লাগল উত্তাল হিমেল বাতাস। কিন্তু রাত এগারোটার সময় সৌভাগ্যবশত বাতাসের বেগ কমে গেল। আবার শান্ত হল অশান্ত সমুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততর হল নৌকোর গতি।

পলকের জন্যেও চোখ বুজলেন না কেউ। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় আলোড়িত হতে লাগল মন! হয়তো কাছেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড-হয়তো ভোরবেলাতেই দেখা যাবে শ্যামলবরণ তীর। কিন্তু তা যদি না-হয়, তবে হয়তো হাওয়ার টানে বন-অ্যাডভেনচার এত দূরে চলে যাবে যে, আবার ঠিক পথে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। সকলের চাইতে আলোড়িত হল পেনক্র্যাফটের মন। কিন্তু তবু হাল ছাড়লে সে। হাল ধরে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

রাত তখন প্রায় দুটো হবে, হঠাৎ পেনক্র্যাট চেঁচিয়ে উঠল : আলো! ওই যে আলো!

সত্যিই দেখা গেল আলোর উজ্জ্বল রেখা। উত্তর-পুব দিকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে উজ্জ্বল একটি আলোক-স্পন্দন আকাশের তারার মতো জ্বলছে। ওইদিকেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড!

নিশ্চয়ই সাইরাস হার্ডিং আলো জ্বালিয়েছেন, যাতে যাত্রীদল অন্ধকার রাত্রে ওই আলো দেখে পথের সন্ধান করতে সক্ষম হন। পেনক্র্যাফট উত্তর দিকে অনেকটা চলে গিয়েছিল। এবার আলো লক্ষ্য করে নৌকো চালিয়ে দিলে।

আর-কোনো ভয় নেই।

.

২.৭ রহস্য-লিপি

পরদিন বিশে অক্টোবর। চারদিনের দিন সকাল সাতটার সময় মার্সি নদীর মুখের কাছে এসে নোঙর ফেলল বন-অ্যাডভেনচার। এদিকে সাইরাস হার্ডিং আর নেব এই বিষম দুর্যোগ, আর সঙ্গীদের ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে উদ্বিগ্ন মনে সকালবেলাই প্রসপেক্ট হাইটে উঠে দেখছিলেন। এমন সময় দূরে বন-অ্যাডভেনচারকে দেখে হার্ডিং বললেন : এই-যে ওরা এসে পড়েছে।

বন-অ্যাডভেনচার-এর ডেকের উপরের লোক শুনে হার্ডিং প্রথমে মনে করেছিলেন যে, টেবর আইল্যাণ্ডের সেই লোকটিকে পাওয়া যায়নি, কিংবা পাওয়া গেলেও সে টেবর আইল্যাণ্ড ছেড়ে আসতে রাজি হয়নি। নৌকো তীরে ভেড়বার আগেই হার্ডিং নেবকে নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ওদের দেখেই শুধোলেন : তোমাদের এত দেরি দেখে আমরা ভারি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কোনোরকম মুশকিলে পড়তে হয়নি তো? হ্যাঁ, ভালো কথা। তোমরা যে-কাজে গিয়েছিলে, তা দেখছি নিস্ফল হয়েছে। চতুর্থ ব্যক্তিটিকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

না ক্যাপ্টেন, বললে পেনক্র্যাফট : আমরা চারজনই আছি।

পরিত্যক্ত লোকটিকে তাহলে খুঁজে পেয়েছ?

হ্যাঁ, একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

কোথায় সে? প্রশ্ন করলেন হার্ডিং : লোকটি কে?

লোকটি যে কে, তা বলা ভারি মুশকিল, বললেন স্পিলেট : একদা আমাদেরই মতো মানুষ ছিল বটে, তবে এখন আর তা নেই। এই বলে স্পিলেট সবকিছু হার্ডিংকে খুলে বললেন। এখন যে লোকটিকে আর মানুষ বলা যায় না, তাও স্পিলেট বললেন।

তারপর পেনক্র্যাফট বললে : সত্যি ক্যাপ্টেন, আমার তো মনে হচ্ছে যে লোকটিকে এখানে এনে ভালো কাজ হয়নি।

তা কেন বলছো? বললেন হার্ডিং: তাকে এনে যে ভালো করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন হয়তো ওর বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে, কিন্তু মাস-কয়েক আগেও তো সে ঠিক আমাদেরই মতো মানুষ ছিল। নির্জন-বাসের মতো অভিশপ্ত জীবন আর-কিছুই নেই।

স্পিলেট বললেন : মাসকয়েক আগে যে ওর জ্ঞান ছিল, তা কী করে বুঝবো? বোতলের চিঠিটা হয়তো ওর কোনো সঙ্গী লিখে থাকবে।

অসম্ভব! ঘাড় নাড়লেন হার্ডিং : তাহলে চিঠিতে নিশ্চয়ই দুজনের কথা লেখা থাকতো।

এরপর লোকটিকে ক্যাবিন থেকে তীরে নিয়ে আসা হল। তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলেন হার্ডিং। লোকটির মুখ দেখে মনে হল, যেন তার মনে পালানোর ইচ্ছে জেগেছে।

হার্ডিং তার দিকে এগিয়ে তার কাঁধে হাত দিলেন। তার উজ্জ্বল মুখ আর করুণ চোখ দেখে লোকটি তক্ষুনি মাথা নিচু করলে। তার অস্থিরতা অদৃশ্য হল। পলায়নের ইচ্ছে পর্যন্ত দূর হয়ে গেল।

মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ লোকটিকে দেখলেন হার্ডিং। বুঝতে পারলেন, সত্যিই তার মানবিকতা অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তার চোখে যে-আলো তখনও জ্বলছে সে-আলো মনুষ্যত্বের। সেবায়-যত্নে এর মনুষ্যত্ব ফিরিয়ে আনা অসম্ভব হবে না। তখন ঠিক করা হল, তাকে গ্র্যানাইট হাউসের একটা ঘরে রাখা হবে, যেখান থেকে পালানোর কোনো সম্ভাবনা নেই।

তাকে গ্যানাইট হাউসে নিয়ে যেতে কোনো মুশকিল হল না।

স্পিলেট, পেনক্র্যাফট আর হার্বার্টের খুব খিদে পেয়েছিল। নেব তাড়াতাড়ি আহারের ব্যবস্থা করল। সবাই আহার করতে বসলেন

আহারের সময় হার্ডিং ওদের অ্যাডভেনচারের সব কথা শুনলেন। সবাই আন্দাজ করলেন, লোকটি হয় মার্কিন, নয় তো ইংরেজ। সেই ব্রিটানিয়া জাহাজের নামটিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তার চেহারা দেখেও তা-ই মনে হয়।

হঠাৎ হার্ডিং জিগেস করলেন তা, তোমার সঙ্গে কী করে লোকটির দেখা হল, হার্বার্ট?

কী করে দেখা হয়েছিল, তা ঠিক বলতে পারছি না। বললে হার্বার্ট : আমি গাছগাছড়া, শাকসজি সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলুম, এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলুম, কাছেই খুব উঁচু একটা

গাছ থেকে সাঁৎ করে যেন কী একটা নেমে এলো। বোধহয় এই লোকটিই গাছের উপরে লুকিয়ে ছিল। তীরের মতো নেমে এসে হঠাৎ কখন আমার উপর পড়ল, তা বোঝবারও সময় পেলুম না। মিস্টার স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট যদি সে-সময়

হার্বার্টের কথা শেষ না-হতেই হার্ডিং বললেন, তুমি তাহলে জবর বিপদে পড়েছিলে বলো! তবে এ-কথা ঠিক যে, তোমার এই বিপদটি না-হলে লোকটি হয়তো এখনও লুকিয়েই থাকতো; টেবর আইল্যাণ্ড থেকে নতুন সঙ্গীটিকে তোমাদের আর আনা হত না।

আহারের পর সবাই সমুদ্রতীরে গেলেন। নৌকোর জিনিশপত্র সবই যথাস্থানে রেখে দেয়া হল। শুয়োরগুলি গেল খোঁয়াড়ে। বারুদের পিপে, গুলির বাক্স ইত্যাদি সযত্নে রেখে দেয়া হল। এবার বন-অ্যাডভেনচারকেও একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে।

হার্ডিং বললেন : নৌকোটা মার্সি নদীর মুখে রেখে দিলে হয় না?

পেনক্র্যাফট আপত্তি জানালে : না ক্যাপ্টেন, মার্সি নদীর মুখে বেশি সময় বালির মধ্যে পড়ে থাকবে, তাতে নৌকোর কাঠ নষ্ট হতে পারে। আমার ইচ্ছে, আপাতত ওটাকে পোর্ট বেলুনে রেখে দিই।

তবে সেখানেই রাখো, বললেন হার্ডিং : কিন্তু আমার মনে হয় ওটাকে চোখের সামনে কোনো জায়গায় রাখতে পারলেই ভালো হয়। যাক, পরে সুবিধেমতো ব-অ্যাডভেনচারের জন্যে একটা বন্দর বানাতে হবে।

কিছুদিনের মধ্যেই আগন্তুকের ভালোর দিকেই বেশ-একটু পরিবর্তন দেখা গেল। এত শিগগির পরিবর্তন দেখা যাওয়ায় বোঝা গেল যে তার জ্ঞান একেবারে লোপ পেয়েছে বলে সকলে আগে যে-ধারণা করেছিলেন, তা ভুল। টেবর আইল্যান্ডে খোলা হাওয়ায় স্বাধীনভাবে সে ঘুরে বেড়াতো। তাই গ্র্যানাইট হাউসে বন্ধ থেকে সে প্রথমটা বিরক্ত মুখে বসে থাকতো। সবাই ভয় করতেন, পাছে সে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা দিয়ে নিচে লাফিয়ে পড়ে। ক্রমশ তার সেই বিরক্তি দূর হল। তখন তাকে চলাফেরা সম্পর্কে একটু স্বাধীনতা দেয়া হল। বুনো জানোয়ারের মতো কঁচা মাংস সে আর খায় না। রান্না করা খাবার দিলে দ্বিরুক্তি না-করে গ্রহণ করে। একদিন যখন ঘুমিয়েছে, তখন হার্ডিং তার চুল-দাড়ি কেটে দিলেন। তার পোশাকও বদলে দেয়া হল। এখন তার মুখের ভাব বেশ স্নিগ্ধ হয়েছে। এবং পোশাক পরাবার পর আর তার হিংস্র চেহারার বিন্দুমাত্র চিহ্ন রইল না।

প্রত্যহ হার্ডিং তার সঙ্গে একটু সময় কাটাতেন। তার কাছে বসে তার দৃষ্টি আকর্ষণ। করবার জন্যে নানান ধরনের কাজ করা হত। চেঁচিয়ে কথা বলতেন সবাই। উঁচু গলায় আলোচনা করতেন নৌ-বিদ্যা-যে-সব কথা শুনলে নাবিক-মাত্রেরই কৌতূহল জাগে, সেসব কথা প্রায়ই আলোচনা করা হত। কখনো-কখনো লোকটি তাঁদের কথাবার্তায় মনোযোগ দিতো। স্পষ্টই বোঝা যেতো যে সে কিছু-কিছু বুঝতে পারছে। মধ্যে-মধ্যে তার মুখে ফুটে উঠতো বিষাদের ছাপ। এ ছাড়া সবসময়েই সে থাকতো গম্ভীর হয়ে। আস্তে-আস্তে হার্ডিংএর প্রতি তার আকর্ষণ জেগেছে বলে বোঝা গেল। হার্ডিং ভাবলেন তাকে একবার বনের কাছে নিয়ে যাবেন-দৃশ্যপট বদলের সঙ্গে সঙ্গে যদি তার ভাবের পরিবর্তন হয়।

স্পিলেট কিন্তু এ-কথায় আপত্তি জানালেন। বললেন : স্বাধীনতা পেলে যদি পালিয়ে যায়?

তাহলেও, হার্ডিং বললেন, পরীক্ষা করে দেখতেই হবে। আমার তো মনে হয় সে পালাবে না।

এইসব কথাবার্তা যেদিন হল, সেদিন তিরিশে অক্টোবর। অর্থাৎ ন-দিন হল গ্র্যানাইট হাউসে বন্দী হয়ে আছে লোকটি। সে যে-ঘরে শুয়ে ছিল, পেনক্র্যাফটকে নিয়ে সে-ঘরে গেলেন হার্ডিং। তাকে বললেন, ওঠো, একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমায়।

তখুনি উঠে দাঁড়ালে লোকটি একবার তাকালে হার্ডিং-এর দিকে, তারপর দ্বিরুক্তি না-করে সঙ্গে-সঙ্গে চলল। পেনক্র্যাফট চলল তার পিছনে-পিছনে। গ্র্যানাইট হাউসের দরজার কাছে এসে হার্ডিং লোকটিকে লিফটে চড়ালেন। লিফট থেকে সমুদ্রতীরে গেলে পর সবাই খানিক দূরে সরে গিয়ে আগন্তুককে স্বাধীনতা দিলেন।

ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল লোকটি। উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চোখ। কিন্তু সে একটুও পালানোর চেষ্টা করলে না। ছোটো-ছোটো ঢেউ ভেঙে পড়ছে তীরে, তারপর শাদা ফেনা হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সে অপলক চোখে তা-ই দেখতে লাগল।

স্পিলেট বললেন : সমুদ্র দেখে পালানোর ইচ্ছে ওর মনে জাগবে কিন্তু।

বেশ, বললেন হার্ডিং, তবে ওকে বনের কাছেই নিয়ে যাওয়া হোক।

সবাই আগন্তুককে নিয়ে মার্সি নদীর মুখের দিকে গেলেন। তারপর নদীর বাঁ-তীর ধরে গিয়ে প্রসপেক্ট হাইটে উপস্থিত হলেন। এখান থেকেই শুরু অরণ্য। একদৃষ্টে অরণ্যের দিকে তাকিয়ে লোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে। সবাই তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইলেন। পালানোর চেষ্টা করলেই যাতে ধরে ফেলতে পারেন তাকে, সেইজন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। সামনে ছোটো নদী, তার পরই গহন অরণ্য। একবার মনে হল, আগন্তুক হয়তো জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুহূর্তের জন্যে সে পা দুটি বাঁকালে লাফ দেবার জন্যে। পরক্ষণেই আবার পিছনে সরে এসে প্রায় বসে পড়ল।

সঙ্গে-সঙ্গে দেখা গেল, সে কঁদছে, তার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়ছে।

সাইরাস হার্ডিং নিচু স্বরে বললেন : তোমার চোখে যখন জল দেখা দিয়েছে, তখন তোমার মনুষ্যত্বও যে ফিরে এসেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সবাই আগন্তুককে পুরো স্বাধীনতা দিয়ে খানিকক্ষণের জন্যে দূরে সরে এলেন। কিন্তু এতেও তার পালানোর ইচ্ছে দেখা গেল না। তখন তাকে নিয়ে সবাই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

এই ঘটনার দু-দিন পরে মনে হল, আগন্তুক যেন সকলের প্রাত্যহিক কাজে যোগ দিতে চায়। স্পষ্ট বোঝা গেল, সে অন্যের কথা মন দিয়ে শোনে, বুঝতে পারে। কিন্তু নিজে সে একটাও কথা বলে না।

তারপর আগন্তুক যন্ত্রপাতি নিয়ে বাগানে কাজ করতে শুরু করলে। এই কাজের সময় কেউ তার কাছে গেলেই সে কাজ ছেড়ে গম্ভীর মুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে যেতো। হার্ডিং-এর কথামতো সে-সময় কেউ তাকে কোনো কথা বলে বিরক্ত করতো না।

কয়েকদিন পরে তেসরা নভেম্বর আগন্তুক বাগানের কাজ করতে করতে হঠাৎ হাতের কোদাল ফেলে দাঁড়ালে।

দূর থেকে হার্ডিং তার উপর নজর রেখেছিলেন। দেখতে পেলেন, আগন্তুক কাঁদছে।

দুঃখিত হলেন হার্ডিং। তার কাছে এসে তার হাত ধরে বললেন : আমার দিকে তাকাও তো!

আগন্তুক তার দিকে তাকালে। কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর তার চোখদুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাঙা গলায় সে শুধোলে : আপনারা কারা?

হার্ডিং বললেন : আমরাও তোমার মতোই পরিত্যক্ত মানুষ। তুমি টেবর আইল্যাণ্ডে অসহায় অবস্থায় পড়ে ছিলে, তাই তোমাকে তোমার সঙ্গী বন্ধুদের মধ্যে আনা হয়েছে।

আমার বন্ধু! সঙ্গী! না, না-পৃথিবীতে আমার বন্ধু কেউ নেই। কেউ নেই! এই বলে সে সমভূমির কিনারায় ছুটে গিয়ে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রায় দু-ঘন্টা সে সমুদ্রতীরে গভীর চিন্তায় ডুবে রইল। দু-ঘণ্টা পরে সে যেন মন ঠিক করে এসে উপস্থিত হল। কান্নার ফলে চোখ লাল হয়ে উঠেছে, মুখে বিষাদের ছাপ।

নতমুখে সে হার্ডিংকে শুধোলে : আপনারা কি ইংরেজ?

না, আমরা আমেরিকান! তুমি কোন দেশের লোক?

ইংল্যাণ্ডের।

এই কথা বলেই সে আবার সমুদ্রতীরে চলে গেল। সেখানে গিয়ে সে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। একবার হার্বার্টের কাছে এসে জিগেস করলে : এটা কোন মাস? কোন সাল?

আঠারোশো ছেষট্টি সালের নভেম্বর।

অস্ফুট কণ্ঠে সে উচ্চারণ করল : বারো বছর! তারপর ফের হার্বার্টের কাছ থেকে চলে গেল।

হার্বার্ট সবাইকে এ-কথা বলতেই হার্ডিং বললেন : লোকটি তবে বারো বছর ধরে টেবর আইল্যাণ্ডে রয়েছে। এত বছর নির্জন বাসে যে তার জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে, তাতে আর বিচিত্র কী!

আমার মনে হয়, বললে পেনক্র্যাফট : জাহাজডুবির দরুন ও মোটেই টেবর আইল্যাণ্ড আসেনি। কোনো সাংঘাতিক অপরাধের দরুণ টেবর আইল্যাণ্ডে ওকে নির্বাসন দেয়া হয়েছিল।

হয়তো তোমার কথাই ঠিক, বললেন হার্ডিং : তাহলে হয়তো যারা ওকে ফেলে গিয়েছিল, তারা আবার ওকে নিয়ে যাবার জন্যে টেবর আইল্যাণ্ডে ফিরে আসতেও পারে। কিন্তু এই সম্পর্কে কোনো কথাই ওকে জিগেস করা চলবে না। পাপ যদি সে করেও থাকে, তবে তার জন্যে সে যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত করেছে।

এরপর কিছুদিন পর্যন্ত আগন্তুক একটা কথাও বললে না। বাগানেই সে থাকে। নীরবে কাজকর্ম করে। এক মুহূর্তও জিরোয় না। শাকসজি চিবিয়ে খায়। অনুরোধ করা সত্ত্বেও গ্র্যানাইট হাউসে এসে সবার সঙ্গে আহারে যোগ দেয় না। রাত্রেও গ্র্যানাইট হাউসে ঘুমোতে আসে না। বাগানেই ঝোঁপের মধ্যে ঘুমোয়। দুর্যোগ উপস্থিত হলে আশ্রয় নেয় গুহায়। সে যেন টেবর আইল্যাণ্ডের বুনো জীবনই যাপন করছে আবার। সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অবশেষে একদিন সে তার জীবনের ভীষণ কাহিনী না-বলে আর থাকতে পারলো না।

দশই নভেম্বর রাত প্রায় আটটার সময় সবাই বারান্দায় বসে আছেন, এমন সময় আগন্তুক হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হল। চোখ তার জ্বলছে, মুখ আগের মতোই হিংস্র আর ভয়াবহ।

এসেই সে অসংলগ্নভাবে বলতে শুরু করল : এখানে আমাকে এনেছেন কেন? কোন অধিকারে এনেছেন আমায়? জানেন আমি কে? জানেন আমি কী অপরাধ করেছিলুম? কেন আমি একলা টেবর আইল্যাণ্ডে থাকতুম, জানেন? আমি যে চোর, ডাকাত কিংবা খুনে নই, তা বুঝলেন কী করে?

তার এই উত্তেজনা দেখে হার্ডিং তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে সেদিকে। দৃকপাত না-করে বলল : একটা কথা আমি জানতে চাই। আমি কি স্বাধীন?

হ্যাঁ, হার্ডিং বললেন : নিশ্চয়ই তুমি স্বাধীন।

তবে আমি চললুম-বলেই সে পাগলের মতো অরণ্যের দিকে ছুটে চলে গেল।

সংবিৎ ফিরতেই হার্ডিং বললেন : যাক, ওকে আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। আমি ঠিক জানি, ও আবার ফিরে আসবে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল, কিন্তু আগন্তুকের কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না। হার্ডিং কিন্তু স্থির নিশ্চিত যে, সে আবার ফিরে আসবে। এভাবে ও-যে একলা থাকছে, তা কেবল অনুতাপের জন্যে। নির্জন-বাসে ভয় পেয়ে আবার তাকে ফিরে আসতেই হবে।

এবার সবাই আবার নিয়মিত কাজ শুরু করে দিলেন। টেবর আইল্যাণ্ড থেকে আনা বীজগুলো সযত্নে রোপণ করা হল। ফসল এখন যথেষ্ট ফলে। একটা হাওয়াকল বা উইণ্ডমিল তৈরি করতে পারলে গম থেকে ময়দা তৈরি করা যাবে। হার্ডিং ঠিক করলেন প্রসপেক্ট হাইটের উপরে একটা শাদাসিধে ধরনের উইণ্ড-মিল তৈরি করবেন। প্রসপেক্ট হাইটের উপর সমুদ্রে জোরালো হাওয়া লাগবে-অনবরত ঘুরতে থাকবে প্রপেলার। হার্ডিং ছোটো-একটা নমুনাও বানালেন। পাখির বাসার দক্ষিণে লেকের তীরে মিল বানানোর জায়গা ঠিক হয়ে গেল। দিনরাত খেটে দিন-কয়েকের মধ্যেই উইণ্ড-মিলটা প্রস্তুত করা হল।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু আগন্তুকের কোনো খবর নেই। গ্র্যানাইট হাউসের কাছে বনের মধ্যে স্পিলেট হার্বার্টকে নিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, কিন্তু তার কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। হার্ডিং কিন্তু তবু বলতে লাগলেন যে লোকটি ফিরে আসবেই, এবং এসে তাঁদের দলে যোগও দেবে।

শেষ পর্যন্ত হার্ডিং-এর কথাই ঠিক হল। তেসরা ডিসেম্বর হাবার্ট হ্রদের দক্ষিণ তীরে মাছ ধরতে গিয়েছিল। পেনক্র্যাট আর নেব পাখির বাসায় কাজে ব্যস্ত। হার্ডিং আর স্পিলেট তখন চিমনিতে বসে সাবান তৈরির জন্যে সোড়া প্রস্তুত করছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল : বাঁচাও! বাঁচাও!

হার্ডিং আর স্পিলেট দূরে ছিলেন বলে চিৎকার শুনতে পাননি। পেনক্র্যাফট আর নেব উধর্বশ্বাসে হদের দিকে ছুটল। তারা হ্রদের তীরে পৌঁছুবার আগেই আগন্তুক বন থেকে ছুটে এসেছে। দেখা গেল হার্বার্টের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একটা ভীষণ-দর্শন জাওয়ার।

জাগুয়ারটা হার্বার্টের উপর প্রায় লাফিয়ে পড়বে, এমন সময় আগন্তুক এসেই শুধু একটা ছুরি হাতে নিয়ে জাওয়ারের উপর লাফিয়ে পড়ল। জাগুয়ারটাও তখন হার্বার্টকে ছেড়ে তাকেই আক্রমণ করলে। অসাধারণ শক্তি আগন্তুকের শরীরে। একহাতে জাগুয়ারের টুটি টিপে ধরে অন্যহাতে সে সজোরে ছুরিটা আমুল বসিয়ে দিলে জাগুয়ারের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে জাগুয়ারটা মাটিতে পড়ে গেল।

আগন্তুক তক্ষুনি ফেরবার উপক্রম করলে, এমন সময় অন্যরা সেখানে এসে পৌঁছুলেন। এদিকে হার্বার্টও আগন্তুককে জড়িয়ে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল : না, না, কিছুতেই তোমাকে যেতে দেবো না।

বোম্বেটেদের জাহাজ

দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড ৩
দ্বীপের রহস্য

৩.১ বোম্বেটেদের জাহাজ

সবাই এসে ভিড় করলেন জাহাজের সামনে। পেনক্র্যাফট তো দৌড়ে এসেই দুরবিন লাগিয়ে সেই বিন্দুটিকে পরীক্ষা করে বললে : সত্যিই এটা জাহাজ!

স্পিলেট শুধোলেন : জাহাজটা কি এদিকে আসছে?

এখন তা বলা মুশকিল। এখন শুধু মাস্তুলের ডগা দেখতে পাচ্ছি বললে পেনক্র্যাফট : অন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

হার্বার্ট প্রশ্ন করলে, এখন তাহলে কী করবো?

হার্ডিং বললেন, অপেক্ষা করবো।

এরপর অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবাই নীরব হয়ে রইলেন। আশায়-উদ্বেগে-আশঙ্কায় সকলের মনই আলোড়িত হতে লাগল। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসার পর এ-রকম ঘটনা এই প্রথম। দীর্ঘকাল দ্বীপে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে দ্বীপটার উপর সকলেরই একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল। যাই হোক, এই জাহাজের কাছে সভ্য জগতের খবর জানতে পারা যাবে।

আমেরিকার খবরও পাওয়া যেতে পারে। তাই জাহাজটা দেখে আশঙ্কায় আনন্দে তোলপাড় চলতে লাগল সকলের মনে। পেন্যাফট মধ্যে-মধ্যে দুরবিন দিয়ে জাহাজটা দেখতে লাগল। তখনও কুড়ি মাইল পুবদিকে রয়েছে জাহাজটা। এখনো সেটাকে সংকেত করে কিছু জানানোর উপায় নেই। তবু দ্বীপের উপরে এত-বড়ো ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বত যখন রয়েছে, তখন এটার উপর জাহাজের লোকের নজর পড়বেই।

কিন্তু এখানে কেন এলো জাহাজটা? ম্যাপে তো প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশে টেবর আইল্যাণ্ড ছাড়া অন্য কোনো দ্বীপের অস্তিত্ব নেই!

হার্বার্ট জিগেস করলে : এটা কি ডানকান জাহাজ?

স্পিলেট বললেন : শিগগির আয়ারটনকে ডেকে পাঠাও। এটা ডানকান কি না, তা সেই বলতে পারবে।

তক্ষুনি আয়ারটনকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে টেলিগ্রাম করা হল।

হার্বার্ট বললে : এটা যদি ডানকান জাহাজ হয়, তবে এটাকে দেখেই আয়ারটন চিনতে পারবে।

হ্যাঁ, আর সৌভাগ্যবশত, আয়ারটন এখন ডানকানে যাওয়ার উপযুক্ত হয়েছেবললেন হার্ডিং : ঈশ্বর করুন, এটা যেন ডানকান জাহাজই হয়! অন্য-কোনো বেহুদা জাহাজ হলেই ভাবনার কথা! এসব জায়গার ভারি দুর্নাম। মালয় বোম্বেটে এসে হাজির হওয়াও

বিচিত্র নয়। এলে অবশ্য আমরা আত্মরক্ষা করতে পারবো; কিন্তু আত্মরক্ষার দরকার না-হলেই ভালো।

পেনক্র্যাফট বললে : জাহাজটা যদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের খানিক দূরে এসে নোঙর ফ্যালে, তখন আমরা কী করবো?

একটু ভেবে হার্ডিং উত্তর করলেন : তখন আমরা এই জাহাজের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবো। তারপর এই জাহাজে চড়ে দ্বীপ ছেড়ে চলে যাবো। যাওয়ার আগে দ্বীপটাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নামে দখল করে নেবো। কিছুদিন পরে আবার আমরা ফিরে আসবো। এখানে উপনিবেশ করে থাকবে বলে তখন যদি কেউ আমাদের সঙ্গে আসতে চায়, তবে তাদেরও সঙ্গে করে আনবো। তখন লিঙ্কন আইল্যাণ্ড হবে প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে আমেরিকার একটা ঘাঁটি।

বিকেল চারটের সময় আয়ারটন গ্র্যানাইট হাউসে এলো। হার্ডিং তাকে জানলার কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন : আয়ারটন, একটা জাহাজ দেখতে পাওয়া গেছে, সেইজন্যেই তোমায় ডেকেছি। দুরবিনটা দিয়ে ভালো করে দ্যাখো তো এটা ডানকান জাহাজ কি না?

দুরবিন দিয়ে অনেকক্ষণ ভালো করে দেখে আয়ারটন বললে : একটা জাহাজ তো বটেই। কিন্তু আমার মনে হয় না যে এটা ডানকান।

কেন ডানকান বলে মনে হয় না? শুধোলেন স্পিলেট।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

ডানকান হল একটা স্টীমশিপ, বললে আয়ারটন : কিন্তু আমি তো ধোঁয়ার কোনো চিহ্নই দেখছি না। অবিশ্যি এমনও হতে পারে, আগুন নিবিয়ে দিয়ে এখন শুধু পালে চলেছে, তাই ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছি না। সেইজন্যে এটা আরো কাছে না-আসা পর্যন্ত কিছু বলার জো নেই। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই বলে আয়ারটন ঘরের এককোণে চুপ করে বসে রইল।

সবাই আবার জাহাজ সম্পর্কে অলোচনা করতে লাগলেন, কিন্তু আয়ারটন তাতে যোগ দিলে না। সাইরাস হার্ডিং গম্ভীরভাবে বসে চিন্তা করতে লাগলেন। জাহাজের এই আকস্মিক আগমন তার পছন্দ হয়নি। বরং বেশ-একটু ভাবনাই হল তার।

ক্রমে জাহাজটা আরো-কাছে এলে পেনক্র্যাফট দুরবিন দিয়ে দেখলে, সেটা দ্বীপের দিকে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে যদি চলতে থাকে, তবে শিগগিরই ক্ল অন্তরীপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু, তবু জাহাজটার উপরে নজর রাখতে হবে। এদিকে সন্ধে হয়ে এলো, আস্তে-আস্তে আলো কমে আসছে।

স্পিলেট শুধোলেন : রাত হলে অন্ধকারে কী করা যাবে! একটা আগুন জ্বাললে হয় না? তা দেখে জাহাজের লোকে বুঝতে পারবে যে, এখানে একটা দ্বীপ আছে!

প্রশ্নটা একটু গুরুতর। হার্ডিং-এর আশঙ্কা তখনও দূর হয়নি। তবু, আগুন জ্বেলে রাখাটাই উচিত বলে ঠিক হল। রাত্রে হয়তো জাহাজটা চলে যেতে পারে। এটা চলে গেলে আবার কি কোনো জাহাজ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের কাছে আসবে? এই সুযোগ হারালে হয়তো অনুতাপ করতে হবে পরে। তাই ঠিক হলনে আর পেনক্র্যাফট পোর্ট বেলুনে

গিয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাবে। তারা দুজনে যখন পোর্ট বেলুনে যাওয়ার দিকে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন দেখা গেল, জাহাজটা হঠাৎ তার গতি ফিরিয়ে মুখ করেছে ইউনিয়ন বে-র দিকে। আয়ারটন দুরবিন নিয়ে খুব ভালো করে দেখতে লাগল জাহাজটাকে। প্রসন্ন আকাশে তখনও বেশ আলো আছে। আয়ারটন স্পষ্ট দেখতে পেলে, জাহাজে চিমনি নেই। সে বললে : অসম্ভব! এটা ডানকান জাহাজ হতেই পারে না।

আরো ভালো করে দেখে সে বললে : জাহাজটা ভারি সুন্দর, বেশ মজবুত আর লম্বা। খুব দ্রুত চলতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কোন্ জাতের জাহাজ, সেটা বলা শক্ত। একটা নিশান উড়ছে, কিন্তু সেটার রঙ ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

এবার পেনক্র্যাফট দুরবিন নিয়ে জাহাজটাকে দেখতে লাগল। বললে, এটা আমেরিকার নিশান নয়—মনে হয় নিশানটা একরঙা। এটার রঙ দেখে মনে হচ্ছে—

নিশানটা ঝুলে পড়েছিল, ঠিক এইসময় হাওয়ার আবেগে আবার পৎ-পৎ করে উড়তে লাগল। আয়ারটন দুরবিনটা চোখে নিয়ে দেখে বলে উঠল : কী সর্বনাশ! নিশানের রঙ যে কুচকুচে কালো!

সাইরাস হার্ডিং-এর ধারণাই তবে সত্যি হল? এটা কি তবে বোম্বেটে জাহাজ? বোম্বেটে জাহাজ লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আসবে কেন? তবে কি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে বোম্বেটেরা ঘাঁটি করবে?

সাইরাস হার্ডিং বললেন, জাহাজটা হয়তো শুধু চারপাশ দেখে-শুনেই চলে যাবে, দ্বীপে আসবে না। তাহলেও দ্বীপে যে মানুষ আছে, তা যেন বোম্বেটেরা জানতে না-পারে।

আয়ারটন আর নেব গিয়ে উইণ্ড-মিলের প্রপেলারগুলো নামিয়ে ফেলুক, সেইটেই সবচেয়ে আগে চোখে পড়বে। তারপর গ্র্যানাইট হাউসের দরজা-জানলাগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দাও, আর সব আগুন নিভিয়ে ফ্যালো।

হার্বার্ট বললে, বন-অ্যাডভেনচারের কী হবে?

পেনক্র্যাফট বললে : বন-অ্যাডভেনচার পোর্ট বেলুনে একেবারে নিরাপদ। বাজি রেখে বলতে পারি, বোম্বেটেরা সেটা খুঁজেই বার করতে পারবে না।

এভাবে সতর্কতা অবলম্বন করবার পর ঠিক হলবোম্বেটেরা যদি লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দখল করতে চায়, তবে প্রাণপণে বাধা দিতে হবে। এবার জানতে হবে বোম্বেটেদের সংখ্যা কত, তাদের অস্ত্রশস্ত্রের অবস্থাই বা কেমন। কিন্তু জানবার উপায় কী? এদিকে মেঘলা আকাশে রাত্রি নেমে এসেছে। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল সবকিছু। জাহাজের আলো নেভাননা। সেটা ভালো করে দেখতেই পাওয়া যায় না। এমন সময় হঠাৎ অন্ধকারে একটা আলোর ফিনকি দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামানের প্রচণ্ড গর্জন। জাহাজে তবে কামানও আছে!

কামানের আওয়াজ পৌঁছুতে প্রায় ছ-সেকেণ্ড লাগল। তার মানে, তীর থেকে প্রায় সোয়া মাইল দূরে আছে জাহাজটা। এমন সময় একটা গুরু-গুরু শব্দ শোনা গেল। জাহাজ থেকে জলে পড়ল শেকল। গ্র্যানাইট হাউসের ঠিক সামনে; অর্থাৎ সেখানেই নোঙর ফেলেছে জাহাজ।

এতক্ষণে বোম্বেটেদের মৎলব বোঝা গেল। রাতটা কাটলেই তারা নৌকোয় চড়ে তীরে নামবে। হার্ডিংরা অবশ্য প্রস্তুত হয়েই আছেন সংঘর্ষের জন্যে, কিন্তু বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে। অযথা রক্তপাত ঘটানো ঠিক হবে না। সৌভাগ্যবশত গ্র্যানাইট হাউস দুর্ভেদ্য, দরজা-জানলাগুলো লতাপাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। গ্র্যানাইট হাউসে বোম্বেটেরা ঢুকতে পারবে না; কিন্তু খেত, পাখির বাসা, কোর‍্যাল—সবই তারা নষ্ট করে ফেলতে পারে।

বোম্বেটেদের দলে ক-জন লোক আছে, সেইটেই সবচেয়ে আগে জানা দরকার। দশবারো জন লোক হলে হয়তো বাধা দেয়া যাবে, কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ জন লোক হলে বিপদের সম্ভাবনা। এছাড়া, বোম্বেটেদের যে কামানও আছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এমন সময় আয়ারটন বললে : ক্যাপ্টেন হার্ডিং, আমার একটা আরজি আছে। কী? শুধোলেন হার্ডিং।

আয়ারটন বললে : জাহাজটায় গিয়ে দেখে আসতে চাই, ওদের লোকজনের সংখ্যা কত।

কিন্তু, হার্ডিং বললেন : এতে যে প্রাণের ভয় আছে!

থাকক। তবু আমি যাবো। বললে আয়ারটন : চুপি-চুপি সাঁতার কেটে যাবো জাহাজে। কিছু ভাববেন না। আমি খুব ভালো সাঁতার জানি। মাইল-দেড়েক দূরে আছে তো জাহাজটা? সে আমি সাঁৎরেই যেতে পারবো।

হার্ডিং আবার বললেন : কিন্তু এতে যে তোমার প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা আছে।

প্রাণের ভয় আমি করি না। বললে আয়ারটন : আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই আমি এ-কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছি। আপনি আমায় অনুমতি দিন।

এ-কথা শুনে হার্ডিং আর বাধা দিলেন না। কিন্তু পেনক্র্যাফট বললে : আমি আয়ারটনের সঙ্গে যাবো। আমি শুধু উপদ্বীপ পর্যন্ত যাবো আয়ারটনের সঙ্গে। বলা যায় না তো, এর মধ্যে বোম্বেটেদের কেউ তীরে নেমেছে কি না! তখন দুজন থাকলে ভালো হবে। আমি সেখানে আয়ারটনের জন্যে অপেক্ষা করবো আর ও জাহাজে চলে যাবে।

আয়ারটন যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হল। যে-দুঃসাহসের কাজে সে ঝাঁপিয়ে পড়তে চলেছে, তাতে মুহূর্তের অসতর্কতায় মৃত্যুর সম্ভাবনা। তবে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে সে যদি কাজ হাসিল করতে পারে, তবে দ্বীপবাসীরা আসন্ন সংঘর্ষের জন্যে ভালো করে তৈরি হতে পারবেন। অন্য-সকলের সঙ্গে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট সমুদ্রতীরে নেমে এলো। আয়ারটন জামাকাপড় খুলে গায়ে খুব করে চর্বি মেখে নিলে, যাতে ঠাণ্ডাটা একটু কম লাগে। ইতিমধ্যে নেব গিয়ে মার্সি নদীর তীর থেকে ক্যানুটা নিয়ে এলো। তখন আয়ারটন সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পেনক্র্যাফটের সঙ্গে গিয়ে নৌকোয় উঠল। দেখতে-দেখতে নৌকো প্রণালীর অন্য পারে গিয়ে হাজির হল। অন্য-সকলে চিমনিতে গিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট উপদ্বীপ পেরুবার আগে চুপি-চুপি চারদিক দেখে নিলে।, কোনো বোম্বেটেই তীরে নামেনি। নিরাপদে দ্বীপের অন্যধারে গিয়ে একটুও দ্বিধা নাকরে

আয়ারটন সমুদ্রের জলে নেমে পড়ল। পেন্যাক্ট পাহাড়ের একটা ফাটলের মধ্যে আত্মগোপন করে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু আগে জাহাজে কয়েকটা আলো জ্বলেছিল। আয়ারটন নিঃশব্দে সেই আলো লক্ষ্য করে জাহাজের দিকে এগুতে লাগল। শুধু বোম্বেটেদের ভয়ই নয়, সমুদ্রে হাঙরও থাকতে পারে। কিন্তু আয়ারটন সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করলে না। আধ ঘণ্টা পরে জাহাজের কাছে উপস্থিত হয়ে নোঙরের মোটা শেকলটা ধরে ফেললে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে উপরে ডেকের কিনারে গিয়ে দেখতে পেলে–নাবিকদের কামিজ ঝুলছে। সে একটা কামিজ আর প্যান্ট পরে চুপ করে বসে সব কথাবার্তা শুনতে লাগল। জাহাজের সব লোক তখনও ঘুমোয়নি। কয়েকজন জাহাজি বসে গল্প করছে। আয়ারটন শুনতে পেলে তারা বলাবলি করছে : খাশা জাহাজটা পাওয়া গেছে! সুন্দর চলে! নামটাও জুৎসই, স্পীডি! আমাদের কাপ্তেনও খাশা লোক? হ্যাঁ, বব হার্ডি বড়ো জব্বর কাপ্তেন!

বব হার্ডি নামটা শুনে আয়ারটন চমকে উঠল অষ্ট্রেলিয়ায় থাকার সময় বব হার্ডিই কয়েদিদলের মধ্যে তার ডান-হাত ছিল। বব হার্ডি দুর্দান্ত সাহসী, একেবারে বেপরোয়া। নাবিক হিশেবেও খুব নিপুণ। অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলে নরফোক আইল্যাণ্ডে বব হার্ডি স্পীডি জাহাজটি দখল করে। জাহাজের মধ্যে বন্দুক, কামান, গুলি-বারুদ, অন্যান্য হাতিয়ার, খাবারদাবার, যন্ত্রপাতি-কিছুরই অভাব ছিল না। হার্ডি তার কয়েদি সঙ্গীদের সাহায্যে জাহাজটি দখল করে প্রশান্ত মহাসাগরে লুঠতরাজ চালিয়ে বেড়াচ্ছে।

বোম্বেটেরা মদ খেয়ে এইসবই আলোচনা করছিল। তারা কোনদিন কোনখানে কীকী করেছিল, সবই আয়ারটনের কানে এলো। এই নরফোক আইল্যাণ্ডেই দুর্দান্ত সব

ইংরেজ। কয়েদিদের নির্বাসিত করা হত। বোম্বেটেদের অনেকেই ছিল পলাতক ইংরেজ কয়েদি। বেশির ভাগ বোম্বেটে ছিল জাহাজের পিছন দিকে। কয়েকজন যাত্রী ছিল ডেকের উপরে। তারাই এইসব কথা বলাবলি করছিল। আয়ারটন জানতে পারলে, বোম্বেটে জাহাজটা দৈবাৎ এই দ্বীপটিতে এসে পড়েছে। ব হার্ডি এই দ্বীপে আগে কখনো আসেনি। সমুদ্রপথে দ্বীপটা দেখতে পেয়ে দ্বীপে নেমে দেখার সাধ হয়েছে। উপযুক্ত মনে করলে সে এখানেই ঘাঁটি করবে।

সাইরাস হার্ডিং আর তার সঙ্গীদের দৌলতে দ্বীপের বর্তমান অবস্থা এমনি লোভনীয় হয়েছে যে আয়ারটন বুঝতে পারলে, এই দ্বীপে একবার নামলে ব হার্ডি আর এখান থেকে নড়তে চাইবে না। সুতরাং বোম্বেটেদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। লড়াই ব্যতীত অন্যকোনো পথ সামনে খোলা নেই। এদের একেবারে নির্মূল করে ফেললেও অন্যায় হবে না। কিন্তু লড়াইয়ের আগে জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র আর লোকসংখ্যা জানতে হবে। আয়ারটন ঠিক করলে, যে করেই হোক এই খবরটা নিতেই হবে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজের বেশির ভাগ লোক ঘুমিয়ে পড়ল। জাহাজের ডেক অন্ধকার। এই অন্ধকারের সুযোগটাই নিলে আয়ারটন। ডেকের উপরে গেল সে। ডেকের উপর ইতস্তত পড়ে আছে বোম্বেটেরা, ঘুমে অচৈতন্য। খুব সাবধানে আয়ারটন চারদিকে ঘুরে দেখল। জাহাজে চারটে কামান আছে, সবগুলোই আধুনিক ও মারাত্মক। ডেকের উপর দশজন লোক ঘুমিয়ে আছে, অন্যরা সম্ভবত নিচে।

কথাবার্তা শুনে আয়ারটন জানতে পেরেছিল জাহাজে পঞ্চাশ জন লোক আছে। ছজন দ্বীপবাসীর পক্ষে নেহাৎ ফ্যালনা নয়। আয়ারটন মনে-মনে একটু সংকল্প করলে। এতে

তার প্রাণ যাবে বটে, কিন্তু অন্যরা নিরাপদ হবেন। সে ঠিক করলে, বারুদ–ঘরে আগুন দিয়ে জাহাজটা সে উড়িয়ে দেবে। অবশ্য বোম্বেটেদের সঙ্গে তারও প্রাণ যাবে, কিন্তু তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হবে।

বারুদ-ঘর যে জাহাজের নিচে পিছন দিকে থাকে, নাবিক আয়ারটন তা জানত। পা টিপেটিপে সেদিকে চলল সে। মাস্তুলের কাছে গিয়ে দেখল, সেখানে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। মাস্তুলের চারদিকে পিস্তল, বন্দুক ও অন্য-সব হাতিয়ার একটা র্যাকের মধ্যে সাজানো। সেই র্ল্যাক থেকে একটা পিস্তল তুলে নিলে আয়ারটন। জাহাজ উড়িয়ে দিতে এই পিস্তলটাই যথেষ্ট। তারপর চুপি-চুপি নিচে নেমে বারুদ-ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হল সে। বারুদঘরের দরজায় তালা দেয়া। আয়ারটনের গায়ে জোর ছিল অসাধারণ। তালাটি ধরে সজোরে চাপ দিতেই তালা ভেঙে দরজা খুলে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে পিছন থেকে একটা হাত এসে পড়ল আয়ারটনের কাঁধে। আয়ারটনের মুখের উপর আলো ফেলে ঢ্যাঙা একটা লোক কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে : তুমি এখানে কী করছো?

আয়ারটন তক্ষুনি লোকটাকে চিনতে পারলে। সে আর কেউ নয়, স্বয়ং বব হার্ডি। ব হার্ডি অবশ্য আয়ারটনকে চিনতে পারলে না। সে জানতো, আয়ারটন অনেকদিন আগেই মারা গেছে। আয়ারটনের কোমরবন্ধ ধরে বব হার্ডি আবার জিগেস করলে : কী করছো তুমি এখানে?

এ-কথার উত্তর না দিয়ে আয়ারটন এক হঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত করে নিলে। বব হার্ডি চীৎকার করে উঠল : কে আছো, তোমরা শিগগির এসো!

চীৎকার শুনে দু-তিনটে বোম্বেটে জেগে উঠল। তারা এসেই আয়ারটনকে পাকড়াবার চেষ্টা করলে। আয়ারটন পিস্তলের বাঁটের আঘাতে দুটি বোম্বেটেকে ধরাশায়ী করলে, কিন্তু তৃতীয় বোম্বেটের ছুরি এসে বিধল তার কাঁধে। এদিকে বব হার্ডি বারুদ-ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ডেকের উপর বোম্বেটের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

আয়ারটন বেগতিক দেখে পালাবার মৎলব আঁটলে। আয়ারটন পর-পর দুটো গুলি ছুঁড়ল, একটা ব হার্ডিকে লক্ষ্য করে; কিন্তু হার্ডির তাতে অনিষ্ট হল না। শত্রুপক্ষ আচমকা এভাবে আক্রান্ত হয়ে বেজায় ঘাবড়ে গিয়েছিল। সেই সুযোগে আয়ারটন পিস্তল ছুঁড়ে লণ্ঠন চুরমার করে দিয়ে ডেকে ওঠবার সিঁড়ির দিকে ছুটল। অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় আয়ারটনের সুবিধেই হল। সেই মুহূর্তে দু-তিনটে বোম্বেটে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিল। আয়ারটনের চতুর্থ গুলিতে একটা বোম্বেটে শেষ হল। অন্যরা হকচকিয়ে সরে গেল। তক্ষুনি আয়ারটন একলাফে ডেকের উপর উঠে এলো। বাকি দুটি গুলিতে একটি বোম্বেটেকে খতম করে আয়ারটন জাহাজের রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। জাহাজ থেকে ছ-সাত ফুট যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে চারদিকে মুহুর্মুহু বন্দুকের গুলি পড়তে লাগল।

এতগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনে পেনক্র্যাফট খুব বিচলিত হয়ে উঠল। চিমনি থেকে অন্যরাও সমস্ত শুনতে পেয়েছিলেন। সবাই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সমুদ্রতীরে ছুটে এলেন। আয়ারটন যে ধরা পড়ে মারা গেছে, সে-বিষয়ে তাদের কোনো সন্দেহ রইল না।

দুর্ভাবনার মধ্য দিয়ে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। বন্দুকের আওয়াজও বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু পেনক্র্যাফট কিংবা আয়ারটনের কোনো দেখা নেই। তবে কি দস্যুরা এসে উপদ্বীপটিই আক্রমণ করেছে? পেনক্র্যাফট আর আয়ারটনের সাহায্যের জন্যে কি তাদের

যাওয়া উচিত নয়? কিন্তু যাবেন কী করে? তখন ভরা জোয়ার। প্রণালী পেরুনো অসম্ভব।

নৌকোটাও অন্য তীরে রয়েছে। হার্ডিংদের দারুণ দুর্ভাবনা হল।

অবশেষে রাত প্রায় বারোটার সময় পেনক্র্যাফট ও আহত আয়ারটন নৌকো করে এপারে এসে হাজির হল। তাদের দেখে সবাই জড়িয়ে ধরলেন।

তক্ষুনি সবাই গিয়ে চিমনিতে আশ্রয় নিলেন। সেখানে গিয়ে আয়ারটন সবকিছু খুলে বললে। বোম্বেটে-জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে যে-ফন্দি করেছিল, তাও বলতে বাকি রাখলে না। সবাই আয়ারটনের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

দ্বীপবাসীদের অবস্থা এখন রীতিমতো সঙিন। বোম্বেটেরা জানতে পেরেছে যে, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে লোক আছে। তারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দল বেঁধে দ্বীপে নেমে আসবে। তখন লড়াই। অনিবার্য। সে-লড়াইয়ে হার হলে চরম সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

পেনক্র্যাফট বললে, আমাদের আর রেহাই নেই! ওরা পঞ্চাশ জন, আর আমরা মাত্র ছ-জন।

হ্যাঁ, বললেন হার্ডিং : আমরা ছ-জনই, তবে–

তবে কী? শুধোলেন স্পিলেট : আর কেউ আছে নাকি আমাদের দলে? সাইরাস হার্ডিং নীরবে আকাশের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন। মুখ ফুটে বললেন রহস্যময় সেই অজ্ঞাত শক্তির কথা, যে এতদিন তাদের উপকার করে এসেছে।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। চিমনিতে থেকেই চারদিকে দৃষ্টি রাখলেন সবাই। দস্যরা দ্বীপে নামবার কোনো চেষ্টা করলে না। আয়ারটনকে গুলি করবার পর থেকেই জাহাজ নীরব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। হয়তো চলেই গেছে। আসলে কিন্তু যায়নি। অন্ধকার ফিকে হলে পর কুয়াশার মধ্য দিয়ে দূরে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল বোম্বেটেদের স্পীডিকে।

এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুয়াশা যতক্ষণ আছে ততক্ষণই বাঁচোয়া। কেননা, কুয়াশার দরুন বোম্বেটেরা তাদের কোনো কাজই দেখতে পাবে না। এখন তাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে বোম্বেটেদের বুঝতে দেয়া যে, দ্বীপবাসীদের সংখ্যা বেশি—তারা বোম্বেটেদের বাধা দিতে সক্ষম।

ঠিক হলদ্বীপবাসীরা তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবেন। একদল থাকবে চিমনিতে, একদল মার্সি নদীর মুখে, আর তৃতীয় দল উপদ্বীপে। বোম্বেটেরা যখন দ্বীপে নামতে চাইবে, তখন সেখানে তাদের বাধা দিতে হবে। প্রত্যেকে একটা করে বন্দুক নেবেন। গুলি-বারুদও যথেষ্ট আছে। পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে বোম্বেটেদের আক্রমণের ভয় থাকবে না। এবং গ্র্যানাইট হাউসে কেউ না-থাকলে সেটা বরং শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। ভয়ের কারণ আছে শুধু একটাই। এমনও হতে পারে যে, শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করাটা অনিবার্য হয়ে উঠল। যাতে মুখোমুখি লড়াই করতে না-হয়,

সেজন্যে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। সেজন্যে সবসময়েই আড়াল থেকে লড়াই করতে হবে। দরকার হলে গুলি চালাতে হবে। কিন্তু লক্ষ্যটি যেন সবসময়েই ঠিক হয়, সেদিকে রাখতে হবে তীক্ষ্ণ নজর। কেননা অযথা গুলি নষ্ট করা চলবে না। এই ব্যবস্থা-মতো যাতে কাজ করা যায় সেইজন্যে নেব আর পেনক্র্যাফট তক্ষুনি গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ গুলি-বারুদ নিয়ে এলো। গিডিয়ন স্পিলেট আর আয়ারটনের বন্দুকের হাত নিখুঁত, তাদেরই রাইফেলদুটো দেয়া হল। হার্ডিং, পেনক্র্যাফট, নেব আর হার্বার্টের হাতে রইল বাকি চারটে বন্দুক। হার্বার্টের সঙ্গে হার্ডিং রইলেন চিমনিতে। এখান থেকে গ্র্যানাইট হাউসের তলা পর্যন্ত সমস্ত দেখতে পাওয়া যাবে। নেবকে নিয়ে গিডিয়ন স্পিলেট গেলেন মার্সি নদীর মুখে। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট উপদ্বীপে গিয়ে দু-জায়গায় অপেক্ষা করবে। এইভাবে চারটে আলাদা-আলাদা জায়গা থেকে বন্দুকের আওয়াজ হতে থাকলে বোম্বেটেরা ভাববে দ্বীপে অনেক লোক আছে, এবং তারা আত্মরক্ষায় আদৌ অপারগ নয়। উপদ্বীপে যদি এর মধ্যেই বোম্বেটেরা নেমে পড়ে, আর তারা যদি বাধা দিতে না-পারে, কিংবা যদি মনে করে যে বোম্বেটেরা তখন ফেরার পথ আটকে ফেলতে পারে, তাহলে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট সঙ্গে-সঙ্গেই নৌকো করে ফিরে আসবে বলে ঠিক হল। এই ব্যবস্থার পর যে-যার জায়গায় রওনা হওয়ার আগে সবাই একে আরেকের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন, তারপর যে-যার জায়গায় চলে গেলেন।

তখন রাত ভোর হয়েছে। বেলা ছ-টা বাজে। একটু পরেই কুয়াশা পরিষ্কার হতে শুরু হল। বোম্বেটে-জাহাজটা এখন বেশ স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কালো নিশানটা মাস্তুলে উড়ছে। দুরবিন দিয়ে সাইরাস হার্ডিং দেখতে পেলেন, কামানের নলগুলো দ্বীপকে লক্ষ্য করে বসানো। হুকুম পেলেই শুরু হবে তার তাণ্ডব দাপট। স্পীডি তখনো নীরব। প্রায়

তিরিশ জন বোম্বেটে ডেকের উপর হাঁটাহাঁটি করছে। দুটি লোক দুরবিন দিয়ে দেখছে। লিঙ্কন আইল্যাণ্ডকে।

রাত্রে জাহাজে যে-ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে, বোম্বেটেরা তা তখনো ভালো করে বুঝে উঠতে পারেনি। লোকটা বারুদ-ঘরের দরজা ভেঙেছিল। তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি নেহাৎ কম হয়নি। তার গুলিতে একজন বোম্বেটে মারা গেছে, আর দু-জন আহত হয়েছে। লোকটি কি বোম্বেটেদের গুলি খেয়েও নিরাপদে ফিরে গেছে? লোকটি এলো কোত্থেকে? উদ্দেশ্যই বা কী ছিল? বব হার্ডির বিশ্বাস, লোকটি এসেছিল বারুদে আগুন দিয়ে জাহাজ উড়িয়ে দেয়ার জন্যে। সত্যিই কি তাই ছিল উদ্দেশ্য? কে জানে! তবে একটা ব্যাপার স্পষ্টই বোঝা গেল যে, এই অজ্ঞাত দ্বীপটাতে লোকজন আছে। হয়তো তারা সংখ্যায় নেহাৎ কম নয়। হয়তো তারা দ্বীপটা রক্ষা করতে সক্ষম। কিন্তু সমুদ্রসৈকতে কিংবা পর্বত-চূড়োয়–কোথাও তো কাউকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। সমুদ্রতীরও নির্জন। তবে কি লোকজন। দ্বীপের মধ্যে পালিয়ে গেছে, না আক্রমণের মৎলব আঁটছে? কে জানে! দেখাই যাক কী হয়।

এমনি করে দেড় ঘণ্টা কেটে গেল। শেষে যখন দ্বীপের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না, তখন একটা নৌকো ভাসিয়ে তাতে সাতজন বোম্বেটে চড়ে বসল। তাদের সঙ্গে বন্দুক আছে। একজনের হাতে আছে জল মাপবার দড়ি। চারজন বোম্বেটে বসেছে দাঁড়ে, অন্য দুজন বন্দুক হাতে করে নৌকোর মুখের কাছে হাঁটু গেড়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। তাদের উদ্দেশ্য শুধু খবর নেয়া। নামবার মৎলব থাকলে নিশ্চয় সংখ্যায় আরো বেশি হত। নৌকোর গতি দেখে বোঝা গেল, বোম্বেটেরা ঠিক করেছে প্রণালীর মধ্যে প্রবেশ না-করে উপদ্বীপটায় গিয়ে নামবে।

পাহাড়ের আড়াল থেকে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট দেখতে পেলে, নৌকো ঠিক তাদের দিকেই আসছে। তারা অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে নৌকো বন্দুকের পাল্লার মধ্যে আসে।

আস্তে-আস্তে, খুব সতর্কভাবে এগুতে লাগল নৌকো। তখন দেখা গেল, একজনের হাতে শিসে-বাঁধা দড়ি-সে মার্সি নদীর মুখে প্রণালীর গভীরতা মেপে দেখছে। তাতে মনে হল বব হার্ডির ইচ্ছে—জাহাজটাকে তীরের যথাসম্ভব কাছে আনা। নৌকো যখন উপদ্বীপ থেকে সাত-আটশো হাত দূরে, তখন থামল। হালের লোকটি উঠে দাঁড়ালে, তীরে নামবার মতো জায়গা পাওয়া যায় কি না দেখতে। ঠিক সেই মুহূর্তে দু-বার গর্জন করে উঠল বন্দুক, ধোঁয়া উঠল পাহাড়ের আড়াল থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে হালের লোকটি আর যে জল মাপছিল—দুজনেই চিৎপটাং হয়ে নৌকোর মধ্যে পড়ে গেল। এর ঠিক পরক্ষণেই জাহাজ থেকে গর্জে উঠল কামান। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গোলা এসে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফটের মাথার উপরের পাহাড়ের চুড়োটাকে ভেঙে একেবারে চুরমার করে দিলে। সৌভাগ্যবশত তাদের দুজনের তাতে কোনো অনিষ্ট হল না।

এদিকে মহা গণ্ডগোল বাধল নৌকোয়। হালের লোকটির জায়গায় আরেকজন এসে বসে নৌকোর মুখ ফেরালে।

এ-রকম অবস্থায় জাহাজে ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক, কিন্তু নৌকো জাহাজের দিকে রওনা হল না, এবার চলল মার্সি নদীর মুখের দিকে। ওদের মৎলব হল প্রণালীতে ঢুকে আয়ারটন আর পেনক্র্যাফটের ফেরার পথ এমনভাবে আটকে ফেলবে, যাতে তারা

জাহাজের কামান আর নৌকোর বন্দুকের মাঝখানে পড়ে যাবে। বোম্বেটেদের মৎলব বুঝতে পেরেও আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট তাদের আশ্রয়টা ছাড়ল না। মার্সি নদীর মুখে আছেন স্পিলেট আর নেব, চিমনিতে রয়েছেন হার্ডিং আর হার্বার্ট। তাদের উপর নির্ভর করেই ওরা দুজনে লুকিয়ে রইলে। কুড়ি মিনিট পরে বোম্বেটেদের নৌকো যখন মার্সি নদীর মুখ থেকে চারশো হাত দূরে, তখন জোয়ার শুরু হল। নৌকো বুঝি-বা মার্সি নদীর মধ্যেই ঢুকে পড়ে। বোম্বেটেরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে কোনোমতে নৌকোটাকে প্রণালীর মাঝখানেই রাখলে বটে, কিন্তু মার্সি নদীর মুখের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ দুটো গুলি এসে দস্যুদের আরো দুজনকে নৌকোর মধ্যে শুইয়ে দিলে নেব আর স্পিলেট দুজনেরই লক্ষ্য হয়েছিল অব্যর্থ। ধোঁয়া লক্ষ্য করে তক্ষুনি জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠল বটে, কিন্তু পাথর চুরমার করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারলে না।

নৌকোয় এখন মাত্র তিনজন বোম্বেটে কার্যক্ষম। স্রোতের টানে তীরের মতো ছুটল নৌকো।

নৌকোটা সাইরাস হার্ডিং আর হার্বাটের সামনে দিয়েই গেল, কিন্তু পাল্লার বাইরে ছিল বলে তাঁরা গুলি করলেন না। নৌকো উপদ্বীপের উত্তর দিক ঘুরে দুটো দাঁড়ের সাহায্যে জাহাজের দিকে ফিরে চলল।

এ পর্যন্ত জয় হয়েছে দ্বীপবাসীদের। শত্রুদের চারজন লোক একেবারে যদি না-ও মরে থাকে, সাংঘাতিকভাবে যে আহত হয়েছে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। বোম্বেটেরা যদি এমনিভাবেই আক্রমণ করতে থাকে, যদি তারা আবার নৌকোয় চড়ে দ্বীপে নামবার চেষ্টা করে, তাহলে একটা-একটা করে তাদের খতম করতে পারা যাবে।

আধঘণ্টা পরে নৌকোটা গিয়ে জাহাজের গায়ে ভিড়লে। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজে ভয়ানক শোরগোল চাচামেচি শুরু হয়ে গেল। রাগে আগুন হয়ে তক্ষুনি বারো জন নতুন দস্যু লাফিয়ে পড়ল নৌকোয়। জাহাজ থেকে আরেকটা নৌকো নামানো হল, তাতে চড়ল আটজন লোক। প্রথম নৌকো ফের উপদ্বীপের দিকে চলল, দ্বিতীয় নৌকো চলল মার্সি নদীর মুখটা দখল করবার জন্যে।

আয়ারটন আর পেনক্র্যাফটের অবস্থা খুব বিপজ্জনক হয়ে পড়ল। প্রণালী পেরিয়ে দ্বীপে চলে-যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

তবু প্রথম নৌকোটা রাইফেলের পাল্লায় না-আসা পর্যন্ত তারা চুপ করে রইলে। নৌকো পাল্লায় আসার সঙ্গে সঙ্গে দুটো গুলি ছুটে গিয়ে নৌকোর লোকজনদের ছত্রভঙ্গ করে দিলে। তারপর আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট আশ্রয় ছেড়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। তাদের উপর দিয়ে, চারপাশ দিয়ে মুহুর্মুহু গুলি ছুটল শত্রুপক্ষের, তবু একবারও ভ্রুক্ষেপ করলে না তারা—লাফ দিয়ে গিয়ে উঠল নৌকোয়, তারপর প্রণালী পেরিয়ে একেবারে চিমনির আশ্রয়ে গিয়ে হাজির হল। এদিকে দ্বিতীয় নৌকো মার্সি নদীর মুখের কাছে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ফের গর্জে উঠল বন্দুক। নৌকোর আটজন লোকের মধ্যে দুজন স্পিলেট আর নেবের গুলিতে ছিটকে পড়ল জলে। নৌকোটাও স্রোতের টানে জলের নিচের পাথরে লেগে মার্সির মুখের কাছে ডুবে গেল। যে ছ-জন দস্যু বেঁচে ছিল, তারা হাত উঁচু করে জল পার হল। তারপর মার্সি নদীর ডান পার ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ফ্লোটসাম পয়েন্টের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

চিমনিতে ঢুকেই প্রশ্ন করলে পেনক্র্যাফট : ক্যাপ্টেন, এখন অবস্থাটা কী-রকম দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন?

এখন লড়াইটা একটু নতুন ধরনের হবে, বললেন হার্ডিং : কারণ বোম্বেটেরা বোকা নয়। এমন-একটা অসুবিধের অবস্থায় তারা বেশিক্ষণ থাকবে না। জোয়ারের সময় হয়তো তারা জাহাজ নিয়েই ঢুকবে প্রণালীতে। তখন বন্দুক দিয়ে কামানের সঙ্গে লড়াই চালানো বড়ো সুবিধের হবে না। কামানের গোলার মুখে আমাদের আশ্রয়গুলো তখন আর নিরাপদ থাকবে না।

এমন সময় চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : জাহান্নমে যাক শয়তানগুলো! ওরা দেখছি সত্যিই জাহাজের নোঙর তুলতে শুরু করেছে। এবার গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে আমাদের আশ্রয় নেয়া উচিত।

আরেকটু অপেক্ষা করে দেখা যাক, কী হয়–বললেন হার্ডিং : কেননা, নেব আর স্পিলেট তো এখনও ওখানে থেকে গেলেন। অবশ্য তারা উপযুক্ত সময়েই এখানে এসে পড়বেন! আয়ারটন, তুমি তৈরি হয়ে নাও। তোমার আর মিস্টার স্পিলেটের বন্দুকের হাতের পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে।

সত্যই দেখা গেল, স্পীডি উপদ্বীপটার দিকে রওনা হওয়ার জন্যে একেবারে প্রস্তুত। জোয়ার শুরু হলেই প্রণালীর দিকে আসবে। কিন্তু প্রণালীতে প্রবেশ করা সম্পর্কে পেনক্র্যাফটের তখনো সন্দেহ ছিল।

এমন সময় আয়ারটন চেঁচিয়ে উঠল : ব্যাপার সাংঘাতিক! স্পীড়ি রওনা হয়েছে!

তখন হাওয়া ছিল দ্বীপের দিকে। স্পীড়ি পাল খাঁটিয়ে দ্বীপের দিকে আসতে লাগল। এত কাছে কামানের মুখে দ্বীপবাসীদের ভরসা কী! বন্দুক ছুঁড়ে আর-কোনো লাভ হবে না। তাহলে দস্যুদের বাধা দেয়া যায় কী করে?

সাইরাস হার্ডিং গোটা ব্যাপারটা ভেবে দেখলেন। গ্র্যানাইট হাউসে অবরুদ্ধ অবস্থায় কয়েক মাস পর্যন্ত থাকা যাবে, প্রচুর রসদ মজুত আছেন ভাড়ারে; কিন্তু তার পর কী হবে? বোম্বেটেরা তো দ্বীপের মালিক হয়ে বসলে সবকিছু তছনছ করে, ছারখার করে দেবে। এখন একটামাত্র আশা আছে। বব হার্ডি হয়তো প্রণালীতে ঢুকতে চেষ্টা করবে না, উপদ্বীপের বাইরেই থেকে যাবে। এত দূর থেকে কামানের গোলায় কোনো বিপদ হবে না।

কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ উপদ্বীপের কাছে এসে হাজির হয়েছে। তারপর ধীরে-ধীরে এগুতে লাগল প্রণালীর দিকে। এতক্ষণ পরে সব কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল। বব হার্ডি প্রণালীতে ঢুকে চিমনির উপর গোলা ছোড়বার মৎলব এঁটেছে।

দেখতে-দেখতে স্পীডি এসে মার্সি নদীর মুখে দাঁড়ালে। গিডিয়ন স্পিলেট দেখতে পেলেন, সেখানে থাকলে বিষম শোচনীয় অবস্থার সম্ভাবনা, তাই নেবকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চিমনিতে অন্য সকলের কাছে ফিরে এলেন। তাঁরা পাহাড়ের আড়ালে-আড়ালে চলে এসেছিলেন বলে কোনোরকমে শত্রুর গুলির হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন।

তাঁদের দেখেই হার্ডিং বললেন : আমরা লুকিয়ে-লুকিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে আশ্রয় নেবো ঠিক করেছি।

স্পিলেট বললেন : তবে আর দেরি কেন? শিগগিরই চলুন।

সবাই চিমনি ছেড়ে চললেন। পাথরের দেয়ালের একটা বাঁকের আড়ালে থাকার দরুন জাহাজের লোকেরা তাদের দেখতে পেলে না। লিফটে উঠে গ্র্যানাইট হাউসের ভিতর ঢুকতে পুরো এক মিনিটও লাগল না। টপ আর জাপকে আগেই গ্র্যানাইট হাউসে বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। সবাই জানলার লতাপাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন, স্পীড়ি ক্রমশ প্রণালীর ভিতরে আসছে আর অবিরাম গোলা চালিয়ে চলেছে। ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে চিমনির পাথর। তারা আশা করেছিলেন যে গ্র্যানাইট হাউস হয়তো বোম্বেটেদের নজর এড়িয়ে যাবে। সাইরাস হার্ডিং ভাগ্যিশ বুদ্ধি করে লতাপাতা দিয়ে জানলাগুলো বন্ধ করেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটা গোলা এসে গ্র্যানাইট হাউসের জানলায় লাগল।

চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট : সর্বনাশ! ওরা আমাদের দেখে ফেলেছে।

হয়তো-বা বোম্বেটেরা দ্বীপবাসীদের দেখতে পায়নি। অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণের দরুনই একটা গোলা আচমকা এসে জানলায় লেগেছে। এমন সময় হঠাৎ একটা তীব্র গভীর গর্জন, তার সঙ্গে-সঙ্গেই ভয়ানক আর্তনাদ শুনতে পাওয়া গেল। সবাই ছুটে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন, জাহাজটা জলস্তম্ভের মতো একটা জিনিশের উচ্চণ্ড আক্ষেপে হঠাৎ উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ফেটে দু-ভাগ হয়ে গেছে।

দশ সেকেণ্ডের মধ্যে স্পীডি খুনে বোম্বেটেদের নিয়ে অতল সমুদ্রগর্ভে ডুবে গেল। বিস্ময়ে গোল হয়ে গেল হার্বার্টের চোখ। অবাক গলায় সে বললে, স্পীডি উড়ে গেল!

তক্ষুনি পেনক্র্যাফট আর নেবের সঙ্গে সমুদ্রতীরের দিকে রওনা হয়ে পড়ল হার্বার্ট। এই ব্যাপারটা এত আকস্মিক, এত অকল্পনীয়ভাবে সংঘটিত হল যে কেউ তখনো গোটা ব্যাপারটা ঠিক-ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অন্য-সকলেও সংবিৎ ফিরতেই পেনক্র্যাফটের সঙ্গে চললেন। সমুদ্রতীরে পৌঁছে দেখা গেল, স্পীডির কোনো চিহ্নই নেই। সমুদ্রে। ব্যাপারটা আগাগোড়া তখনও সকলের বোধগম্য হতে চাইছিল না।

এমন সময় স্পিলেট প্রশ্ন করলেন : নৌকোটা ভেঙে যাওয়ার পর সেই ছটা বোম্বেটে যে মার্সির তীর দিয়ে পালিয়েছিল, তারা কোথায়? সবাই তখন সেইদিকে তাকালেন। কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না। হয়তো তারা তাদের জাহাজটার দুর্দশা দেখে দ্বীপের ভিতরে পালিয়ে গেছে।

হার্ডিং বললেন : ওদের কথা পরে ভাবা যাবে। ওদের হাতে বন্দুক আছে-এইটে ভারি সাংঘাতিক কথা। যাক, ওরাও ছ-জন—আমরাও ছ-জনই-সমান-সমান আছি দুদলই। কিন্তু ব্যাপারটা ভারি অপ্রত্যাশিত। ঠিক যেন অলৌকিক!

অলৌকিক বলে অলৌকিক! বললে পেনক্র্যাফট : বোম্বেটগুলো ঠিক সময়টাতেই ধ্বংস হয়েছে, নইলে গ্র্যানাইট হাউসে আর বেশিক্ষণ থাকা যেত না!

স্পিলেট বললেন : আচ্ছা পেনক্র্যাফট, ব্যাপারটা ঘটল কী করে বলো তো?

পেনক্র্যাফট বললে : কারণটা খুব সহজ। বোম্বেটে-জাহাজের তো আর যুদ্ধজাহাজের মতো আইনকানুন নেই! পলাতক কয়েদির দল তো আর শিক্ষিত নাবিক নয়! বারুদের ঘরটা ছিল খোলা, আর গুলি ছোড়বার সময় কখন হয়তো কোনো অসতর্ক লোকের হাত থেকে তাতে আগুন পড়ে গিয়েছিল। এ ছাড়া আর-কী কারণ থাকতে পারে?

হার্ডিং বললেন : আসল ব্যাপারটা বোধহয় আমরা ভাটার সময় জানতে পারবো। তখন তো ভাঙা জাহাজটা ভেসে উঠবে জলের উপর। একটু অপেক্ষা করেই দেখা যাক।

ইতিমধ্যে সবাই গ্র্যানাইট হাউসে গিয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করে আবার সমুদ্রতীরে ফিরে এলেন। স্পীডির কাঠামোটা আস্তে-আস্তে ভাসতে শুরু করল। কাৎ হয়ে পড়ে আছে জাহাজটা। তলাটা আগাগোড়া দেখতে পাওয়া যায়। জলের নিচে কী-যে একটা বিরাট তাণ্ডবের ক্রিয়া হয়েছিল, তা বোঝবার সাধ্য নেই। সেই শক্তিই জাহাজটাকে কাৎ করে উপরে জলস্তম্ভ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। সবাই জাহাজের চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

ভাঁটার সঙ্গে ক্রমে জাহাজটা ভেসে উঠলে পর সবাই, দুর্ঘটনার কারণটা না-হোক ফলটা দেখতে পেলেন। জাহাজের গলুইয়ের দিকে মুখ থেকে সাত-আট ফুট নিচে জাহাজের শরীরটার দু-পাশই চুরমার হয়ে গেছে। গলুই থেকে শুরু করে জাহাজের সমস্ত মেরুদণ্ড ফেটে জাহাজের শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। প্রায় কুড়ি ফুট জায়গা জুড়ে এতবড়ো ফুটো হয়েছে যে সে-ফুটো বন্ধ করা অসম্ভব। শুধু-যে তামার পাত আর তক্তা উড়ে গেছে তা নয়, পাতগুলোর আর মোটা-মোটা পেরেকগুলোরও কোনো অস্তিত্ব নেই। পেনক্র্যাফট আর আয়ারটন পরীক্ষা করে বললে যে জাহাজটাকে আর জলে ভাসানো অসম্ভব।

ততক্ষণে আরো জেগেছে জাহাজ। এবার সহজেই যাওয়া যাবে ডেকের উপরে। সবাই কুড়ল হাতে করে ডেকের উপরে গিয়ে উঠলেন। চুরমার হয়ে গেছে ডেক। নানান ধরনের বাক্স, প্যাকিং কেস ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। বেশিক্ষণ জলের নিচে থাকেনি বলে ভিতরের জিনিশপত্র শুকনো হওয়ারই কথা।

সবাই তখন মালপত্র নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনতে লাগলেন। অনেক দেরি আছে জোয়ারের। তার মধ্যেই সব কাজ গুছিয়ে নিতে হবে। আয়ারটন আর পেনক্র্যাফট খুঁজতেখুঁজতে একটা কপিকল আর দড়ি পেলে। তারই সাহায্যে বড়ো-বড়ো সিন্দুক আর পিপে নৌকোয় চালান করে নিয়ে যাওয়া হল। জাহাজে জিনিশ ছিল নানান রকমের। বাসনকোশন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি অজস্র রকম জিনিশ ছিল স্পীড়িতে। এতসব জিনিশ দেখে সকলের আনন্দের সীমা রইল না। হার্ডিং কিন্তু একটা জিনিশ লক্ষ করে ভারি অবাক হলেন। শুধু জাহাজের গলুইয়ের দিকটাই যে চুরমার হয়েছে তাই নয়, গলুইয়ের দিকে ভিতরের সবকিছুই নষ্ট হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, জাহাজের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বমশেল ফেটে গিয়েছে।

ক্রমে জাহাজের পিছনের দিকে গেলেন সবাই। আয়ারটনের কথামতো সেখানেই বারুদ-ঘরটা থাকার কথা। সাইরাস হার্ডিং আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে বারুদ-ঘরে আগুন লাগেনি, বারুদের পিপেগুলো ব্যবহারের উপযুক্ত আছে। সচরাচর কোনো লাইনিং-দেওয়া বাক্সের মধ্যেই থাকে বারুদ, যাতে সহজে নষ্ট হতে না-পারে। বারুদ-ঘরের রাশি-রাশি গোলাবারুদের মধ্য থেকে বিশটা বারুদের পিপে বার করা হল। পিপেলোর সবকটাই তামার লাইনিং দেয়া 1 পেনক্র্যাফট বুঝতে পারলে, বারুদ-ঘর ফেটে পীডি ধ্বংস হয়নি, বরং বারুদ-ঘর যেখানে ছিল সেই জায়গাটারই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে কম।

পেনক্র্যাফট বললে : বারুদ-ঘর তো আস্তই আছে দেখছি; তবে দুর্ঘটনাটা কী করে হল শুনি? আমি এ-কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে প্রণালীর জলে লুকোনো পাহাড়টাহাড় কিছু নেই। আমার মনে হয়, এই আশ্চর্য পরিত্রাণের আসল রহস্য আমরা কোনোদিনই বুঝতে

পারবো না।

অনুসন্ধানে বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল তাদের। এদিকে জোয়ার এসে গেল। এখন সব কাজ বন্ধ রাখতে হবে। জাহাজ জোয়ারের টানে ভেসে যাবে না, কেননা খুব গভীরভাবে তা বসে গিয়েছে। সুতরাং ভাবনার কিছুই রইল না; পরদিন এসে ফের কাজ শুরু করলেই চলবে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হল, আর-কোনোমতেই উদ্ধার করা যাবে না জাহাজটা। কাজে-কাজেই, যত শিগগির পারা যায় জাহাজের বাকি সরঞ্জামগুলো বাঁচাতে হবে।

তখন বিকেল পাঁচটা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে। সুতরাং সবাই খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন সব-আগে। জাহাজের মালগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সবাই। বেশির ভাগ বাক্সর মধ্যেই পোশাক-আশাক পাওয়া গেল, জুতো-মোজাও পাওয়া গেল। দেখে সবাই খুশি হয়ে উঠলেন। পিপে-পিপে গুলি-বারুদ, রাশি-রাশি বন্দুক, পিস্তল, চাষবাসের জিনিশ, ছুতোরের যন্ত্রপাতি, ফসলের বীজ-ভরা বাক্সকত-কী! আর সবই যেন একেবারে টাটকা। অল্প কিছুক্ষণ জলের নিচে থাকায় কিছুই নষ্ট হয়নি। গ্র্যানাইট হাউসের ভাড়ারে জায়গার অভাব নেই, কিন্তু সারাদিন

খেটেও এত-সব জিনিশ ভাড়ারে তোলা যাবে না। চিমনিতে এনেই রাখা হয়েছিল মালপত্র; রাত্রে সেগুলোকে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হল। সবাই পালা করে সারা রাত পাহারার কাজে ব্যস্ত রইলেন। পাহারার কারণ হল, স্পীড়ির ছ-জন বোম্বেটে যে দ্বীপের অরণ্যে লুকিয়ে আছে, তাদের কথা তো ভুলে গেলে চলবে না!

উনিশে, বিশে আর একুশে অক্টোবর—এই তিন দিন ওই ভাঙা জাহাজ থেকে দরকারি জিনিশপত্র সংগ্রহ করতেই কেটে গেল। স্পীডির কল্যাণে লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অস্ত্রাগার পূর্ণ হল। গ্র্যানাইট হাউসের ভাড়ার জিনিশপত্রে ভরে গেল। স্পীডির কামান চারটেও উদ্ধার করা সম্ভব হল। পেনক্রাফটের উৎসাহের শেষ নেই। এর মধ্যেই ঠিক করে ফেললে, গ্র্যানাইট হাউসে কামান চারটে বসিয়ে নেবে, আর তাহলে ভবিষ্যতে কোনো জাহাজের সাধ্য হবে না দ্বীপের সামনে আসতে।

মালপত্র সমস্ত জাহাজ থেকে নামানোর পর, তেইশে অক্টোবর রাত্রের দুর্যোগে বাকি জাহাজটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেজন্যে অবশ্য কারুই আপশোশের কোনো কারণ ছিল না।

স্পীড়ি জাহাজের দুর্ঘটনার পর, ভাটার সময়েও দুর্ঘটনার নিগূঢ় রহস্যের কোনো কারণ বোঝা যায়নি। রহস্যটা হয়তো অজ্ঞাতই রয়ে যেতো, কিন্তু তিরিশে নভেম্বরের একটা ঘটনায় তার নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

নেব সমুদ্র-সৈকত দিয়ে আসছিল। পথে লোহার একটা মোটা চোঙা দেখতে পেল, তাতে বিস্ফোরণের চিহ্ন রয়েছে। হার্ডিং অন্য সকলের সঙ্গে চিমনিতে বসে কাজ করছিলেন। এমন সময় নেব সেই চোঙাটা সেখানে এনে হাজির করলে।

গভীর কৌতূহলের সঙ্গে নেবের হাত থেকে চোঙাটা নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন সাইরাস হার্ডিং। ক্রমশ তার মুখে মেঘ জমতে লাগল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন : স্পীডির ধ্বংসের কারণ এবার বোঝা গেল। এই চোঙাটাই সেই অদৃশ্য কারণ।

এই চোঙাটা স্পীডির ধ্বংসের কারণ! অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল পেনক্র্যাফট।

হ্যাঁ, কেননা–গম্ভীর কণ্ঠে হার্ডিং বললেন : চোঙাটা একটা টর্পেডোর অবশিষ্ট অংশ।

স্তম্ভিত হয়ে সবাই সমস্বরে বলে উঠলেন : টর্পেডোর অংশ।

হ্যাঁ, বললেন হার্ডিং: টর্পেডোটা কে জাহাজের তলা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিল, এই প্রশ্ন করলে উত্তরে শুধু এই বলতে পারি যে, আমি ছুঁড়িনি। কিন্তু এটা কেউ-না-কেউ ছুঁড়েছিল, এবং দ্বীপে এক অতুলনীয় শক্তির পরিচয়ও তোমাদের অজানা নেই। এর দৌলতেই বোম্বেটেদের হাত থেকে আশ্চর্যভাবে পরিত্রাণ পেয়েছি আমরা।

.

৩.২ হার্বার্ট আহত

টর্পেডোটা দেখে বিস্ফোরণের সব বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল। আমেরিকার লড়াইয়ের সময় সাইরাস হার্ডিং নিজে পরীক্ষা করে দেখেছেন, টর্পেডোর ধ্বংসকারী শক্তি কীরকম সাংঘাতিক! এই শক্তির দরুনই প্রণালীর জলে সৃষ্টি হয়েছিল অসংখ্য উচ্চণ্ড জলস্তম্ভের। জাহাজের তলাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পলকের মধ্যে সেটাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল। যে-টর্পেডো বিশাল যুদ্ধ-জাহাজকে চোখের নিমেষে ধ্বংস করে ফ্যালে, তার কাছে স্পীডি তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটা বস্তু মাত্র।

হ্যাঁ, নিষ্পত্তি হল বিস্ফোরণ রহস্যের। কিন্তু প্রশ্ন হল, জলে টর্পেডো এলো কী করে?

সাইরাস হাডিং গম্ভীর স্বরে সবাইকে বললেন : লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে আমাদের হিতৈষী একজন কেউ যে গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই রইল না এখন। এই নিয়ে কতবার যে তিনি আমাদের রক্ষা করলেন, তার ইয়ত্তা নেই। এমনভাবে লুকিয়ে থেকে আমাদের উপকার করবার যে কী উদ্দেশ্য তাঁর, তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আয়ারটনও তার কাছে বিশেষ ঋণী। বোতলে যে-চিঠিতে আয়ারটনের আর টেবর আইল্যাণ্ডের অবস্থান জানিয়ে দেয়া ছিল, তা তারই কাজ। বেলুন থেকে যখন পড়ে গিয়েছিলুম, তখন তিনিই ঢেউয়ের মধ্য থেকে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন। ফ্লোটসাম পয়েন্টে মালপত্র-ভরা সিন্দুকটি তিনিই রেখেছিলেন। পিকারির পেটে যে-গুলি পাওয়া গিয়েছিল, সেও তার কাজ প্রসপেক্ট হাইটের উপরেও তিনিই আগুন জ্বালিয়েছিলেন। এককথায়, এ পর্যন্ত যতগুলো অলৌকিক, রহস্যময় ঘটনা দ্বীপে ঘটেছে, যা দেখেশুনে আমরা তাজ্জব হয়ে গেছি সমস্তই তার কাজ। তিনি যেই হোন না কেন, আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তার ঋণ আমাদের শোধ করা কর্তব্য।

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন ক্যাপ্টেন, বললেন স্পিলেট : এই অপরিচিত উপকারীর ক্ষমতা অমানুষিক! গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর মধ্য দিয়ে উঠেই কি ইনি আমাদের কথাবার্তা পরামর্শ সব শোনেন? সিন্ধুঘোটকটাকে মেরে ইনিই কি টপকে বাঁচিয়েছিলেন? আপনাকেও কি উদ্ধার করেছিলেন ইনি? সব দেখে-শুনে তো তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু তাহলে কি ইনি আমাদের মতো রক্তমাংসের মানুষ?

হার্ডিং বললেন : হ্যাঁ, সত্যিই এর ক্ষমতা অতিমানবিক। এখনো অবশ্য অনেক রহস্য জানতে বাকি আছে। এঁর সন্ধান করতে পারলে সবকিছুই স্পষ্ট হবে। এখন কথা হচ্ছে, এই উপকারী বন্ধুটিকে কি খুঁজে বার করা উচিত? না, তার ইচ্ছেমতো তাকে গোপনে থাকতে দেওয়াই কর্তব্য? তোমরা কী বলে?

নেব বললে : আমার মনে হয়, তার যখন ইচ্ছে হবে তখন তিনি নিজেই দেখা দেবেন। তা না-হলে হাজার খুঁজেও আমরা তার দেখা পাবো না।

আমারও তাই মনে হয়, বললেন স্পিলেট : কিন্তু তাই বলে আমরা তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবো না কেন? তার দেখা হয়তো পাবো না, কিন্তু তার প্রতি আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে।

এবার আয়ারটন কথা বলল। সে বললে : আমার মনে হয়, এই অজ্ঞাত ব্যক্তিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে বার করা উচিত। হয়তো তিনি একলা থাকার দরুন কষ্ট পাচ্ছেন।

তবে এই কথাই ঠিক হল বললেন হার্ডিং : যত-শিগগির-সম্ভব তাকে খুঁজতে শুরু করবো। দ্বীপের কোনো জায়গাই বাকি রাখব না। গুহা, গহ্বর—সবখানেই খুঁজে দেখবো।

এরপর কিছুদিন সবাই চাষবাসে মন দিলেন। আর পেনক্র্যাফট গ্র্যানাইট হাউসের সামনে কামান চারটে বসানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তার অনুরোধে কপিকলের সাহায্যে কামান চারটে গ্র্যানাইট হাউসে তুলে নেয়া হয়েছিল। জানলাগুলোর মাঝখানে ফুটো করে কামান বানোর ঘর করা হল। কামানগুলোকে ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে সাজানোর পর গ্র্যানাইট হাউস যেন রীতিমতো একটা দুর্গ হয়ে উঠল।

আটই নভেম্বর কামানগুলোর পাল্লা কতদূর পর্যন্ত, তা পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা করা হল। চারটে কামানেই বারুদ পুরে দেয়া হল। অবশ্য বারুদের পরিমাণ হার্ডিংই ঠিক করে দিলেন। প্রথম কামানের গুলি উপদ্বীপের উপর দিয়ে সমুদ্রে যেখানে পড়ল, সে-জায়গাটা কত দূরে তা ঠিক-ঠিক বোঝা গেল না। ফ্লোটসাম পয়েন্টের কাছে যে-পাহাড়ের চুড়োটা ছিল, সেটা ছিল গ্র্যানাইট হাউস থেকে তিন মাইল দূরে। দ্বিতীয় কামানের গুলি সেই চুড়োটাকে চুরমার করে দিল। ইউনিয়ন উপদ্বীপের কাছে যে বালিময় বেলাভূমি ছিল, সে-জায়গাটা গ্র্যানাইট হাউস থেকে ছিল বারো মাইল দূরে। তৃতীয় কামানের গুলি বেলাভূমির উপরের বালি উৎক্ষিপ্ত করে সেখান থেকে লাফিয়ে সমুদ্রের জলে পড়ল। চতুর্থ কামানের গুলি পাঁচ মাইল দূরে ম্যাণ্ডিবল অন্তরীপের পাহাড়ে পাথর ভেঙে সমুদ্রের জলে পড়ল। কামানের পাল্লা দেখে সবাই খুশি হলেন। এবার আর কোনো ভয় নেই।

এবার সকলের প্রধান কর্তব্য হল অনুসন্ধানের কাজ। এই কাজের পিছনে দুটি উদ্দেশ্য। এক নম্বর হল সেই অজ্ঞাত উপকারী বন্ধুকে খুঁজে বার করা, আর দু-নম্বর হল সেই সঙ্গে সেই ছ-টি বোম্বেটেরও খোঁজখবর নেয়া। অনুসন্ধানে নেহাৎ কম সময় লাগবে না। কাজে-কাজেই গাড়ি বোঝাই করে রসদপত্র নিতে হবে। কিন্তু একটা ওনাগার পা খোঁড়া

ছিল, দু-একদিন অপেক্ষা না-করে সেটাকে দিয়ে গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, সেটাকে কয়েকদিন জিরোতে দিতে হবে। তাই বিশে নভেম্বর পর্যন্ত যাত্রা বন্ধ রাখতে হল। সবাই ঠিক করলেন এ-কদিনে প্রসপেক্ট হাইটের কাজগুলো শেষ করবেন। আয়ারটনকেও একবার কোর‍্যালে যেতে হবে। সেখানে দু-দিন থেকে জন্তুগুলোর খাবারের ব্যবস্থা করে আবার সে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে আসবে বলে ঠিক হল।

নয়ই নভেম্বর ভোরবেলা আয়ারটন কোর্যাল অভিমুখে যাত্রা করলে। একটা ওনাগা জুতে গাড়িটাও তার সঙ্গে নিলে। যাওয়ার আগে হার্ডিং তাকে জিগেস করেছিলেন অন্যকাউকে সে সঙ্গে নিয়ে যাবে কি না। আয়ারটন কোনো সঙ্গী দরকার আছে বলে মনে করলে না। আপাতত তাে আর বিপদের কোনাে সম্ভাবনা নেই, একলা গেলেই যথেষ্ট। যদি অকস্মাৎ কোনাে বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয়, ঠিক হ'ল সে তখনি টেলিগ্রামে খবর দেবে। আযাবটন যাত্রা কবার দু-ঘণ্টা পরেই আপদ জানালে যে সে নিরাপদে কোব্যালে পৌঁছেছে, আর কোব্যালে কোনাে রকম গাােলমাল নেই।

আয়ারটন কোব্যালে চ'লে যাওয়ার দু-দিন পর দুপুরবেলার দিকে স্পিলেট প্রস্তাব করলেন : আয়ারটন তাে হয় আজ বিকেলে ফিরবে, নয় কাল ভােরে। এই ফাঁকে পাের্ট বেলুনে গিয়ে আমাদের বন-অ্যাডভেঞ্চারের হালটা দেখে এলে মন্দ হয় না। বােম্বেটেদেব চোখে বৃষ্টি পড়ে থাকে, তবে আমাদের বন-অ্যাডভেঞ্চারের যে কী দশা হয়েছে, কে জানে !

হাতে কোনাে কাজ না থাকায় পাের্ট বেলুন অভিমুখে রওনা হলেন সবাই-শুধ সাইবাস হার্ডিং আর নেব রইলেন গ্র্যানাইট হাউসে। দ্বীপের দক্ষিণ তীরে যাওয়ার পথটা ধ'রেই

সবাই চললেন। সকলের হাতেই টোটা-ভরা বন্দুক। সকলে খুব সতর্কও। পথের দু-ধারে তা দৃষ্টি রেখে, মধ্যে-মধ্যে বনের ভিতর ঢুকে বাম্বেটেদের খোঁজ নিতে-নিতে অবশেষে সবাই পোর্ট বেলুনে এসে হাজির হলেন।

বন্-অ্যাডভেঞ্চার নিরাপদেই আছে।

পেনক্র্যাফটের একটা মস্ত ভাবনা দূর হয়ে গেল। সে বলল : এটা আমাদের খুব সৌভাগ্যের বিষয় নিঃসন্দেহে। বাম্বেটেরা যদি এটা দেখতে পেতো, তবে নিশ্চয়ই এটায় চ'ড়ে চলে যেতো।। তাহলেই আর আমাদের টেবর আইল্যান্ডে যাওয়া হতো না। অথচ টেবর আইল্যান্ডে গিয়ে আয়ারটনের খবর আর লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের অবস্থান লিখে রেখে আসতে হবে, যাতে ডানকান এসে খবর জানতে পারে। নৌকোটা নিয়ে গেলেই সব পণ্ড হয়ে যেত।

সবাই নৌকোর উপর চড়ে দেখা লাগলেন।

পেনক্র্যাফট নোঙরের দড়িটা পরীক্ষা করে বলে উঠল : বা রে! এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার।

কী হয়েছে পেনক্র্যাফট? শুধোলেন স্পিলেট।

নোঙরের দড়িটায় গিঁট নতুন করে দেয়া। এ রকম গিঁট আমি কক্ষনো দিইনি। এই দেখুন।

তোমার তো ভুল হতে পারে। বললেন শিলেট : গিঁট তুমিই দিয়েছে, এখন ভুলে গেছো।

উঁহু, কক্ষনো না। দৃঢ় কণ্ঠে অস্বীকার করলে পেনক্র্যাফট : কিছুতেই হতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন না, এটা ফসকা গেরাে? আমি কক্ষনো ফসকা গোে গিঁট দিই না।

স্পিলেট বুঝতে পারলেন যে পেনক্র্যাফটের কথাটা সত্য নয়। কেউ-না-কেউ যে বন-অ্যাডভেনচারকে চালিয়ে এনে আবার বেঁধে রেখেছে, সে বিষয়ে কোনাে সন্দেহ নেই।

হার্বাট বললে : নৌকোটাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে মার্সির মুখের কাছে রাখলে হয় না? গ্র্যানাইট হাউসের খুব কাছেও হবে, আমরা ও সবসময় দেখতে পারবো।

পেনক্র্যাফট উত্তর করলে : 'নিয়ে গেলে ভালাে হত বটে, কিন্তু মার্সির মুখটা নৌকো। রাখবার পক্ষে ভারি খারাপ জায়গা। সেখানে সবসময়েই সাংঘাতিক ঢেউ থাকে। তাছাড়া, আমরা যখন কিছুদিনের জন্যে গ্র্যানাইট হাউস ছেড়ে অভিযানে বেরুব, তখন বন অ্যাডভেনচার এখানেই বেশি নিরাপদে থাকবে।

হার্বার্ট বললে : সে-কথা তাে বুঝলাম, কিন্তু এই ফাঁকে যদি দস্যুরা এসে বন অ্যাডভেনচার নিয়ে চলে যায়?

মার্সির মুখে নিয়ে রাখলে কি তা নিবারণ করা যাবে? বললে পেনক্র্যাফট, এখানে এসে নৌকোটা দেখতে না-পেলে খুঁজে খুঁজে মার্সির মুখে গিয়ে তারা হাজির হবেই। তখন তাদের বাধা দেবে কে? তারপর আমরা সন্ধান শেষ করে ফিরে এসে যদি দস্যুদের কিছু করতে না পারি, তখন না-হয় নৌকোটা গ্র্যানাইট হাউসের কাছে নিয়ে রাখা যাবে।

সবাই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এসে সাইরাস হার্ডিংকে সব কথা বললেন। বন অ্যাডভেনচার সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থাই তার পছন্দ হ'ল। তিনি পেনক্র্যাফটকে কথা দিলেন যে, ভবিষ্যতে যাতে বন-অ্যাডভেনচার সর্বক্ষণ দৃষ্টির মধ্যে থাকে, সেজন্যে কাছেই কোথাও একটা কৃত্রিম বন্দর তৈরি করা যেতে পারে কিনা তা চেষ্টা করে দেখবেন।

সেইদিনই বিকেলে আয়ারটনকে টেলিগ্রাম করা হ'ল কোর‍্যাল থেকে দুটো ছাগল আনাবার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই টেলিগ্রামের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

সাইরাস হার্ডিং একটু অবাক হলেন। আয়ারটনের স্বভাব তো এমন নয়। তবে কি এখন সে কোর‍্যালে নেই, না কি এর মধ্যেই সে গ্র্যানাইট হাউসের দিকে রওনা হয়ে পড়েছে? দু-দিন তো কেটে গেছে। দশ তারিখ বিকেলে কিংবা এগারোই সকালে সে ফিরে আসবেই। সবাই আয়ারটনের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সন্ধের পর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আয়ারটনের কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। ফের টেলিগ্রাম করা হ'ল কোর‍্যালে, কিন্তু তবু কোনো জবাব এলো না।

বাপার দেখে মহা চিন্তায় পড়লেন সকলে। ব্যাপার কী? কোনো বিপদ-আপদ হ'ল না তো তার? সে কি কোর‍্যালে নেই, কিংবা থাকলেও নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতা নেই অর? এমনও হতে পারে টেলিগ্রামের কোনো দোষ হয়েছে। তাহ'লে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

এগারোই নভেম্বর ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই আবার টেলিগ্রাম করলেন হার্ডিং, কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া গেল না। খানিক পরে আবার চেষ্টা করা হল। তবু কোনো ফল হ'ল না।

তক্ষুনি সবাই কোর‍্যালের দিকে রওনা হয়ে পড়লেন, শুধু নেব রইল গ্র্যানাইট হাউস পাহারা দেবার জন্যে। প্রসপেক্ট হাইট ছেড়ে কোর‍্যালের দিকে চললেন সবাই। হাতে গুলি-ভরা বন্দুক। সামান্য কোনো সন্দেহজনক কারণ উপস্থিত হ'লেই গুলি চালাবেন। বলা বাহুল্য, টপও তাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলল। টেলিগ্রাফের খুঁটি ধ'রে-ধ'রে এগুতে লাগলেন সকলে। প্রায় দু-মাইল পথ অতিক্রম করার পরও টেলিগ্রাফের লাইন খারাপ হওয়ার কোনো কারণ বার করতে পারলেন না। কিন্তু তার পর থেকেই মনে হল যেন তার একটু ঢিলে হয়ে গেছে।

হার্বার্ট সকলের আগে-আগে চলছিল। চুয়াত্তর নম্বর খুঁটির কাছে এসেই সে চেঁচিয়ে উঠল : তার ছিঁড়ে গেছে।

সবাই তাড়াতাড়ি কাছে এসে দেখতে পেলেন, শুধু যে তারই ছিঁড়ে গেছে তা নয়, তারের খুঁটিটাও মাটিতে পড়ে আছে। এতক্ষণে টেলিগ্রাফের গোলমালের কারণ বুঝতে পারা গেল। বোঝা গেল যে গ্র্যানাইট হাউসের টেলিগ্রামগুলো কোর‍্যালে পৌঁছোয়নি। আরো দেখা গেল, এ-খুঁটি হাওয়ায় উপড়ে ফ্যালেনি, কারা যেন খুঁটির গোড়ার মাটি খুঁড়ে ওটাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে, আর তারটা ছিঁড়ে দিয়েছে। এবং ছিঁড়েছে দু-এক দিনের মধ্যেই।

পেনক্র্যাফট বললে : আর দেরি নয়। শিগগির কোর‍্যালে যেতে হবে আমাদের।

সবাই তখন কোর‍্যালের প্রায় অর্ধেক পথ এসেছেন, আরাে প্রায় দু-মাইল পথ বাকি। এবার আরাে দ্রুত পায়ে এগুতে লাগলেন সকলে। আয়ারটন কথা দেয়া সত্ত্বেও কেন ঠিক সময়ে গ্র্যানাইট হাউসে পৌঁছল না? সুতরাং স্পষ্টই বাে‌ঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ কোনাে মৎলব হাসিলের জন্যেই কেউ কোর্যাল আর গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যেই যাােগাযাােগ বন্ধ করে দিয়েছে। এ-কাজ নিঃসন্দেহে বাােম্বেটেদের। আয়ারটনের জন্যে সাংঘাতিক ভাবনা হ'ল সকলের। তবে কি বাােম্বেটেদের হাতে নিহত হয়েছে আয়ারটন?

যে-ছাােট্ট নদীটার জলধারা কোর‍্যালের কাজে লাগতাে, অবশেষে সবাই সেই নদীর তীরে এসে হাজির হলেন। এখানে এসেই সাবধানে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলেন সবাই। এমন সময় টপ হঠাৎ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ডেকে উঠল। অবশেষে গাছ-গাছালির মধ্যে দিয়ে কোর‍্যালের বেড়া দেখতে পাওয়া গেল। আগের মতাােই অটুট আছে বেড়াটি। দরজাটাও আগে যেমন বন্ধ থাকতাে, তেমনই বন্ধ রয়েছে। তবে জন্তু-জানাােয়ারের ডাক, কিংবা আয়ারটনের সাড়াশব্দ-কিছুই পাওয়া গেল না। জায়গাটা যেন আশ্চর্য রকম নীরব হয়ে আছে।

সাইরাস হার্ডিং অগ্রসর হলেন। সঙ্গীরা একটু পিছনে পিছনে সতর্ক হয়ে রইলেন, দরকার হ'লেই যাতে বন্দুক ছোঁড়া যায়। হার্ডিং দরজার খিল খুলে ভিতরে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় টপ সাংঘাতিকভাবে ডেকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র শব্দ করে গর্জে উঠল একটা বন্দুক, আর শাােনা গেল একটা যন্ত্রণাকাতর তীক্ষ্ণ আর্ত চীৎকার।

বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে হার্বার্ট মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

.

৩.৩ সালফেট অভ কুইনাইন

হার্বার্টের চীৎকার শুনেই হাতের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দিলে পেনক্র্যাফট। ছুটে গেল তার কাছে, তারপর চেঁচিয়ে উঠল : শয়তানরা আমার বাছাকে মেরে ফেলেছ গাে, মেরে ফেলেছে।

হার্ডিং আর স্পিলেট তক্ষুনি ছুটে গেলেন হার্বার্টের কাছে। উপুড় হয়ে বসলেন শিলে।হাৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায় কিনা দেখলেন পরীক্ষা করে। তারপর বললেন : এখনাে বেঁচে আছে? এক্ষুনি ওকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে!

হার্ডিং বললেন : গ্র্যানাইট হাউসে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। কোর্‌্যালের ভিতরেই নিয়ে চলুন।

এই ব'লেই কোব্যালে বেড়ার বাঁ পাশের কোণ ঘুরে ছুটলেন তিনি। কোণ ছাড়িয়েই এক সেটেকে দেখতে পেলেন–বন্দুক ছুঁড়ে হার্ডিং-এর টুপিটা উড়িয়ে দিলে সে। সৌভাগ্যবশত গুলিটা কপালে লাগল না। দ্বিতীয়বার গুলি করতে না-দিয়ে হার্ডিং বিদ্যুদ্বেগে ছুটে গিয়ে তার ছুরিটা আমূল বোম্বেটের বুকে বসিয়ে দিলেন। চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল বোম্বেটেটি।

এই ফাঁকে পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট হার্বার্টকে কোব্যালের ভিতরে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে আয়ারটনের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। একটু পরে হার্ডিংও বিছানার পাশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। হার্বার্টকে অচেতন দেখে পেনক্র্যাফট তখন পাগলের মতো হয়ে উঠেছে। হার্ডিং আর স্পিলেট অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে শান্ত করতে পারলেন না। তারা বুঝতে পারলেন যে তাদের দুজনের উপরের নির্ভর করছে হার্বার্টের জীবন। ফৌজের সঙ্গে অনেকদিন ঘুরতে হয়েছিল বলে স্পিলেট 'ফার্স্ট এড' বেশ ভালো করেই শিখেছিলেন। লড়াইয়ের সময়ে বহু সৈনিককে শুশ্রূষাও করেছিলেন তিনি। সাইরাস হার্ডিং-এর সাহায্যে তিনি তক্ষুনি হার্বার্টের শুশ্রূষায় মন দিলেন।

হার্বার্টের এমনিতর একেবারে সংজ্ঞাহীন অবস্থা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন স্পিলেট। বন্দুকের গুলি পাজরার হাড়ে লেগেছিল বলে ভয়ানকভাবে ধাক্কা খেয়েছিল হৃৎপিণ্ড। সেজন্যেই, কিংবা অতিরিক্ত রক্তস্রাবের দরুনই, এমনিভাবে অচেতন হয়ে পড়েছিল হার্বার্ট। মৃত্যুর মতো পাংশুটে হয়ে গিয়েছিল তার মুখ। অত্যন্ত দুর্বল নাড়ি। অন্যান্য লক্ষণও খুব সাংঘাতিক।

হার্বার্টের বুকের কাপড় খুলে ক্ষতস্থান ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে রুমালের সাহায্যে রক্তস্রাব বন্ধ করা হল। গুলিটা লেগেছিল পাঁজরার তৃতীয় আর চতুর্থ হাড়ের মাঝখানে। সাইরাস হার্ডিং আর স্পিলেট ধরাধরি করে হার্বার্টকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন। হার্বার্ট তখন এমনই মৃদু আর্তনাদ করে উঠল যে তারা ভয়ানক ঘাবড়ে গেলেন। হার্বার্টের বুকের অন্য পাশেও আরেকটি ক্ষত দেখা গেল। সেখান দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেছে।

সেই ক্ষতস্থান দেখেই স্পিলেট বললেন : ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, শরীরের মধ্যে গুলি নেই।

এখন কেমন বোধ হচ্ছে? প্রশ্ন করলেন হার্ডিং।

গুলি হৃদপিণ্ড স্পর্শ করেনি, বললেন স্পিলেট : তা যদি করতো, তাহলে এতক্ষণে মরে যেতো ও।

বন্দুকের গুলি বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বেরুবার সময় ভিতরে কী অনিষ্ট করে গেছে, তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না স্পিলেটের। তবে এ-কথা বুঝেছিলেন যে, ক্ষতস্থান যাতে পেকে ফুলে না ওঠে, তার চেষ্টা করতে হবে। পাকলে জ্বর তো হবেই, তার ফলও যে কী-রকম ভয়নক হবে, তা কে বলতে পারে। একটও দেরি না-ক'রে ক্ষতস্থানটি আগে ধুয়ে ফেলতে হবে। গরম জল দিয়ে ধুলে আবার রক্তপাতের আশঙ্কা আছে। এর মধ্যেই রক্তপার যতটুকু হয়ে গেছে, তাতেই ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে হার্বার্ট। এইজন্যে স্পিলেট শুধু ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে দেয়াই উচিত মনে করলেন।

হার্বাটকে বাঁ-দিকে পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেয়া হয়েছিল। সেই অবস্থাতেই রাখা হবে তাকে। তাহলে ভিতরেব পূঁয ক্ষতস্থানদুটি দিয়ে সহজেই বেবিয়ে যেতে পারবে। হার্বার্টের পক্ষে এখন দরকার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সুতরাং গ্র্যানাইট হাউসে তাকে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

স্পিলেট ডাক্তার নন। তাই হার্বার্টের অবস্থা দেখে তিনি একটু উৎকণ্ঠা বোধ করলেন। কিন্তু মনোবল হারালেন না। বিছানার পাশে বসলেন তিনি। হার্ডিং কাছেই দাঁড়িয়ে রইলেন। পেনক্র্যাফট দাঁড়িয়ে তার শার্টটি ছিঁড়ে ক্ষত বাঁধবার জন্যে ব্যাণ্ডেজ আর লিণ্ট তৈরি করতে লাগল।

পেনক্র্যাফট আগুন জ্বাললেন। উইলো গাছের ছাল সেদ্ধ করে হার্বার্টের জন্যে পানীয় জল প্রস্তুত হল। সেই পানীয় স্পিলেট মাঝে-মধ্যে হার্বার্টকে দিতে লাগলেন। ক্রমে জ্বর হল হার্বার্টের। সারা দিন আর রাত্রির মধ্যতে তার জ্ঞানই হল না। সবাই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলেন। অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। কখন কী হয়, কিছুই বলা যায় না।

পরদিন বারোই নভেম্বর একটু আশা জাগল সবার মনে। আচ্ছন্ন নিদ্রা থেকে জেগেছে হার্বার্ট। চোখ খুলে তাকালে চারদিকে। সাইরাস, হার্ডিং, গিডিয়ন, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট—সবাইকে চিনতে পারলে। _ _ _। দুর্ঘটনার কথা কিছুই জানতো না ও—ওকে সব কিছু খাইয়ে দেয়া হলো। স্পিলেট হাত জোড় করে অনুরোধ করলেন, ও যেন একেবারে স্থির হয়ে শুতে পড়ে। একটুও যেন নড়াচড়া না করে। ভয়ের কোনো কারণ নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে যাবে।

ঈশ্বরের আশীর্বাদই বলতে হবে। হার্বার্টের যন্ত্রণা আর বাড়ল না। ক্রমাগত ঠাণ্ডা জল দেওয়ার দরুন ঘা ফুলল কিংবা পেকে উঠল না। জ্বরও আর বাড়ল না। হার্বার্ট আবার চোখ বুজলে। কিন্তু তা বিপদের __ ঘুম নয়, স্বাভাবিক নিদ্রা।

পেনক্র্যাফট জিজ্ঞেস করলেন, কোনো ভরসা পেয়েছেন কি? হার্বার্ট বাঁচবে তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারবো, বললেন স্পিলেট : অবিশ্যি ঘা-টা গুরুতর। গুলিটাও হয়তো ফুশ-ফুশ ছুঁয়ে গেছে। তবে ভরসা এই যে, তেমন মারাত্মক আঘাত নয়।

এই ছব্বিশ ঘণ্টা হার্বার্টের শুশ্রূষা ছাড়া অন্য-কোনো চিন্তা কারুর মনেই আসেনি। বোম্বেটেরা ফিরে এলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু সে-কথা তখন কে ভেবেছে? হার্বার্টকে একটু সুস্থ দেখে সাইরাস হার্ডিং স্পিলেটের সঙ্গে কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ করতে লাগলেন। পেনক্র্যাফট রোগীর পাশেই বসে রইল।

তারা দুজনে প্রথমে কোর্যালটা ভালাে করে পরীক্ষা করলেন। আয়ারটনের কোনাে চিহ্নই দেখা গেল না। তবে কি বাম্বেটেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে? সাইরাস হার্ডিং একটা বাম্বেটেকে খতম করেছেন, বাকি পাঁচটা পালিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই তারা ওের ক'রে আয়ারটনকে নিয়ে গেছে। কোর‍্যালের অবিশ্যি কোনাে ক্ষতি হয়নি। দরজা বন্ধ ছি, সেজন্যে জগুলাে পালিয়ে যেতে পারেনি। কুটিরের ভিতরে কিংবা বাইরে–কোনোখানেই টানাটানি কিংবা হুটোপাটির কোনো চিহ্ন নেই। আয়ারটনকে যে গুলি-বারুদ দেয়া হয়েছিল, শুধু তা-ই অদৃশ্য হয়েছে।

হার্ডিং বললেন : বেচারি আয়ারটনকে নিশ্চয়ই ওরা হঠাৎ আক্রমণ করেছিল। তার গায়ে জাের আছে–লড়েছিল খুবই। কিন্তু অত জনের সঙ্গে একলা পেরে ওঠেনি।

তা-ই হবে, বললেন স্পিলেট : আয়ারটনকে ধরবার পর তারা যে কোর‍্যালেই ছিল, সে-বিষয়ে কোনাে সন্দেহই নেই। আমাদের আসতে দেখেই পলিয়েছে।

বনটাকে বাম্বেটে-শূন্য না করলে চলছে না। বললেন হার্ডিং : পেনক্র্যাফট ঠিক কথা বলেছিল। এদের কুকুরের মতাে গুলি করে মারাই উচিত। পেনক্র্যাফটের কথাটা শুনলে

এসব দুর্গতি আর হত না। হার্বার্টকে নিরাপদে গ্র্যানাইট হাউসে না-নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে।

কিন্তু নেবের কী হবে? শুধালেন গিডিয়ন স্পিলেট।

নেব তো বেশ নিরাপদেই আছে।

আমাদের ফিরতে দেরি দেখে সে যদি খুঁজতে বেরোয়?

সেটা খুবই সম্ভব, কিন্তু তার একা বেরিয়ে-পড়া উচিত হবে না। পথেই তাকে মেরে ফেলবে। যদি টেলিগ্রাফের লাইন ভালো থাকতো, তবে নেবকে সাবধান করতে পারতুম। এখানে পেনক্র্যাফট আর হার্বার্টকে একা রেখে কোনোমতেই যাওয়া যেতে পারে না। তাহ'লে আমিই গ্র্যানাইট হাউসে যাই।

উঁহু, সে কিছুতেই হতে পারে না, বললেন স্পিলেট :বোম্বেটেরা নিশ্চয়ই কোর‍্যালের উপর নজর রেখে বনে কোথাও লুকিয়ে আছে। আপনি যদি যান, তাহলে একটা দুর্ঘটনার বদলে দুটো দুর্ঘটনার জন্যে আমাদের আপশোশ করতে হবে।

কিন্তু নেব্! বললেন হার্ডিং : চব্বিশ ঘণ্টা ধরে সে আমাদের খোঁজখবর পাচ্ছে না। সে তো নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়বে। তাকে সাবধান করে দেয়ার কি কোনো উপায় নেই?

এমন সময় হঠাৎ টপের দিকে হার্ডিং-এর নজর পড়ল। টপ পায়চারি করতে-করতে তার দিকে তাকিয়ে যেন বললে, "কেন, আমি কি এখানে নেই?

হার্ডিং ডাকবামাত্র টপ লাফিয়ে তার কাছে এল।

স্পিলেট হার্ডিং-এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। বললেন : ঠিক-টপই যাবে। সে কোর‍্যালের খবর নিয়ে গ্র্যানাইট হাউসে যাবে, আবার গ্র্যানাইট হাউসের খবর নিয়ে কোর‍্যালে ফিরে আসবে।

এই ব'লে তক্ষুনি নাোটবইয়ের পাতা ছিড়ে নিয়ে স্পিলেট লিখলেন : হার্বার্ট আহত। আমরা কোর‍্যালে আছি। তুমি খুব হুশিয়ার থেকে। গ্র্যানাইট হাউস ছেড়ে কিছুতেই কোথাও যেয়াো না। বাোম্বেটেদের কি দেখতে পেয়েছাো? টপকে দিয়ে উত্তর পাঠিয়ে। এই চিরকুটটা টপের গলায় বেঁধে দেয়া হ'লে হার্ডিং গ্র্যানাইট হাউসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে তার পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে বললেন : নেব্–নেব্–যাও।।

বলা বাহুল্য যে টপ বুঝতে পারলে তাকে কী করতে হবে। হার্ডিং তাকে নিয়ে কোর্‍্যালের দরজার কাছে গেলেন, তারপর আবার গ্র্যানাইট হাউসের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন : নেব, টপ ! নেব !'

টপ লাফ দিয়ে সামনের বনে ঢুকল, তারপর পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্পিলেট বললেন : টপ ঠিক যেতে পারবে

হ্যাঁ, বললেন, হার্ডিং :'আর ফিরেও আসতে পারবে। এখন তাো দশটা বাজে, সাড়ে এগারাোটার মধ্যেই টপ ফিরে আসবে।

কোর‍্যালের দরজা বন্ধ করে আবার ঘরে এসে ঢুকলেন দুজনে। হার্বার্ট তখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পেনক্র্যাফট ঠায় ব'সে ক্ষতের বাঁধনে ঠাণ্ডা জল দিয়ে চলেছে।

এগারোটার সময় হার্ডিং আর স্পিলেট বন্দুক নিয়ে কোর‍্যালের দরজায় গেলেন। টপের সাড়া পেলেই দরজা খুলে দেবেন। মিনিট পনেরো পরে হঠাৎ একটা বন্দুকের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কুকুরের ডাক।

হার্ডিং দরজা খুললেন। প্রায় একশো গজ দূরে বনের মধ্যে ধোঁয়া দেখে সেদিকে গুলি চালিয়ে দিলেন। সেই মুহূর্তেই টপ লাফিয়ে কোর‍্যালে এসে ঢুকল। হার্ডিং দরজা বন্ধ করে দিয়ে টপের দিকে তাকালেন। দেখা গেল, টপের গলায় একটা চিরকুট। হার্ডিং পড়লেন, নেব বড়ো-বড়ো হরফে লিখেছে : গ্র্যানাইট হাউসের কাছে বোম্বেটেদের দেখা যায়নি। আমি বাইরে যাবো না। হায়, ভাগাহত হার্বার্ট !

বোম্বেটেরা তবে কাছেই রয়েছে-কোর‍্যালের উপরই তাদের নজর। সুবিধে পেলেই একজন-একজন করে সবাইকেই হত্যা করবে। সবাইকে এখন তবে খুব সতর্ক থাকতে হবে। বোম্বেটেদের সব বিষয়েই বেশি সুবিধে। তারা সবকিছুই দেখতে পারবে, কিন্তু তাদের দেখা যাবে না। তারা অকস্মাৎ আক্রমণ করতে পারবে, কিন্তু তাদের কিছুই করা যাবে না।

হার্ডিং ঠিক করলেন, কোর‍্যালেই থাকবেন আপাতত। এখানে অবিশ্যি রসদপত্র প্রচুর আছে। দ্বীপবাসীদের আকস্মিক আগমনে সবকিছু ফেলেই বোম্বেটেদের পালাতে হয়েছিল কিনা।

গাোটা ঘটনাটা মনে-মনে সাজিয়ে নিলেই বাোঝা যায় যে মার্সি নদীর মুখে নৌকো ডুবে যাওয়ার পর দস্যুরা যখন পালিয়ে গিয়েছিল, তখন থেকে বনে বনে ঘুরতে ঘুরতে শেষে কোর‍্যালে গিয়ে হাজির হয়েছিল। কোর‍্যাল তখন ছিল খালি। সুন্দর একটা কুটির, রসদপত্রও যথেষ্ট আছে। সেইজন্যে তারা সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর আয়ারটন যখন কোর‍্যালে ফিরে গেল, তখন বাোম্বটেরা অবিশ্যি প্রথমটায় খুব অবাক হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ছ-জনে মিলে একজনকে হারিয়ে দেবে, সেটা আর বিচিত্র কী!

পরে যা-কিছু হ'ল, সবই অনুমান করতে পারা যায়। এখন তারা সংখ্যায় একজন কম হলেও অস্ত্রশস্ত্র তাদের আছে। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা। বনে গেলে আক্রমণ করবে। হুঁশিয়ার থাকলেও সেই অনিবার্য আক্রমণে বাধা দেয়া যাবে না। সুতরাং এখন অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। হার্বার্ট ভালাো হয়ে উঠলে তাদের সঙ্গে একটা বাোঝা পড়া করা যাবে। এখন প্রধান চিত্ত হ'ল হার্বার্টকে বাঁচানাো। | দশ দিনের দিন, বাইশে নভেম্বর হাবার্টের অবস্থা খানিকটা ভালাো দেখা গেল। তার মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা দূর হতে লাগল। চোখদুটি উজ্জ্বল হয়েছে। সকলের দিকে তাকিয়ে এখন সে হাসে। পেনক্র্যাফটের সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে থাও বলে। একদিন সে আয়ারটনের কথা জিগেস করলে-তাকে কেন সে দেখতে পায়। এমন অবস্থায় হার্বার্টকে বিচলিত করা উচিত হবে না ভেবে পেনক্র্যাফট বললে : 'আয়ারটন নেবের কাছে। দুজনে মিলে গ্র্যানাইট হাউস পাহারা দেবে।

হার্বাট শুধাোলে : 'বাোম্বেটেদের আর দেখতে পাওয়া যায়নি?

না। বললে পেনাফট : কিন্তু শয়তানদের খুঁজে বার করবাে। তুমি একেবারে সেরে উঠলেই দেখা যাবে শয়তানগুলাে সামনাসামনি এসে কিছু করতে ভরসা পায় কি

হার্বার্ট আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠতে লাগল র্যালের ঘরটা যতই ভালো হােক কেন, গ্র্যানাইট হাউসে তাে স্বাচ্ছন্দ্যময় কিংবা নিরাপদ নয়। সেজন্যে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন–কখন হার্টের অবস্থা তাকে স্থানান্তরিত করবার মতাে হয়।

নেবের আর-কোনাে খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু সেজন্য কেউ উদ্বিগ্ন হলেন না। অকুতােভয় নেব দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট হাউসের মধ্যে থেকে অনায়াসেই শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে। টপকেও আর তাকে কাছে পাঠানাে হয়নি। খামকা ওকে বিপদের হাতে সপে দিয়ে লাভ নেই। কে জানে, হয়তাে তাকে তবে হারাতে হবে। এমন অবস্থায় বাােম্বেটেদের সম্পর্কে কোন পথ অবলম্বন করা উচিত, সে বিষয়ে উনত্রিশে নভেম্বর হার্ডিং, স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট মিলে পরামর্শ করতে বসলেন। হার্বার্ট তখন ঘুমোচ্ছিল।

বোম্বেটেরা যদি কোনো একটা জায়গা লুকিয়ে থাকত, আর সেই জায়গার সন্ধান তাদের জানা থাকতাে, তবে সরাসরি তাদের গিয়ে আক্রমণ করা হয়তো সম্ভব হত। কিন্তু তারা কোথায় লুকিয়ে আছে তা জানা নেই। এহেন অবস্থায় প্রথমে আক্রমণ করবে বোম্বেটেরাই, এবং এমন অতর্কিতে করবে যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে। তাই বর্তমান অবস্থায় তাদের সাােজাসুজি আক্রমণ করবার কোনাে প্রশ্নই উঠতে পারে না।

স্পিলেট তখন জানালেন যে হার্বার্টের অবস্থা যেমন ক্রমশ ভালো দিকে চলেছে, তাতে মনে হয় আর দিন আষ্টেকের মধ্যেই তাকে গ্র্যানাইট হাউজে নিয়ে যাওয়া যাবে। এই সময়ে গ্র্যানাইট হাউস সংলগ্ন সমতল ভূমিতে চাষ করবার কথা—পুরাোনাো ফসল কেটে ভাড়ারে তুলে নতুন বীজ রাোয়ার সময়। এ-সময় কোর‍্যালে বন্দীর মতাো থাকার দরুন দ্বীপবাসীদের ক্ষতি হবে যথেষ্ট। কি উপায় কী? অবস্থা বুঝেই তাো ব্যবস্থা করতে হবে।

সেদিনই বিকেলবেলার দিকে এমন-এক ঘটনা ঘটল, যাতে সমস্ত ঘটনাপ্রবাহের ধারা বদলে গেল।

তখন হার্বার্টের ঘরে বসে সবাই কথাবার্তা বলছিলেন, এমন সময় টপ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। হার্ডিং স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট–সবাই বন্দুক নিয়ে বাইরে ছুটে এলেন। বাইরে বেড়ার নিচে টপ লাফাচ্ছে, ডাকছে। তার ডাকে কিন্তু আক্রোশের কিংবা রাগের ভাব নেই–কেমন যেন এটা আনন্দের স্পর্শ আছে তাতে। ব্যাপার কী?

কেউ যেন আসছে।

হ্যাঁ, আসছে বটে, বললেন হার্ডিং : আর, সে শত্রু নয়। হয়তাো-বা নেব্।

এমন সময় কে যেন বেড়ার উপর দিয়ে লাফিয়ে কোর‍্যালের মধ্যে ঢুকল। সবাই সচমকে তাকিয়ে দেখলেন, সে হ'ল জাপ। সশরীরে এসে হাজির হয়েছেন জাপ। টপ তক্ষুনি ছুটে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলে।

স্পিলেট বললেন : নেব নিশ্চয়ই জাপকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে।

তাহলে নিশ্চয়ই জাপের কাছে নেবের চিঠি আছে। বললেন হার্ডিং। তখন দেখা গেল, জাপের গলায় একটা ব্যাগ ঝুলছে, সেই ব্যাগের মধ্যে নেবের চিঠি।

চিঠির মধ্যে সকলে যখন পড়লেন : শুক্রবার সকাল ছটার সময় বাম্বেটেরা খেত চড়াও করেছে, তখন সবাই যে কী-রকম হতাশ হলেন, তা আশা করি না-বললেও চলবে। সবাই একে অন্যের খের দিকে তাকাতে লাগলেন। কারু মুখেই কোনো কথা নেই। আবার এসে হার্বার্টের ঘরে ঢুকলেন সকলে। এখন তাদের কর্তব্য কী? প্রসপেক্ট হাইটে বাম্বেটেরা। কী সর্বনাশের কথা ! সবকিছু যে নষ্ট করে ফেলবে। আর উপায় নেই !

সকলকে ঘরে ফিরে আসতে দেখে, বিশেষ করে জাপকে সঙ্গে দেখে, হার্বাট বুঝতে পারলে যে গ্র্যানাইট হাউস বিপদ-আক্রান্ত। সে তক্ষুনি ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললে : কাপ্তেন হার্ডিং, অলি গ্র্যানাইট হাউসে যাবো ! পথের কষ্ট কিছুই হবে না আমার। আমি যাবোই !

স্পিলেট হার্বার্টের কাছে এসে দাড়ালেন। খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে দেখলেন খানিকক্ষণ! তারপর বললেন : বেশ, তাহলে যাওয়াই হোক।

তক্ষুনি পেনক্র্যাফট ওনাগার গাড়ি নিয়ে এলো। তারপর হার্বার্টকে বিছানা-শুদ্ধ ধরাধরি করে গাড়িতে শুইয়ে দেয়া হল। সবাই গুলিভর বন্দুক হাতে নিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হলেন।

হার্ডিং জিজ্ঞেস করলেন : কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো, হার্বার্ট?

হট বললে : কিচ্ছু ভাববেন না আপনি আমি পথে মারা যাবাে না।

হার্বার্ট মুখে একথা বললে বটে, কিন্তু তাকে দেখে গেল যে সে শুধু মনের জোরেই তার শারীরিক শক্তিকে এগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সাইরাস হার্ডিং তা দেখে ইতস্তত করতে লাগলেন, সত্যি-সত্যি যাত্রা করবেন কি না।

কিন্তু যাত্রা না করলে হার্বার্ট নিরাশ হবে—হয়তো-বা আশাভঙ্গজনিত বেদনায় তার মৃত্যুও ঘটতে পারে। এইসব সাত-পাঁচ ভেবে হার্ডিং বললেন : বেশ। তবে এখন রওনা হওয়া যাক।

কোর‍্যালের দরজা খাোলা হ'ল। টপ আর জাপ চলল সবার আগে আগে। তারপর সাইরাল হার্ডিং আল গিডিয়ন স্পিলেট বন্দুক হাতে গাড়ির দু-পাশে, অব পেনক্র্যাফট ওনাগার লাগাম ধ'রে গাড়ির সঙ্গে-সঙ্গে-এইভাবে চলতে লাগলেন সকলে।

আস্তে-আস্তে পথ চলতে চলতে ক্রমে তাঁরা চার-মাইল পথ অতিক্রম করে প্রসপেক্ট হাইটের কাছে এসে হাজির হলেন। একটু পরেই গাছের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা গেল। গাড়ি এগিয়ে চলছিল; হঠাৎ এমন সময়ে গাড়ি থামালে পেনক্র্যাফট। তর্জনী নির্দেশ করলে খেতের দিকে ; বললে : বোম্বেটেগুলাে সব এক-একটা শয়তান।

সবাই তাকিয়ে দেখলেন, উইণ্ডমিল আর পাখির বাসার মধ্য থেকে ধোঁয়া উঠছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে একজন লাােককে চলাফেরা করতে দেখা গেল। সবাই চেঁচিয়ে তাকে

ডাকলেন। নে শুনতে পেয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আসতে লাগল। শাোনা গেল, বাোম্বেটেরা নাকি খেতের সর্বনাশ করে আধঘণ্টা আগে চলে গেছে।

নেব জিগেস করলে : মিস্টার হার্বার্ট কেমন আছেন?

গিডিয়ন স্পিলেট গাড়ির কাছে এলেন। এসে দেখলেন, হার্বার্ট অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাোম্বেটেরা খেতের সর্বনাশ করে চলে গেছে, গ্র্যানাইট হাউসের জন্যে আর-কোনাো আশঙ্কা নেই। কিন্তু সে-কথা তখন কারু মনেও এলাো না। সব চাপা পড়ে গেল হার্বাটের গুরুতর অবস্থায়।

নড়া-চড়া করার দরুন কি হার্বার্টের ক্ষত নতুন করে আঘাত পেয়েছে? গিডিয়ন স্পিলেট ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারলেন না। হার্বার্টের জন্যে সবাই ভীষণ ভয় পেলেন। তক্ষুনি গাড়িটাকে পাহাড়ের নিচে এনে হার্বার্টকে রাখা হ'ল। তারপর ভিতরে আনবার পর হার্বার্টকে উপরে নিয়ে তার ঘরে শুইয়ে দেয়া হ'ল। ঘরে আনবার পর হার্বার্ট চেতনা পেয়ে একটু হাসলে। কিন্তু অতিরিক্ত দুর্বলতার দরুন কোনাো কথা বলতে পারলে না। স্পিলেট তার ক্ষতগুলাো ভালাো করে পরীক্ষা করলেন।কোনাোটারই মুখ খুলে যায়নি। তবে কেন হার্বাটের অবস্থা খারাপ হ'ল? কেন তার দুর্বলতা এত বেড়ে উঠল হঠাৎ? আবার জ্বরবিকারের মাোহনিদ্রা নেমে এলাো হার্বাটের চোখে। স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট তার পাশে ব'সে রইলেন। এবার হার্ডিং নেবকে কোর‍্যালের সব ঘটনা খুলে বললেন। নে তাকে বাোম্বেটেদের খেতের সর্বনাশ করে যাওয়ার কথা খুলে বললে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

আগের দিন সন্ধের পরেই হঠাৎ বাে্বেটেরা এসে নদীর ধারের বনের কাছে হাজির হয়। নে তখন ছিল পাখির বাসার কাছে। বাে্বেটেরা নদী পেরুবার উপক্রম করছে দেখে নে গুলি চালালাে। গুলি কারুর গায়ে লাগল কি না, অন্ধকারে সেটা বুঝতে পারা গেল না। নেব দেখল যে বাে্বেটেরা তাতেও ভয় পেলাে না। তাই সে তাড়াতাড়ি গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলাে।

এখন কী কর্তব্য তার? নিজের জন্যে কোনাে ভাবনা নেই। গ্র্যানাইট হাউস দুর্ভেদ্য। কিন্তু বাে্বেটেরা খেতে ঢুকে পাখির বাসা ইত্যাদি নষ্ট করে ফেলবে–এ-খবর ক্যাপ্টেন হার্ডিং এর কাছে পাঠানাে উচিত। কিন্তু পাঠাবে কী করে? জাপ?–হ্যাঁ জাপ। চিঠি লিখে জাপকে দিয়ে কোর‍্যালে খবর পাঠাবে। জাপ বুদ্ধিমান। অনেকবার কোর‍্যালে গেছে। পথ বেশ জানে। তখন বিকেল বেলা। বনের মধ্যে দিয়ে জাপ কোর‍্যালে পৌঁছুতে পারবে। বাে্বেটেরা এর বিন্দুবিসর্গ জানতেও পারবে না, কল্পনাও করতে পারবে না। সেই মুহূর্তে নে চিঠি লিখে জাপের গলায় বাঁধল। তারপর গ্র্যানাইট হাউসের দরজা থেকে মাটি পর্যন্ত লম্বা দড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে জাপকে বললে : জাপ, জাপ! কোর‍্যাল !

জাপের বুঝতে দেরি হ'ল না। দড়ি বেয়ে সমুদ্রতীরে নেমে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বনের গহনে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে বাে্বেটেরা প্রসপেক্ট হাইট ছেড়ে চলে গেলে পর নে ছুটে সেখানে গেল আর আগুন নেভানাের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু কৃতকার্য হ'ল না। এই সময়েই কোর‍্যাল থেকে অন্যরা হার্বার্টকে নিয়ে বনের প্রান্তে এসে হাজির হয়েছিলেন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পরদিন হার্বার্ট আর পেনক্র্যাফটের সঙ্গে স্পিলেট গ্র্যানাইট হাউসে রইলেন, সাইরাস হার্ডিং নেবকে নিয়ে গেলেন মার্সি নদীর দিকে। নদীর বাঁ পাড়ে উঠে চারিদিকে দেখতে লাগলেন ! বোম্বেটেদের কোনো চিহ্নই দেখা গেল না। নদীর অন্য পাড়ে বনের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু নেই। বোধহয় বোম্বেটেরা জানতে পেরেছে যে কোর‍্যাল ছেড়ে সবাই চ'লে এসেছেন। কিংবা এমনও হতে পারে, প্রসপেক্ট হাইটের সর্বনাশ করে তারা মার্সি নদীর তীর ধরে জ্যাকামার অরণ্যে প্রবেশ করেছে, আর এখনো তাদের প্রত্যাবর্তনের কথা জানতে পারেনি। যদি প্রত্যাবর্তনের কথা তারা জানতে পেরে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তারা কোর‍্যালের দিকে গেছে। কোর‍্যালে দরকারি মালপত্র আছে, লোকজন তো সেখানে নেই–সেটা দখল করবার এইটেই প্রকৃষ্ট সময়।

সাইরাস হার্ডিং নেবের সঙ্গে প্রসপেক্ট হাইটে গিয়ে দেখলেন, সবকিছু একেবারে তছনছ করে, ছারখার করে গেছে বোম্বেটেরা। শস্যখেতগুলো পর্যন্ত মাড়িয়ে নষ্ট করেছে। সৌভাগ্যবশত গ্র্যানাইট হাউসে যথেষ্ট বীজ ছিল বলে এই শস্যের ক্ষতিপূরণ করাটা নিতান্ত অসম্ভব হবে না। পাখির বাসা, ওনাগার আস্তাবল-সবই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। জন্তুগুলো ভীতগ্রস্ত হয়ে প্রসপেক্ট হাইটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবই ফের নতুন করে তৈরি করতে হবে।

এইসব দেখেশুনে গম্ভীর-স্বভাব হার্ডিং-এরও রাগে সারা গা জ্বলে যেতে লাগল। কিন্তু কী-ই বা করা যায়? একটু দেখে-শুনে গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন তিনি।

এদিকে হার্বার্টের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে এগিয়ে চলল। দুর্বলতা ক্রমেই বেড়ে চলল। মনে হল তার খুব সাংঘাতিক সংকট আসছে-সেই সংকটের হাত থেকে স্পিলেট

হয়তো-বা তাকে রেহাই দিতে পারবেন না। অবিরাম একটি আচ্ছন্ন অবস্থা আবৃত করে রইল হার্বার্টকে। প্রলাপের লক্ষণও দেখা দিতে লাগল। দেহের উত্তাপে অস্থির হয়ে উঠল সে। জ্বর একবার বাড়ছে, একবার কমছে। ক্রমশ কাপুনিও শুরু হল। নাড়ি খুবই দুর্বল। শরীরের চামড়া গেল শুকিয়ে। তৃষ্ণা বাড়ল অসহ্য রকম। এর উপর আবার হঠাৎ একবার মুখ আর সারা শরীর লাল হয়ে উঠল। তারপর ভয়ানক ঘাম হ'য়ে জ্বরটা খানিকটা কমে গেল। এই আক্রমণ ছিল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

গিডিয়ন স্পিলেট বুঝতে পারলেন, হাবার্টের সবিরাম জ্বর হয়েছে। যে করেই হোক, এই জ্বরকে বন্ধ করতে হবে, নইলে হার্বার্টের রেহাই নেই। কুইনাইন ছাড়া অন্যকিছুতে জ্বর থামবে না। কিন্তু কুইনাইন পাওয়া যাবে কোথায়?

স্পিলেট বললেন : লেকের ধারে উইলো গাছ আছে। আমার মনে হয়, উইলোর ছালে কুইনাইনের কাজ একটু হতে পারে।

তক্ষুনি সাইরাস হার্ডিং নিজে গিয়ে উইলোর খানিকটা ছাল তুলে আনলেন। সেই ছাল গুড়ো করে হার্বার্টকে খাওয়ানো হল। রাত্রের মধ্যে বিশেষ-কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। প্রলাপের ভাব রইল বটে, কিন্তু জ্বর আর বাড়ল না। এইভাবে পরের দিনও কাটল। আবার আশা জাগল পেনক্র্যাফটের মনে। স্পিলেট কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। হয়তো জ্বরটা পালা-জ্বর, পরের দিন ফের এসে চড়াও হবে। সেজন্যে তার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না। হার্বার্ট যেন একেবারে এলিয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক দুর্বল। সঙ্গে সঙ্গে বমির ভাব। লিভারের অবস্থাও খুব ভালো না। এই সময়ে অতিরিক্ত প্রলাপের ভাব দেখে বোঝা গেল, ব্রেনও আক্রান্ত হয়েছে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন শিলেট। হার্ডিংকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন : 'জুরটার ধরনধারণ মারাত্মক। একটা আক্রমণ কোনোরকমে পার হয়েছে। দ্বিতীয় আক্রমণ যদি উপস্থিত হয়, তার আগে থেকে যদি তৃতীয় আক্রমণটা বন্ধ করার ব্যবস্থা না-করতে পারি, তাহ'লে হার্বার্টের আর-কোনো আশা নেই।

উইলোর ছাল তো দেয়া হয়েছে ! বললেন হার্ডিং।

তাতে কী? বললেন শিলেট : উইলোর ছালেরও কুইনাইনের মতো একটু গুণ থাকতে পারে বটে, কিন্তু এ-জ্বরে তাতে কিছু হচ্ছে না। এ-জ্বরে আগে থেকে কুইনাইন দিয়ে তৃতীয় আক্রমণ বন্ধ করতে না-পারলে মৃত্যু অনিবার্য।

সৌভাগ্যবশত এই কথাবার্তার কিছুই পেনক্র্যাফট শুনতে পেলে না—শুনলে সে পাগল হয়ে যেতো।

সাতই ডিসেম্বর মধ্যদিনে দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু হল। সাংঘাতিক হয়ে উঠল তার অবস্থা। মৃত্যু যেন দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছে তার কাছে। অবস্থা এমন হ'ল যে, পেনক্র্যাফটকে সে-ঘর থেকে বাধ্য হয়ে সরিয়ে ফেলতে হ'ল। এই আক্রমণ রইল পাঁচ ঘণ্টা পর্যন্ত। স্পষ্টই বোঝা গেল যে তৃতীয় আক্রমণের ধকল আর ধাক্কা হার্বার্ট আর সইতে পারবে না।

রাত্রে অবস্থা হ’ল আরো ভীষণ। উচ্চ কণ্ঠে প্রলাপ বকতে লাগল সে। তারপর শ্রান্ত হয়ে পড়ে রইল নির্জীবের মতো। অনেকবার স্পিলেটের মনে হল, বুঝি-বা সে ম’রেই গেছে।

পরদিন আটই ডিসেম্বর বার-বার জ্ঞান হারাতে লাগল হার্বার্ট। মাঝে-মাঝে কঙ্কালের মতো হাতদুটি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে লাগল বিছানার চাদর।

স্পিলেট বললেন : আজ রাত্রের মধ্যে যদি জ্বর-নিকবার কোনো শক্তিশালী ওষুধ না-দেয়া যায়, তবে হার্বার্ট নিশ্চয়ই মারা যাবে।

আস্তে-আস্তে বেলা গড়িয়ে গেল। অন্ধকার নিয়ে নেমে এলো রাত্রি। হয়তো-বা হার্বার্টের জীবনের শেষ রাত্রি এটি। অকালেই সে বুঝি পৃথিবীর আলো-হাওয়া ছেড়ে চলল। এই দারুণ জ্বরের একমাত্র ওষুধ যা, লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে তার অস্তিত্ব নেই। রাত্রে ফের দারুন প্রলাপ শুরু হল। শেষ রাত্রে, প্রায় তিনটের সময়, অকস্মাৎ আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হার্বার্ট। প্রবল খিঁচুনিতে মনে হ’ল তার শরীর চুরমার হয়ে যাচ্ছে। নেব কাছে বসে ছিল, সে ছুটে গিয়ে পাশের ঘরের সবাইকে জানালে। এমন সময় টপ হঠাৎ কেন যেন অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল।

সবাই হার্বার্টের ঘরে ছুটে গেলেন। অসহ্য যন্ত্রণায় হার্বার্ট তখন ছটফট করছিল। স্পিলেট তার হাতটা নিয়ে দেখলেন, নাড়ি খুব দ্রুত চলছে। তখন ভোর পাঁচটা। ভোরবেলাকার নরম সোনালি আলো এসে ছুঁয়েছে গ্র্যানাইট হাউসের জানলা। প্রসন্ন, পরিচ্ছন্ন দিনের পূর্বাভাস যেন আকাশে বাতাসে। কিন্তু হায়! বেচারি হার্বার্টের এইটেই বুঝি শেষ দিন।

বিছানার পাশের ছোট্ট টেবিলটার উপর সূর্যের সোনালি আলো এসে পড়ল আলতোভাবে। মৃদু, কোমল হাওয়া বইছে জানলা দিয়ে।

এমন সময় পেনক্র্যাফট অনতিস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে টেবিলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে : সবাই দেখতে পেলেন, টেবিলের উপর ছোট্ট চৌকো একটা কাগজের বাক্স। অবাক কৌতূহল-ভরা কণ্ঠে হার্ডিং বাক্সটার উপরের আবরণের মধ্যে লেখা হরফগুলো উচ্চারণ করলেন :

সালফেট অভ কুইনাইন!!

.

৩.৪ আরো আশ্চর্য ঘটনা

সালফেট অভ কুইনাইন!

সংবিৎ ফিরতেই বাক্সটা খুললেন গিডিয়ন স্পিলেট। ভিতরে প্রায় দুশো গ্রেন শাদা পাউডার। একটু জিভে দিয়ে দেখলেন স্পিলেট। সাংঘাতিক তেতো লাগল। আর-কোনো সন্দেহ নেই। সত্যিই পাউডারটি কুইনাইন।

স্পিলেটের নির্দেশমতো তক্ষুনি এক কাপ কফি বানিয়ে আনলে নেব। কফিতে আঠারো গ্রেন কুইনাইন মিশিয়ে একটু চেষ্টা করে খাওয়ানো হল হার্বার্টকে। সকলের মনে একটু

আশাও ফিরে এলো। দ্বীপের অধিদেবতা ঠিক সময়েই আবার তাদের সাহায্য করেছেন। সুতরাং আর তাহলে ভয় নেই।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অনেকটা শান্ত হল হার্বার্ট। এবার সবাই এই আশ্চর্য ঘটনাটি আলোচনা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে অধিদেবতার হাত সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট, সবচাইতে বেশি উজ্জ্বল। কিন্তু রাত্রে কী করে গ্র্যানাইট হাউসে প্রবেশ করলেন তিনি? এ-কথার কোনো জবাব নেই। লোকটি নিজে যেমন অদ্ভুত, তার কাজকর্ম সবকিছুও তথৈবচ।

সারাদিন, তিন ঘণ্টা পর-পর হার্বার্টকে কুইনাইন দেয়া হল।

পরদিন হার্বার্টের অবস্থার সুস্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল। এখনো বিপদ দূর হয়নি। পালা-জ্বরটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। খুব যত্নের সঙ্গে শুশ্রূষা চলল। এবার ওষুধ আছে হাতের কাছেই, আর ভয় কীসের?

দশ দিন পরে, বিশে ডিসেম্বর থেকেই হার্বার্টের শরীরে রক্ত ফিরে আসতে লাগল।

শরীর এখনো খুব দুর্বল, কিন্তু জ্বর আর ফিরে এলো না। পেনক্র্যাফটের তখন আনন্দ দ্যাখে কে? তৃতীয় আক্রমণের সময়টা যখন নিরাপদেই কেটে গেল, তখন সে আনন্দে দিশেহারা হয়ে স্পিলেটকে এমনভাবে আলিঙ্গন করল যে স্পিলেটের দম বন্ধ হবার উপক্রম।

ডিসেম্বর মাস শেষ হয়ে গেল ভালোয়-ভালোয়। আঠারোশো সাতষট্টি খ্রিষ্টাব্দ শুরু হল বেশ সুন্দর। আকাশ উজ্জ্বল, প্রসন্ন, পরিচ্ছন্ন-সমুদ্রের বাতাস ঠাণ্ডা, নরম, মনোরম। হার্বার্ট ধীরে-ধীরে ভালো হয়ে উঠছে। গ্র্যানাইট হাউসের জানলার পাশে সমুদ্রের হাওয়ায় বসে থাকতো সে। সেইজন্যে খিদে বাড়ল। নে তার জন্যে নানান রকম পুষ্টিকর আহার্য তৈরি করতো।

এই সময়ের মধ্যে বোম্বেটেদের একদিনও গ্র্যানাইট হাউসের ধারে কাছে দেখতে পাওয়া যায়নি। আয়ারটনেরও কোনো খবর পাওয়া গেল না। এতদিন তারা হার্বার্টকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে বেচারি আয়ারটনের জন্য কিছুই করতে পারেননি। এবার হার্বার্ট একটু সুস্থ হতেই আয়ারটনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হার্ডিং। হার্বার্ট আর হার্ডিং-এর বিশ্বাস আয়ারটন বেঁচে আছে, কিন্তু অন্যেরা ধরে নিলেন যে বোম্বেটেদের হাতে নিহত হয়েছে। সে। যা-ই হোক না কেন, হার্বার্ট সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে না-উঠলে এ-ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই করা যাবে না।

জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হার্বার্ট বিছানা থেকে উঠতে শুরু করল। প্রথম দিনে এক ঘণ্টা, দ্বিতীয় দিনে দু-ঘণ্টা, তারপর তৃতীয় দিনে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত বসে থাকবার অনুমতি পেলে। ক্রমে জানুয়ারির শেষ দিকে স্পিলেট তাকে প্রসপেক্ট হাইটে আর সমুদ্রতীরে বেড়াবার অনুমতি দিলেন। পেনক্র্যাফট আর নেবের সঙ্গে গিয়ে সমুদ্রে স্নান করে তার আশ্চর্য উন্নতি হল।

সাইরাস হার্ডিং ভাবলেন, এবার অনুসন্ধানে বেরুনো যেতে পারে। সেইজন্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। সবাই প্রতিজ্ঞা করলেন—বোম্বেটেদের সমূলে বিনাশ, আর

অধিদেবতার অন্বেষণ অসম্পূর্ণ রেখে কিছুতেই গ্র্যানাইট হাউসে ফিরবেন না। মার্সি নদীর বাঁ-তীরের অরণ্য পাহাড়-পর্বত যা-কিছু আছে, তা আগেই দেখা হয়েছে। কিন্তু ডানদিককার জায়গাগুলোক্ল অন্তরীপ থেকে শুরু করে রেপ্টাইল য়েণ্ড পর্যন্ত—ভালো করে দেখা হয়নি। তাই ঠিক হল, মার্সি নদীর ডান তীরে যত বন-জঙ্গল আর পর্বতের গুহা-গহ্বর আছে —সব আঁতিপাতি করে না-খুঁজে ক্ষান্তি দেয়া চলবে না।

ওনাগাদুটি বিশ্রাম পেয়ে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। রসদপত্র, বাসনকোশন, একটা স্টোভ–সবকিছুই গাড়িতে বোঝাই করা হল। বোম্বেটেরা যে স্বাধীনভাবে বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে-সে-কথা ভুলে গেলে চলবে না। এই গভীর গহন অরণ্যের মধ্যে গুলি দু-পক্ষই চালাতে পারে। সুতরাং দ্বীপবাসীদের দলবদ্ধ হয়ে চলতে হবে, ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে চলবে না। এও ঠিক হল যে, গ্র্যানাইট হাউসে কেউ থাকবে না। টপ আর জাপও যাবে দলের সঙ্গে। দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট হাউসে পাহারার কোনো দরকার নেই।

চোদ্দই ফেব্রুয়ারি, যাত্রার আগের দিন।

সেদিন ছিল রবিবার। সেদিনটা সবাই জিরোলেন; হার্বার্টের জন্যে জায়গা ঠিক হল গাড়ির ভিতরে, কারণ সে সুস্থ হয়ে উঠলেও তার শারীরিক দুর্বলতা অপগত হয়নি। পরদিন ভোরবেলা লিফটটা টুকরো-টুকরো করে তুলে রাখা হল। যে-সিঁড়িটা ছিল, সেটা চিমনিতে নিয়ে গিয়ে মাটিতে গর্ত করে পুঁতে রাখা হল-ফিরে এসে যাতে সেটা সহজে পেতে পারেন।

সবাই গ্র্যানাইট হাউস থেকে ইতিপূর্বেই নেমে এসেছিলেন, সেখানে ছিল শুধু পেনক্র্যাফট। সে তার কাজকর্ম শেষ করে মোটা একটা দড়ি বেয়ে সকলের শেষে এসে নামলে।

চিমনির সামনে সমুদ্রতীরে গাড়িটা অপেক্ষা করছিল। হার্বার্ট প্রথম কয়েক ঘণ্টা গাড়িতেই যাবে। তবে, সে জাপকে তার পাশে বসিয়ে নিলে। জাপ অবিশ্যি তাতে কোনো আপত্তিই করলে না।

মার্সি নদীর বাঁক পেরিয়ে গাড়ি প্রথমে বাঁ-তীর দিয়েই এক মাইল পথ গেল। সেখানে সেতুটি পেরিয়ে অরণ্যের গহনে প্রবেশ করল। সুদূর পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত সেই অরণ্য। কড়ল দিয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ করে-করে সবাই চলতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে তাদের আসার সঙ্গে-সঙ্গে নানান জাতের পাখি, এবং ফ্ল্যাগুটি, ক্যাপিবরা, ক্যাঙারু প্রভৃতি জন্তু ডেকেডেকে পালিয়ে যেতে লাগল।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : জন্তুগুলোকে আগে যেমন দেখেছিলুম, এখন যেন তার চেয়ে ভিতু হয়েছে। সুতরাং এ-পথে নিশ্চয়ই বোম্বেটেরা যাওয়া-আসা করেছে। নিশ্চয়ই তাদের কিছু না কিছু চিহ্ন পাওয়া যাবে।

সত্যিই, জায়গায়-জায়গায় দেখে মনে হল—যেন লোকজন সে-পথে গিয়েছে। ডালপালা ভাঙা, কোথাও-বা নরম মাটিতে পদচিহ্ন, আবার কোনোখানে পড়ে আছে ছাই। কিন্তু কোথাও একটা রীতিমতো আড্ডার জায়গা দেখা গেল না। সাইরাস হার্ডিং সবাইকে শিকার করতে বারণ করলেন। বন্দুকের আওয়াজ শুনলে বোম্বেটেরা হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।

তা ছাড়া শিকার করতে হলেই গাড়ি ছেড়ে দূরে যেতে হবে। হার্বার্টের গাড়ি নিঃসহায় রেখে যাওয়াটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রথম দিন সন্ধের আগে গ্র্যানাইট হাউস থেকে ন-মাইল দূরে একটা ঝরনার ধারে রাত্রি-বাসের ব্যবস্থা করা হল। ঝরনাটা গিয়ে পড়েছে মার্সি নদীতে। এই ঝরনাটার কথা আগে জানা ছিল না। সারাদিনের পরিশ্রমে সাংঘাতিক খিদে পেয়েছিল। সবাই খুব তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন। এবার রাত্রিটা যাতে নিরাপদে কেটে যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু বুনো জানোয়ারের কথা হলে অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে ঘুমোলেই যথেষ্ট হত। কিন্তু বোম্বেটেদের চিন্তাটাই বেশি, সুতরাং আগুন জ্বাললে ফল হবে বিপরীত। আগুন দেখে ভয় পাওয়া দূরে যাক, তারা আরো অতর্কিত আক্রমণের সুবিধের জন্যে উৎসাহিত হয়ে উঠবে। এমন অবস্থায় সতর্ক পাহারার প্রয়োজন। ঠিক হল, এক দলে স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট, অন্য দলে হার্ডিং আর নেব পাহারা দেবেন।

নিরাপদেই কেটে গেল রাতটা। পরদিন ষোলোই ফেব্রুয়ারি আবার রওনা হলেন সবাই। বোম্বেটেদের আরো কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল। এক জায়গায় দেখা গেল সদ্য-নেবানো আগুনের অবশিষ্ট। তার আশপাশে মাটিতে পদচিহ্ন। গুনে দেখা গেল, পাঁচজনের পায়ের দাগ। ষষ্ঠ ব্যক্তির পায়ের দাগ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বললে হার্বার্ট : আয়ারটন তাদের সঙ্গে ছিল না।

না, বললেন পেনক্র্যাফট : আর তাদের সঙ্গে ছিল না বলেই বোঝা যাচ্ছে যে শয়তানরা ওকে হত্যা করেছে। শয়তানগুলোর যদি একটা নির্দিষ্ট কোনো আস্তানা থাকতো, আর সেখানে একবার গিয়ে হাজির হতে পারতুম—

কিন্তু এই প্রতিশোধে তো আয়ারটনকে ফিরিয়ে আনা যাবে না! ষষ্ঠ পদচিহ্ন যখন দেখা গেল না, তখন, ঈশ্বর, আয়ারটনকে দেখবার আশা বুঝি-বা ছাড়তে হয়?

সেদিন সন্ধের আগে গ্র্যানাইট হাউস থেকে চোদ্দ মাইল দূরে সবাই রাত কাটালেন। হার্ডিং হিশেব করে দেখলেন, রেপ্টাইল য়ে আরো পাঁচ মাইল দূরে। পরদিন সবাই একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে হাজির হলেন। গোটা অরণ্য ঘুড়ে দেখা হয়েছে। কিন্তু বোম্বেটেদের আস্তানা দেখতে পাওয়া গেল না। দ্বীপের গুপ্ত অধিদেবতার বাসস্থানটিও অজ্ঞাতই থেকে গেল।

পরদিন আঠারোই ফেব্রুয়ারি রেপ্টাইল য়েণ্ড আর নদীধারার মধ্যবর্তী অরণ্য-অঞ্চল খুব ভালো করে খুঁজে দেখা হল, কিন্তু বোম্বেটেদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

সাইরাস হার্ডিং বললেন, বোম্বটেরা তাহলে গেল কোন্ দিকে! আমার মনে হয়, বললেন পেনক্র্যাফট : তারা আবার কোর‍্যালেই ফিরে গেছে।

আমার কিন্তু তা মনে হয় না, বললেন হার্ডিং, কারণ তারা জানে যে আমরা তাদের খুঁজে-খুঁজে কোর‍্যালেও যেতে পারি। কোর্যালটা তো তাদের শুধু ভাড়ার। সেখানে দিন কাটানোর মৎলব তাদের একটুও নেই।

স্পিলেট বললেন : আমারও তা-ই মনে হল। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের কোথাও কোনো গুহার মধ্যেই নিশ্চয়ই তাদের আস্তানা।

পেনক্র্যাফট বললে : তাহলে আর দেরি কেন? চলুন, কোর‍্যালেই যাওয়া যাক।

না, বললেন হার্ডিং : শুধু তো বোম্বেটেদের আস্তানা বার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, পশ্চিম তীরের বনে-পর্বতে অধিদেবতার সন্ধানও করতে হবে।

সেদিন বিকেলে নদীর কাছেই রাত কাটানোর ব্যবস্থা হল।

উনিশে ফেব্রুয়ারি সবাই সমুদ্রতীর ছেড়ে নদীর বাঁ-দিকের তীর ধরে চললেন। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন এখান থেকে ছ-মাইল দূরে। নদীর উপত্যকা খুব ভালো করে দেখতে দেখতে খুব হুঁশিয়ার হয়ে কোর‍্যালের দিকে অগ্রসর হওয়াই ছিল হার্ডিং-এর মৎলব। কোর্যালটা যদি দস্যুরা দখল করে থাকে, তবে দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আর যদি কোর্যাল ফাঁকা থাকে তবে কোর‍্যালেই বাস করা হবে বলে ঠিক হল, কেননা সেখান থেকে মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনে অনুসন্ধান চালানো বেশি সুবিধের।

মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের খুব-বড়ো দুটি শাখার মধ্যকার সংকীর্ণ উপত্যকাটি ধরে তাঁরা চললেন। চারদিকে উঁচু পাথরের কূপ। জমি অত্যন্ত এবড়ো-খেবড়ো। ইচ্ছে করলে আশপাশে একাধিক লোক লুকিয়ে থাকতে পারে। খুব সতর্ক হয়ে চললেন সবাই। বিকেল পাঁচটার সময় কোর‍্যালের বেড়া দেখতে যাওয়া গেল। কিন্তু কোর‍্যালে যাওয়ার আগে ভালো। করে খবর নিতে হবে সেখানে লোক আছে কি না। দিনের আলোয় সে-

চেষ্টা করা বিপজ্জনক। এইভাবেই আহত হয়েছিল হার্বার্ট। কাজে-কাজেই রাত্রির ঘন অন্ধকারের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

রাত আটটার সময় স্পিলেট পেনক্র্যাফটের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে তৈরি হলেন। হার্ডিং বলে দিলেন : তোমরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে, সবকিছু বিবেচনা করে, কাজ কোরো। মনে রেখো, তোমরা শুধু দেখতে যাচ্ছো কোর‍্যালে লোক আছে কি নেই; সেটা দখল করতে যাচ্ছে না।

তারপর দুজনে যাত্রা করলেন। গাছের নিচে গাঢ় অন্ধকার। দশ-পনেরো হাত দূরের কিছুই দেখা যায় না। একটু শব্দ হলেই তারা থমকে দাঁড়ালেন। এইভাবে খুব সাবধান হয়ে দুজনে এগুতে লাগলেন। ক্রমশ তারা অরণ্যের পরের খোলা জায়গাটায় এলেন–এর পর থেকে শুরু হয়েছে কোর‍্যালের বেড়া। এখানে এসেই তারা থেমে দাঁড়ালেন। আর ত্রিশ ফুট দূরেই কোর‍্যালের দরজা। দূর থেকে মনে হল দরজা যেন বন্ধ রয়েছে।

এই ত্রিশ ফুট জায়গা পেরুনোই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সত্যি, বেড়ার ভিতর থেকে যদি দু-তিনটে বন্দুকের গুলি ছুটে আসে তাহলে বিপদের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় খুব বিবেচনা করে কাজ করা চাই।

উত্তেজনায় সাত-পাঁচ না-ভেবেই এগুতে যাচ্ছিল পেনক্র্যাফট, কিন্তু স্পিলেট তার হাত ধরে বাধা দিলেন। ফিশফিশ করে বললেন, আরেকটু পরেই ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে, তখন এই জায়গাটা পেরুবার চেষ্টা করবো।

আস্তে-আস্তে আরো ঘন হল অন্ধকার। স্পিলেট আর পেনক্র্যাফট বন্দুক-হাতে বুকে হেঁটে কোর‍্যালের দিকে এলেন। কোর‍্যালের দরজার কাছে এলে দেখা গেল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তারা জানেন দস্যুরা কোর‍্যালের ভিতরেই আছে। বেড়ার ভিতরে কোনো শব্দ নেই। কোর্যাল একেবারে নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ। তাঁরা ভাবতে লাগলেন বেড়া পেরিয়ে ভিতরে যাবেন কিনা। কিন্তু তাহলে যে হার্ডিং-এর কথা মানা হয় না। কাজেই হার্ডিং-এর কাছে ফিরে যাওয়াই তারা কর্তব্য বলে মনে করলেন। সন্তর্পণে ফিরে এসে তারা হার্ডিংকে সবকিছু খুলে বললেন।

সব শুনে একটুক্ষণ কী যেন ভাবলেন হার্ডিং, তারপর বললেন : তবে আর দেরি নয়, চলো কোর‍্যালে। গাড়িটাও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। কেননা, গাড়িতে আমাদের সব জিনিশপত্র রয়েছে। তাছাড়া দরকার হলে গাড়িটাকে একটা ঢাল হিশেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

তখন গাড়ি নিয়ে সবাই কোর‍্যালের দিকে চললেন। ঘন ঘাসের উপর দিয়ে চলছিলেন বলে কোনো শব্দই হল না। অন্ধকার তখন আরো ঘন হয়েছে। জাপ চলল সবার পিছনে। টপের গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে নে চলল সবার আগে-আগে।

নিঃশব্দ পায়ে নিরাপদে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে এসে সবাই কোর‍্যালের বেড়ার কাছে এসে হাজির হলেন। সেখানে জাপ আর টপকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে রেখে অন্য-সবাই দরজার দিকে চললেন। গিয়ে দেখলেন, দরজাটা একেবারে খোলা। সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

পেনক্র্যাফট বললে : আমি শপথ করে বলতে পারি, একটু আগে দরজা বন্ধ দেখে গেছি!!

ভাবনার কথা। বিপদেরও। দস্যুরা তাহলে কোর‍্যালের মধ্যেই আছে!

সম্ভবত কেউ-একজন দরজা খুলে বাইরে গিয়েছে।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী করে বোঝা যাবে। এদিকে হার্বার্ট একটু ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। সে দ্রুত পায়ে ফিরে এসে হার্ডিং-এর হাত চেপে ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বললে : ভিতরে একটা আলো।

ঘরের মধ্যে?

হ্যাঁ।

তখন পাঁচজনেই এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, ঘরের জানলা দিয়ে ক্ষীণ, কম্পিত একটা আলোকরেখা এসে পড়েছে বাইরে। হার্ডিং ফিশফিশ করে বললেন : এইই আমাদের সুযোগ। দস্যুরা ঘরের মধ্যে একসঙ্গে রয়েছে। জানতেও পারেনি যে আমরা এসেছি। এখন তো তারা হাতের মুঠোয়। এগিয়ে চলো সবাই!

তখন দু-ভাগ হয়ে-এক দলে হার্ডিং পেনক্র্যাফট আর স্পিলেট, অন্য দলে হার্বার্ট আর নেবসবাই কোর‍্যালের বেড়া ধরে-ধরে এলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুটিরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলেন সবাই। হার্ডিং শব্দহীন পায়ে চুপি-চুপি এগিয়ে জানলা

দিয়ে উঁকি মারলেন। ভিতরের একটা টেবিলে আলো জ্বলছে। টেবিলের পাশেই আয়ারটনের সেই বিছানা। বিছানার উপরে কে-একজন শুয়ে আছে।

হঠাৎ হার্ডিং পিছনের দিকে হঠে এসে নিচু, উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন : আয়ারটন! তক্ষুনি সজোরে দরজা খুলে সবাই ভিতরে ঢুকলেন। মনে হল, আয়ারটন ঘুমুচ্ছে। তার সারা গায়ে আঘাতের নীল দাগ। বোঝা যায়, নিষ্ঠুর অত্যাচার হয়েছে তার উপর।

তার হাত ধরে ঝাঁকি দিলেন হার্ডিং, বললেন : আয়ারটন!

কে? কে আপনি? চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে হার্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে বললে আয়ারটন। তারপর বললে : ও! আপনি! আপনারা এসেছেন?

হ্যাঁ আয়ারটন, আমরা এসেছি।

আমি কোথায়?

কোর‍্যালে, তোমার সেই ঘরে।

একা ছিলুম?

হ্যাঁ একাই।

কিন্তু, তারা হয়তো এক্ষুনি ফিরে আসবে! শিগগির অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি হোন!–এই বলেই আয়ারটন আবার এলিয়ে পড়ল।

হার্ডিং বললেন : দস্যুরা কখন এসে আক্রমণ করবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পেনক্র্যাফ্ট, শিগগির গাড়িটা ভিতরে নিয়ে এসে কোর‍্যালের দরজা খুব ভালো করে বন্ধ করে দাও।

পেনক্র্যাফট আর নেবকে নিয়ে এসে মুহূর্তেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন স্পিলেট। গিয়ে শুনলেন, টপ রাগে গোঁ-গোঁ করছে। এদিকে হার্ডিংও হার্বার্টকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। দরকার হলেই গুলি চালাবেন। কিন্তু কিছু দেখতে পাওয়ার আগেই শুনতে পেলেন, সেই মূহুর্তে ভীষণভাবে ডেকে উঠল টপ। দড়ি ছিঁড়ে ছুটল কোর‍্যালের পিছন দিকে। সবাই বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি হয়ে রইলেন। এদিকে জাপও টপের কাছে ছুটে গেল। শুরু করে দিলে ভীষণ চাচামেচি।

জাপের পিছন পিছন ছুটলেন সবাই। ছোট্ট ঝরনাটির কাছে এসে থামলেন। সেখানে চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল, ঝরনার ধারে পাঁচটা মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতদেহ পাঁচটা পাঁচজন বোম্বেটের!!

এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল কী করে? কে হত্যা করলে দস্যুদের? আয়ারটন? উঁহু, অসম্ভব! মুহূর্ত আগেও সে বলেছিল-তৈরি হোন, কখন দস্যরা ফিরে আসে। এই কথা বলবার পরক্ষণেই সেই-যে জ্ঞান হারিয়েছে, এখনো সে-জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। সুতরাং এ-অন্য-কারু কাজ। কিন্তু, সেই অন্য-কেউটি কে? কে?-

সারা রাত্রি আয়ারটনের ঘরেই কাটালেন সবাই। পরদিন ভোরবেলা জ্ঞান ফিরে এলো আয়ারটনের। একশো চারদিন পরে সকলের সঙ্গে ফের দেখা হওয়ায় কী-রকম

আনন্দের ব্যাপার হল, তা নিশ্চয় না-বললেও চলবে। এরপর আয়ারটন তার যতটুকু জানা ছিল সবকিছুই খুলেই বললে :

—গত এগারোই নভেম্বর সে কোর‍্যালে যায়। তার পরদিনই রাত্রিবেলায় হঠাৎ বোম্বেটেরা এসে তার হাত-পা-মুখ এমনভাবে বেঁধে রাখলে, যাতে সে কথা বলতে না-পারে। তারপর তাকে মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের নিচে একটা ঘন-অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে নিয়ে রাখলে। সেই গহ্বরটাই ছিল বোম্বেটেদের আড্ডা। তাকে মেরে ফেলাই ঠিক হল। পরদিন যখন দস্যুরা তাকে হত্যা করতে যাবে, এমন সময় দলের একটা বোম্বেটে তাকে হঠাৎ চিনতে পারলে : এ-যে অস্ট্রেলিয়ার সেই বেন জয়েস। তখন থেকে তাকে তাদের দলবদ্ধ করবার জন্যে বোম্বেটেরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। তারা এমন স্বপ্নও দেখতে শুরু করলে যে আয়ারটনের সাহায্যে দুর্ভেদ্য গ্র্যানাইট হাউস দখল করবে, হত্যা করবে সকলকে, তারপর মালিক হয়ে বসবে এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের।

কিন্তু যখন কোনোমতেই আয়ারটনকে হাত করা গেল না, তখন বোম্বেটেরা তার হাত, পা বেঁধে, মুখে রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে সেই গহ্বরে ফেলে রাখলে। এইভাবে সেই গহ্বরে প্রায় চার মাস ছিল আয়ারটন। বোম্বেটেরা কোর‍্যালে থেকে আয়ারটনের জন্যে সঞ্চিত আহার্য এনে আহার করতো, কিন্তু কোর‍্যালে বাস করতো না। এগারোই নভেম্বর দুজন বোম্বেটে কোর‍্যালে গিয়েছিল। সেখানে তারা হঠাৎ দ্বীপবাসীদের দেখতে পায়। তক্ষুনি একজন বোম্বেটে হার্বার্টকে গুলি করে। অন্য বোম্বেটেটাকে হার্ডিং হত্যা করেন। যে-বোম্বেটেটা আহত হয়নি, তার মুখে আয়ারটন হার্বার্টের মৃত্যু হয়েছে এই কথা শোনে। আসলে হার্বার্ট যে আহত হয়েছে, মারা যায়নি, একথা আয়ারটন জানতে পারেনি। আহত হার্বার্টকে নিয়ে সবাই যখন কোর‍্যালে ছিলেন, তার মধ্যে দস্যুরা কখনও সেই গহ্বর

পরিত্যাগ করেনি। এমনকী খেত-খামারের সর্বনাশ করে ফের তারা ওই গহ্বরেই ফিরে এসেছিল।

এর পর থেকে কিন্তু আয়ারটনের উপরে অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। দস্যরা গহ্বর ছেড়ে খুব কমই বেরুত। আয়ারটনও দ্বীপবাসীদের আর-কোনো খবর জানতে পারেনি। অবশেষে দস্যুদের অকথ্য, অসহ্য যন্ত্রণায় বেচারার দৃষ্টিশক্তি আর শ্রবণশক্তি প্রায় লোপ পেলো। তারপর কী-কী ঘটেছে, তা সে জানে না।

এরপর আয়ারটন জিগেস করলে : আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আমি তো গহ্বরে অজ্ঞান অবস্থায় বন্দী ছিলুম, কিন্তু এখানে এলুম কী করে?

দস্যুরা যে ঝরনার পাশে মরে পড়ে আছে, বললেন হার্ডিং : সেইটেই বা হল কী করে?

কী! সচমকে বললে আয়ারটন : কী! মরে পড়ে আছে!!—

এই কথা বলেই আয়ারটন ওঠবার চেষ্টা করলে। সবাই তাকে ধরে তুললেন, তারপর সেইভাবে ধরে-ধরে সেই ছোট্ট ঝরনার দিকে নিয়ে চললেন। ততক্ষণে পূর্বাকাশ ফিকে হয়ে এসেছে। রাত প্রায় ভোর হয়-হয়। চারদিক বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

ঝরনাধারার পাশে পাঁচটা মৃতদেহ-ঠিক যেমনভাবে ছিল তেমনি পড়ে আছে। এই দৃশ্য দেখে আয়ারটন একেবারে হতবাক হয়ে পড়ল। মনে হল, তার বুদ্ধি যেন লোগ। পেয়ে গেছে।

তখন হার্ডিং-এর নির্দেশ অনুযায়ী পেনক্র্যাফ্ট আর নেব মৃতদেহগুলো ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল। স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন কারু শরীরে নেই। তবে, একটা করে হাতের মতো লাল দাগ কারু বুকে, কারু পিঠে, কারু-বা কাঁধের উপর দেখতে পাওয়া গেল।

স্পিলেট বললেন : এই দাগগুলোই আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু, এ কোন্ অস্ত্রের আঘাত?

এমন-কোনো অস্ত্রের আঘাত-বললেন হার্ডিং : যার ক্রিয়া বিদ্যুতের মতো।

এমন সাংঘাতিক, প্রাণঘাতী আঘাত করলে কে?

হার্ডিং বললেন : আর কে করবে? এও আমাদের সেই অজ্ঞাত উপকারী বন্ধুর কাজ। আয়ারটন, তোমাকেও তিনিই পর্বত-গহ্বর থেকে কোর‍্যালে এনে রেখেছিলেন।

এরপর নেব আর পেনক্র্যাফ্ট ছাড়া অন্য-সবাই কোর‍্যালের ভিতরে চলে গেলেন। তারা দুজনে মৃতদেহগুলো দূরে বনের মধ্যে নিয়ে কবর দিলে।

আয়ারটন দস্যুদের কবলে পড়বার পর যে-সব ঘটনা ঘটেছিল, সবকিছুই তাকে খুলে বলা হল। তারপর সাইরাস হার্ডিং বললেন : আমাদের কাজের অর্ধেকটা তো শেষ হল। দস্যুদের আর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, আমাদের ক্ষমতায় তো আর এ-কাজ সম্পন্ন হয়নি।

যার ক্ষমতায় হয়েছে—বললেন স্পিলেট : তার খোঁজ করাই এখন আমাদের প্রধান কাজ। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গুহা, গহ্বর, সমস্তকিছু তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে আমাদের।

হার্ডিং বললেন : নিশ্চয়ই দেখতে হবে। তবে আমি আবারও বলছি, তিনি ইচ্ছে করে দেখা না-দিলে আমাদের কারু সাধ্য নেই যে তাকে খুঁজে বার করি।

পেনক্র্যাফট বললে : আমাদের যে আরো-একটা কাজ বাকি রয়েছে। টেবর আইল্যাণ্ডে গিয়ে আয়ারটনের কথা জানিয়ে আসতে হবে।

আয়ারটন শুধোলো : টেবর আইল্যাণ্ডে যাবে কী করে?

কেন? বন-অ্যাডভেনচার-এ চড়ে!

বন-অ্যাডভেনচার-এর অস্তিত্ব থাকলে তো! দিন-আষ্টেক আগে বোম্বেটেরা বনঅ্যাডভেনচার-এ চড়ে সমুদ্রে বেরিয়েছিল। এদের কেউ তো হার্ডির মতো নৌকো চালাতে জানতো না! কাজেই পাহাড়ে লেগে বন-অ্যাডভেনচার ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

আঁ! কী সর্বনাশ!–

দারুণ দুঃখ পেলে পেনক্র্যাফট, অন্যরাও অত্যন্ত মর্মাহত হলেন।

হার্বার্ট বললে : দুঃখ কোরো না, পেনক্র্যাফট, আমরা আরেকটা নৌকো বানিয়ে নেবো। এবার বানাবো আরো বড়ো করে।

পেনক্র্যাফট বললে : সে-রকম নৌকো বানাতে অন্তত পাঁচ-ছ মাস লাগবে।

কী আর করা যাবে। বললেন স্পিলেট : এ-বছর টেবর আইল্যাণ্ডে যাওয়াটা বন্ধই রাখতে হবে।

এরপর, উনিশে ফেব্রুয়ারি অনুসন্ধান শুরু হল। মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিনের গুহাগহ্বরের সীমাসংখ্যা ছিল না। দ্বীপবাসীরা একটা-একটা করে খুঁজে বার করে দেখতে লাগলেন। অগ্ন্যুৎপাতের সময় থেকে যে-সব টানেল আর নালাগুলো ছিল, যার ভিতর দিয়ে একদা কত গলিত লাভা ইত্যাদি বেরিয়েছে—সবই তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখা হল।

একটা গহ্বরের শেষপ্রান্তে এসে হাজির হলে পর সাইরাস হার্ডিং শুনতে পেলেন, যেন পাহাড়ের ভিতরে গভীর গুম-গুম একটা গর্জন হচ্ছে। স্পিলেট তার সঙ্গে ছিলেন। এই শব্দ তাঁরও কান এড়ালো না। মনে হল—পৃথিবীর অভ্যন্তরের বহুকালের নিভন্ত আগুন যেন আবার জ্বলতে শুরু করেছে। অনেকক্ষণ শুনে দু-জনে ঠিক করলেন—মাটির নিচে কোনোরকম রাসায়নিক ক্রিয়া শুরু হয়েছে, যার ফল অত্যন্ত বিপজ্জনক।

স্পিলেট বললেন : তবে তো দেখছি আগ্নেয়গিরি একেবারে মরে যায়নি!

হার্ডিং বললেন : মরা আগ্নেয়গিরিও আবার অনেক সময় প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে।

স্পিলেট বললেন : মাউন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন যদি আবার অগ্ন্যুদ্গার করে তবে তো লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের আর রেহাই নেই!

তা মনে হয় না–বললেন হার্ডিং : অগ্নাদগার হলেও পুরোনো পথ দিয়েই গলিত ধাতু প্রভৃতি সব জিনিশ হ্রদের দিকে পাহাড়ের উপত্যকার দিকে চলে যাবে। গ্র্যানাইট

হাউসের কোনো বিপদ হবে বলে আমার মনে হয় না। তবু, এই অগ্ন্যুদ্গারটা হলে আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক মারাত্মক হবে। এটা না-হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট গহ্বর থেকে বেরিয়ে অন্য সবাইকে এই সম্ভাব্য বিপদের কথা বললেন।

শুনে পেনক্র্যাফট কথাটাকে উড়িয়েই দিলে। বললে : হুঁ, হোক না অগ্ন্যুৎপাত! আমাদের শুভাকাঙকী বন্ধুই তো রয়েছেন। তাহলে আর ভয় কী?

সে যা-ই হোক, এত যে পরিশ্রম করা হল, কষ্ট করা হলতার কোনো ফলই হল না। কোনো খোঁজই পাওয়া গেল না সেই হিতাকাঙক্ষী বন্ধুর। তখন সবাই এ-কথা মানতে বাধ্য হলেন যে, দ্বীপের উপরটায় উনি থাকেন না। এই সিদ্ধান্তকে হতাশভাবে মেনে নিয়ে সবাই পঁচিশে ফেব্রুয়ারি গ্র্যানাইট হাউসে ফিরে এলেন।

রহস্য ঘনীভূত

৩.৫ রহস্য ঘনীভূত

রিচমণ্ড থেকে পালানোর পর লিঙ্কন দ্বীপে বাস তিন বছর পূর্ণ হয়েছে। লড়াই যে এতদিনে শেষ হয়েছে, দ্বীপবাসীদের সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রায়ই এ-বিষয়ে এঁদের মধ্যে আলোচনা হত। এতদিন পর্যন্ত দেশে ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগই পাওয়া যায়নি। আর সুযোগ পাওয়া যায়নি বলেই দ্বীপটার উন্নতির জন্যে প্রাণপণে খেটেছে—বলা যায় তো না–হয়তো-বা এই দ্বীপ ছেড়ে যাওয়া জীবনে আর সম্ভব না-ও হতে পারে-আর এই দ্বীপেই যখন থাকতে হবে, তখন দ্বীপটাকে বাসযোগ্য করে তোলা উচিত। এই ভেবে তারা দ্বীপটার উন্নতির জন্যে খেটেছেন, খাটতে-খাটতে মায়া পড়ে গেছে দ্বীপটার উপর। আর তাই তারা ঠিক করলেন যে নিজেদের হাতে-গড়া এই দ্বীপেই জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দেবেন। তবে, তার আগে অন্তত দিন-কয়েকের জন্যে হলেও দেশে ফিরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে আসার ইচ্ছে সকলের মনেই প্রবল। কিন্তু মানুষ তো অনেক কিছুই ভাবে—সব কি আর ঘটে?

সে-ইচ্ছে পূর্ণ হতে পারে দুই উপায়ে-হঠাৎ যদি কোনো জাহাজ এসে লিঙ্কন দ্বীপে ভিড় জমায়, কিংবা সমুদ্রযাত্রার উপযোগী একটা বড়ো জাহাজ যদি এঁরা প্রস্তুত করে নিতে পারেন। মোটামুটিভাবে কাজ-চালানো-গোছ একটা জাহাজ তৈরি করতে কম করেও মাসছয়েক লাগবে।

সাইরাস হার্ডিং একদিন পেনক্র্যাফটের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করতে-করতে শুধোলেন : একটা বড়ো জাহাজ তৈরি করতে ক-দিন লাগবে বলতে পারো? জাহাজ যখন তৈরি করতে হবে, তখন বেশ বড়ো করে তৈরি করাই ভালো। স্কটিশ জাহাজ টেবর দ্বীপে আসবে কি না তার কোনো ঠিক নেই, হয়তো-বা এর মধ্যেই এসে সেখানে আয়ারটনের সন্ধান না-পেয়ে ফিরে গেছে। সুতরাং এমন জাহাজ তৈরি করতে হবে, যাতে শুধু টেবর দ্বীপে নয়—নিউজিল্যান্ড কিংবা অন্য কোনো বড়ড়া দ্বীপে যাওয়াও সম্ভব হয়। তোমার কী মনে হয় পেনক্র্যাফট?

আমার মনে হয় পেনক্র্যাফট বললে : যখন কাঠ বা যন্ত্রপাতির কোনো অভাব নেই তখন যত বড়ো ইচ্ছে তত বড়ো জাহাজই আমরা তৈরি করতে পারবো। তবে, সময় লাগবে।

সাইরাস হার্ডিং কী-যেন ভাবলেন। বললেন : আচ্ছা, আড়াইশো-তিনশো টনের জাহাজ তৈরি করতে ক-দিন লাগবে বলে মনে হয়?

সাত-আট মাস তো লাগবেই। পেনক্র্যাফট জবাব দিলে : তার উপর আবার শীত পড়ছে শিগগিরই, সে-কথাটাও মনে রাখতে হবে–শীতের সময় কাঠের কাজ বড়ো ঝামেলার। তা এখন থেকে শুরু করলে আসছে নভেম্বর নাগাদ জাহাজ শেষ হতে পারে। আপনি নকশার খশড়া করে ফেলুন-আমরা কাঠটাঠ কেটে সব ঠিক করে রাখি।

চিমনির কাছেই একটা জায়গা ঠিক করা হল। জাহাজ তৈরি করবার জন্যে সাইরাস হার্ডিং সেখানে একটা ডকইয়ার্ডের মতো তৈরি করলেন। জাহাজের ডেক, খোল,

সবকিছুর জন্যেই বন থেকে কাঠ কেটে এনে ডকইয়ার্ডে জড়ো করা হল। সাইরাস হার্ডিং তখন জাহাজের নকশা আর ছোটো একটা মডেল তৈরি করতে শুরু করলেন।

প্রসপেক্ট হাইটের সর্বনাশ করে গিয়েছিল দস্যুরা। তাদের আবার নতুন করে ঘরবাড়ি, ফসলের খেত, মিল, সবকিছু তৈরি করতে হল। টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত দস্যুদের নিষ্ঠুর হাত থেকে রেহাই পায়নি—তাও মেরামত করা হল। দস্যুরা আর নেই, তাই আর দুর্ভাবনাও নেই এখন। তবু, নতুন-কোনো দস্যুদল যে এসে হাজির হবে না, তা কে জানে? দ্বীপের অধিবাসীদের দৈনন্দিন রুটিন হয়ে দাঁড়ালো প্রসপেক্ট হাইটের উপর থেকে দুরবিন নিয়ে চারদিক আঁতিপাঁতি করে খোঁজা! বরাত ভালো যে সন্দেহজনক কিছু দেখা যায়নি কোনোদিন। তবু সাবধানের মার নেই বলে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত।

দিনের পর দিন কাটে। ক্রমে জুন মাস এলো। দারুণ হিম পড়েছিল বলে সবাইকে গ্র্যানাইট হাউসে আশ্রয় নিতে হল। এই নিদারুণ বন্দিত্ব গিডিয়ন স্পিলেটকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত। একদিন স্পিলেট নেবুকে আকুল গলায় বললেন : নেব, তুমি যদি আমাকে কোনোরকম একটা খবর-কাগজের গ্রাহক করে দিতে পারো, তবে দেশে আমার যা-কিছু সম্পত্তি আছে সব তোমাকে লিখে-পড়ে দেবো।

নেব অবিশ্যি তার শাদা ধবধবে বত্রিশটা দাঁত বের করে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিলে, কিন্তু সত্যিই স্পিলেট এই নিদারুণ একঘেয়েমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছিলেন না।

দেখতে-দেখতে জুন জুলাই আগস্ট-শীতের তিন মাস কেটে গেল। এই দীর্ঘ শীতে গ্র্যানাইট হাউসের অধিবাসী সবারই স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল। বাচ্চা জাপের শীতটা একটু

বেশি লাগতো বলে তাকে বেশ-পুরু একটা ড্রেসিং-গাউন তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। পরিচারক হিশেবে জাপ চমৎকার,অমন চালাক-চতুর, কার্যক্ষম, পরিশ্রমী দ্বিতীয়-কাউকে খুঁজে পাওয়া শক্ত।

শীত শেষ হয়ে গেল। বসন্ত এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন একটা আশ্চর্য ঘটনা এসে হাজির হল, যার পরিণাম ভয়াল ও ভয়ংকর। সাতই সেপ্টেম্বর সাইরাস হার্ডিং দেখতে পেলেন ফ্র্যাঙ্কলিন পাহাড়ের চুড়ো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ফ্র্যাঙ্কলিন পাহাড়ের চুড়ো থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে—এই কথা শুনে যেযার কাজকর্ম ফেলে একদৃষ্টে পাহাড়ের চুড়োর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

দীর্ঘ নিদ্রার পর আবার জেগেছে আগ্নেয়গিরি। তবে কি আবার অগ্নিবৃষ্টি শুরু হবে, আবার হবে অগ্ন্যুৎপাত? সে যা-ই হোক, অগ্ন্যুৎপাত হলেও সমস্ত লিঙ্কন দ্বীপটির বিপদ নাও ঘটতে পারে, আগেও এখানে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে গিয়েছে। পাহাড়ের গায়ে উত্তর দিকে রয়েছে আগেকার জ্বালা-মুখ, সেই পুরোনো পথেই হয়তো উৎক্ষিপ্ত গলিত পদার্থ বয়ে যাবে; সুতরাং দ্বীপের তেমন গুরুতর অবস্থা না-ও হতে পারে।

অদূর ভবিষ্যতে কী-কী বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে, সাইরাস হার্ডিং সকলকে বুঝিয়ে বললেন। বিপদ যদি উপস্থিতই হয়, তাকে বাধা দেবার সাধ্য কারু নেই। তবে গ্র্যানাইট হাউস নিরাপদ বলেই মনে হয়। অবিশ্যি দারুণ ভূমিকম্প হলে সারা পর্বত কেঁপে উঠবে,তখন যদি ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের ডান পাশে নতুন কোনো জ্বালামুখের সৃষ্টি হয়, তবে কোর‍্যালের গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

সেদিন থেকে ধোঁয়া বের-হওয়া তো বন্ধ হলই না, বরং দিনের পর দিন যেন ধোঁয়ার পরিমাণ বেড়েই চলল।

জাহাজের কাজে বাধা পড়ল না। ফসল তোলার জন্যে দিন-কয়েক কাজ বন্ধ ছিল, তারপর আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সবাই কাজে লাগলেন।

পনেরোই অক্টোবর। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই মিলে গল্পগুজব করছিলেন। অন্যদিনের চাইতে রাত সেদিন বেশি হয়েছিল। পেনক্র্যাফট ঘুমোতে যাওয়ার জন্যে সবে তখন আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় খাবার ঘরের ইলেকট্রিক বেলটা হঠাৎ ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট, হার্বার্ট, আয়ারটন, পেনক্র্যাফট, নেব—সবাই এখানে, কোর‍্যালে তো কেউ নেই। তবে কেন ইলেকট্রিক বেল বাজল? আর, বাজালোই বা কে?

হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগলেন সবাই। একটু পর সংবিৎ ফিরলে সাইরাস হার্ডিং বললেন : দাঁড়াও-ঘণ্টা যে-ই বাজাক না কেন, যদি কোনো সংকেত করবার জন্যে বাজিয়ে থাকে, তবে আবার নিশ্চয়ই বাজাবে।

নেব বললে : কিন্তু বাজালে কে?

পেনক্র্যাফট বললে : উনি—উনি ছাড়া আর কে বাজাবেন?

পেনক্র্যাফটের কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার ঘণ্টা বেজে উঠল।

সাইরাস হার্ডিং যন্ত্রটার কাছে গিয়ে টরে টক্কা করে প্রশ্ন করলেন : কী দরকার? কী চাই?

একটু বাদে জবাব এল : এক্ষুনি কোর‍্যালে চলে এসো।

সাইরাস হার্ডিং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : এতদিনে সব রহস্যের সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, এ পর্যন্ত দ্বীপে পর-পর যে-সব আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, এতদিনে তার মীমাংসার সম্ভাবনা এসেছে!

অবসাদ, শ্রান্তি-ক্লান্তি, ঘুম—সব ভুলে নীরব কৌতূহলে তক্ষুনি সবাই সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন। শুধু জাপ আর টপ গ্র্যানাইট হাউসে রইল।

কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রি। মেঘে-মেঘে আকাশ ছাওয়া। তারার মিটিমিটি পর্যন্ত। নেই। একটু পরেই হয়তো শুরু হবে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত। যত গাঢ় অন্ধকার হোক না কেন, কোর‍্যালের পথ চেনা, সেখানে যেতে অসুবিধে হবে না। গভীর গহন অন্ধকারেই সবাই রওনা হলেন। কৌতূহলে আর উত্তেজনায় সকলেরই হৃদস্পন্দন চলেছে দ্রুত, কিন্তু মুখে কোনো কথা নেই। পেনক্র্যাফট দু-একবার বললে : একটা মশাল নিয়ে এলে ভালো হত।

সাইরাস হার্ডিং জবাব দিলেন : মশাল কোর‍্যালে গেলেই পাওয়া যাবে।

গ্র্যানাইট হাউস থেকে কোর্যাল পাঁচ মাইল দূরে। রাত সাড়ে নটার সময় সবাই তিন মাইল পথ পেরুলেন। এমন সময় বিদ্যুতের নখে-নখে আকাশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে একাকার হয়ে যেতে লাগল—শুরু হল ঘন-ঘন বজ্রপাত। সেদিকে গ্রাহ্য নেই কারু–একটা অদম্য আকর্ষণ সবাইকে কোর্যালে টেনে নিয়ে চলল।

রাত দশটার সময় বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝলকে কোর্যালের বেড়া দেখতে পাওয়া গেল। কোর্যালের দরজায় পৌঁছনোর সঙ্গে-সঙ্গে সাংঘাতিক ঝড়ে উন্মাদ হয়ে উঠল আকাশ। মুহূর্তমধ্যে কোর্যাল পেরিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সবাই। ভিতরে অন্ধকার জমাট বেঁধে। হার্ডিং দরজায় শব্দ করলেন, কোনো জবাব নেই। সবাই ঘরের ভিতর ঢুকলেন। নেব আলো জ্বাললে না, নেই, কেউ নেই, ঘরের মধ্যে কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই।

কিন্তু এর মানে? তবে কি সমস্তই স্বপ্ন? কিন্তু তাও বা কী করে হবে? টেলিগ্রাম স্পষ্ট বলেছে : এক্ষুনি কোর্যালে চলে এসো, এক্ষুনি! তবে কেউ নেই কেন এখানে?

এমন সময় হার্বার্ট দেখতে পেলে টেবিলের উপর একটা চিঠি পড়ে আছে। হার্ডিং চিঠিটা পড়লেন। তাতে শুধু লেখা : নতুন তারটি অনুসরণ করো।

চিঠি পড়েই সাইরাস হার্ডিং বললেন : চলো—এই তার ধরেই।

স্পষ্টই বোঝা গেল যে, খবর কোর্যাল থেকে পাঠানো হয়নি। পুরোনো তারে নতুন তার লাগিয়ে সেই অজ্ঞাত অধিকর্তার গোপন বাসস্থান থেকে সোজা গ্র্যানাইট হাউসে খবর পাঠানো হয়েছে।

নেব লণ্ঠন হাতে নিয়ে এল—সবাই কোর্য়াল পরিত্যাগ করলেন।

কোর্য়াল থেকে বেরিয়ে সাইরাস হার্ডিং বিদ্যুতের আলোয় দেখতে পেলেন, টেলিগ্রাফের প্রথম খুঁটিটাতেও একটা নতুন তার ঝুলছে; তারটির এক মাথা উপরের তারের সঙ্গে লাগানো; তারপরই তারটা মাটিতে পড়ে সরাসরি বনের মধ্য দিয়ে যেন পশ্চিম দিকে চলে গেছে।

এই তার অনুসরণ করেই সবাই চললেন। তারটা কখনো গাছের নিচু ডালের উপর দিয়ে, আবার কখনো-বা মাটির উপর দিয়ে চলেছে। সাইরাস হার্ডিং ভেবেছিলেন তারটি হয়তো-বা উপত্যকার প্রান্তসীমায় গিয়ে শেষ হবে, আর সেখানেই সন্ধান পাওয়া যাবে সেই অজ্ঞাত অধিদেবতার গোপন বাসস্থানের। কিন্তু সেখানে এসে তার তবুও চলেছে দেখা গেল। তারা পাহাড়ের গায়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরে চললেন। মাঝে-মাঝে এক-একজন ঝুঁকে পড়ে তারটা আছে কিনা দেখতে লাগলেন। বোঝা গেল, তার ক্রমে সমুদ্রের দিকে চলেছে। সমুদ্রের কিনারে পাহাড়ের অভ্যন্তরে বোধহয় গোপন বাসস্থানের খোঁজ পাওয়া যাবে।

রাত প্রায় এগারোটা তখন। হার্ডিং দলবল নিয়ে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা উঁচু টিবির উপর এসে পৌঁছলেন। সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়। প্রায় পাঁচশো ফুট নিচে সমুদ্রের ঢেউ আলুথালু হয়ে গর্জনে-গর্জনে ফেটে পড়ছে।

এখানে এসে তারটি পাহাড়ের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে একটা প্রকাণ্ড ফাটলের ধার দিয়ে। জায়গাটা ভালো নয়, যে-কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে। কিন্তু সকলে তখন অদম্য

কৌতূহলে দ্রুত পায়ে চলেছেন। বিপদের কথা কারু মনেও হল না। একবারের জন্যেও না। এই সাংঘাতিক জায়গাটা সাবধানে পেরিয়ে শেষে তারা নিচের দিকে নামতে নামতে দেখতে পেলেন, তারটা তাদের সমুদ্রতীরে নিয়ে এসেছে। সাইরাস হার্ডিং তখন হাত দিয়ে তারটা ধরে দেখলেন। তারটা সমুদ্রের জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দারুণ নিরাশায় সবাই হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তবে কি গোপন আস্তানা সন্ধান করবার জন্যে জলে ডুবতে হবে? সাইরাস হার্ডিং সবাইকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন।

পাহাড়ের গায়ে একটা গহ্বরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বললেন : আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন ভরা জোয়ার-ভাটার সময় নিশ্চয়ই পথটা ভেসে উঠবে।

পেনক্র্যাফ্ট শুধোলে : পথ যে একটা আছে, এ আপনি কী করে আন্দাজ করলেন?

ওঁর কাছে যাবার পথ না-থাকলে, দৃঢ় কণ্ঠে হার্ডিং জবাব দিলেন : উনি কক্ষনো আমাদের ডেকে পাঠাতেন না।

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে সাইরাস হার্ডিং এ-কথা বললেন যে সকলেরই বিশ্বাস হল যে পথ জোয়ারের জলে ডুবে গেছে; ভাঁটার সময় সেটা যে ভাসতে পারে, আর তখন সেপথে যাওয়া সম্ভবপর-এ তো আর কোনো অসম্ভব আজব ব্যাপার নয়!

সবাই সেই গহ্বরের ভিতর অপেক্ষা করতে লাগলেন। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ে-পাহাড়ে তুফানি হাওয়া আর বজ্রপাতের শব্দ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে সৃষ্টি করছে। এক তুলকালাম কাণ্ড।

রাত তখন দুপুর, সাইরাস হার্ডিং লণ্ঠন হাতে সমদ্রতীরে নামলেন। হার্ডিং-এর আন ঠিক। স্পষ্টই দেখা গেল, জলের নিচে একটা বিশাল গহ্বরের চিহ্ন বেশ ফুটে উঠেছে।

তারটিও ঠিক সেখানে খাড়া হয়ে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

হার্ডিং ফিরে এলেন আর-সকলের কাছে। বললেন, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এই পথটার ভিতর যাওয়া যাবে।

পেনক্র্যাফট শুধোলো : পথটা আছে তাহলে?

হার্ডিং বললেন : তোমার কি তাতে সন্দেহ ছিল নাকি?

হার্বার্ট বললে : শুকনোও তো থাকতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা হেঁটেই যেতে পারবো। আর যদি জল থাকেই তবে আমাদের যাবার জন্যে একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা আছে।

একটা ঘণ্টা কেটে গেল। সকলে এই জল-ঝড় মাথায় নিয়েই সমুদ্রতীরে নেমে গেলেন। তখন প্রায় আট ফুট উঁচু পথ বেরিয়েছে। পথের মুখ সেতুর খিলানের মতো। তার তলা দিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটেছে সমুদ্র-তরঙ্গ। সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হার্ডিং দেখতে পেলেন, একটা কালো-মতে কী যেন ভাসছে। সেটাকে টেনে কাছে এনে দেখা গেল সেটা একটা ডিঙি নৌকো, গহ্বরের ভিতরে পাথরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। নৌকোটা লোহার পাত দিয়ে মোড়া। নৌকোর পাটাতনে দুটো দাঁড় পড়ে আছে।

তক্ষুনি নৌকোয় উঠে বসলেন সকলে। নে আর আয়ারটন দাঁড় ধরলে। পেনক্র্যাফট বসলে হাল ধরে। সাইরাস হার্ডিং লণ্ঠন হাতে নৌকোর মুখে দাঁড়ালেন, অন্ধকারে পথ দেখাবার জন্যে।

গহ্বরের ভিতরে ঢোকবার পরেই ধনুক-বাঁক ছাদটা খুব উঁচু হয়ে পড়ল।

গভীর অন্ধকার। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় গহ্বরের বিশালতা, উচ্চতা-কোনো কিছুই বোঝা গেল না।

চারদিক নীরব নিস্তব্ধ। বাইরের বজ্রপাতের প্রচণ্ড আওয়াজ পর্যন্ত সেখানে ঢুকতে পারে না।

গহ্বরটা কতদূর পর্যন্ত গেছে? দ্বীপের মধ্যভাগ পর্যন্ত? কে জানে!

মিনিট পনেরো চলার পর হার্ডিং বললেন : নৌকোটাকে আরো ডানদিকে নিয়ে যাও। তার মংলব, তারটা দেয়ালের গায়ে লাগানো আছে কি না দেখা। দেখা গেল, তার। ঠিকই চলেছে। আরো মিনিট পনেরো কাটল। ততক্ষণে তারা আধ মাইলটাক এসেছেন। সাইরাস হার্ডিং হঠাৎ বললেন, থামো।

নৌকো থামলো। সকলে দেখতে পেলেন, সামনের একটা তীব্র উজ্জ্বল আলোয় সেই বিশাল গহরটি আলোকিত হয়ে আছে। প্রায় একশো ফুট উঁচু বাঁকানো ছাদটা কালো-কালো। থামের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। এমন গভীর, এত-বড়ো একটা গহ্বর যে দ্বীপের নিচে আছে, তা তাঁরা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি! তীব্র উজ্জ্বল আলোয়

গহ্বরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চোখের সামনে ফুটে উঠল। আলোটা এত উজ্জ্বল আর এত ধবধবে শাদা যে মনে হল, আলোটা নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে জ্বালানো হয়েছে।

নৌকোটা আলোর কাছে নিয়ে যাওয়া হল। এখানে জল প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট গভীর। আলোর পরেই বিশাল পাথরের দেয়াল। সেদিকে আর এগুবার পথ নেই। এখানে গহ্বরটা খুব চওড়া। দ্বীপের নিচে যেন বড়ো-একটা হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে।

এই হ্রদের মাঝখানে ঠিক চুরুটের মতো দেখতে একটা বিরাট বিশাল জিনিশ ভাসছে। জিনিশটা স্থির, নিস্তব্ধ। এর গায়ে যেন জ্বলন্ত দুটো চোখ, তার মধ্যে দিয়েই সেই উজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে।জিনিশটাকে দেখে মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা তিমি। প্রায় আড়াইশো ফুট লম্বা, আর জলের উপর দশ-বারো ফুট উঁচু।

নৌকো আস্তে-আস্তে আরো কাছে গেল। সাইরাস হার্ডিং উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। তারপর হঠাৎ স্পিলেটের হাত চেপে সজোরে ঝাঁকুনি দিলেন : এ তিনি। তিনি ছাড়া আরকেউ হতে পারে না! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি। এরপর বসে পড়ে গিডিয়ন স্পিলেটের কানে ফিশফিশ করে একটা নাম বললেন।

গিডিয়ন স্পিলেটও সেই নাম জানতেন। শুনেই তীব্র উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন স্পিলেট : অ্যাঁ! এ আপনি কী বলছেন, ক্যাপ্টেন হার্ডিং! তিনি। তিনি তো সাংঘাতিক অপরাধী!

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : হ্যাঁ, তিনিই।

সাইরাস হার্ডিং-এর কথামতো নৌকোটাকে এই ভাসমান জিনিশটার গায়ে লাগানো হল। জিনিশটার বাঁ পাশ থেকে পুরু কাঁচের মধ্য দিয়ে তীব্র ঝলসানো আলোর রেখা বেরুচ্ছিল। হার্ডিং দলবল নিয়ে এর উপরে উঠলেন। উঠে দেখলেন, ভিতরে যাওয়ার একটা দরজা রয়েছে। সেই দরজা দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেন। সিঁড়ির নিচে জাহাজের ডেকের মতো ডেক–তীব্র আলোয় উজ্জ্বল। এই ডেকের শেষে একটা দরজা। হার্ডিং দরজাটা খুললেন। খুব সাজানো-গোছানো একটা ঘর পেরিয়ে লাইব্রেরি ঘর। এই ঘরের ছাদ থেকে উজ্জ্বল আলো বেরিয়ে ঘরটা আলোকিত করেছে। লাইব্রেরি-ঘরের শেষে একটা বন্ধ দরজা। হার্ডিং সেই দরজাটাও খুললেন।

বড়ো জাহাজের সেলুনের মতো প্রকাণ্ড একটা ঘর; যেন একটা মিউজিয়াম। নানান রকমের অজস্র মূল্যবান জিনিশপত্র আর আশবাবে ঘরটা এমনভাবে সাজানো-গোছানো যে, তাদের মনে হল, যেন হঠাৎ কোনো জাদুঘরে এসে পড়েছেন।

ঘরে ঢুকে সবাই দেখলেন, একটা দামি সোফার উপর আধ-শোয়া অবস্থায় একজন লোক। চোখদুটো আলতোভাবে বোজা। ভদ্রলোক তাদের প্রবেশ যেন লক্ষ্যই করেননি।

হার্ডিং ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেলেন : ক্যাপ্টেন নেমো! আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমরা এসেছি।

সবাই এই কথা শুনে স্তম্ভিত বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

.

৩.৬ সমস্যার সমাধান

সাইরাস হার্ডিং-এর কথা শুনে ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন। বৈদ্যুতিক আলো এসে পড়ল তার চোখে মুখে। উদাস ও উজ্জ্বল অবয়ব, কপালটা উঁচু, চোখে প্রতিভার দ্যুতি, ধবধবে শাদা দাড়ি, মাথার চুল এসে পড়েছে কাঁধে।

শক্ত, সম্ভ্রান্ত, গম্ভীর চেহারা। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল, শরীর বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু কণ্ঠস্বর তখনো বেশ জোরালো।

সাইরাস হার্ডিং-এর কথার জবাবে বললেন : আমার তো কোনো নাম নেই!

সাইরাস হার্ডিং বললেন : আপনার কোনো নাম থাক বা না-থাক, আপনার কথা আমি জানি।

ক্যাপ্টেন নেমো তীক্ষ্ণ চোখে হার্ডিং-এর দিকে তাকালেন। চোখের তারাদুটো একবার জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তে সোফার কুশনের উপর হেলান দিয়ে বললেন : যাক, তাতে এখন আর কোনো ক্ষতি নেই–আমি তো মরতেই চলেছি।

সাইরাস হার্ডিং ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে গেলেন। গিডিয়ন স্পিলেট তার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে দেখলেন, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ক্যাপ্টেন নেমো হাত টেনে নিয়ে সাইরাস হার্ডিং আর স্পিলেটকে বসতে ইঙ্গিত করলেন।

উত্তেজনায় আর কৌতূহলে সবাই তখন অস্থির।

ক্যাপ্টেন নেমে সোফায় বসে হাতের উপর ভর দিয়ে হার্ডিংকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগলেন। একটু বাদে শুধোলেন : আমার আগেকার নাম আপনি জানেন?

হার্ডিং ঘাড় নাড়লেন : হ্যাঁ, জানি। আর আপনার নটিলাসের কথাও জানি।

ক্যাপ্টেন নেমো যেন অবাক হলেন একটু : কী করে জানলেন? আমাদের তো অনেক বছর ধরে পৃথিবীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই! তিন বছর ধরে আমি একলা সমুদ্রের নিচে বাস করছি। তবে কে আমার এই অজ্ঞাতবাসের কথা প্রকাশ করলে?

এমন-একজন লোক প্রকাশ করেছেন, আপনার সঙ্গে যাঁর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই

হার্ডিং উত্তর করলেন : সুতরাং তাকে বেইমান বলা চলে না।

হুঁ, বুঝতে পেরেছি। ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : ষোলো বছর আগে যে ফরাশি অধ্যাপকটি হঠাৎ আমার জাহাজে এসে পড়েছিল, সে-ই তবে আমার কথা বলে বেড়িয়েছে সবার কাছে!

হার্ডিং ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : তাহলে সেই ফরাশি অধ্যাপক আর তার সঙ্গী দুজন নরোয়ের সেই ঘূর্ণিপাকে ডুবে মরেনি? নটিলাস তখন ঐ ঘূর্ণিপাক থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল বলে ওদের দিকে নজর রাখতে পারেনি।

তারা মরেনি। তারপরই টোয়েন্টি থাউজ্যা লীগস আণ্ডার দি সী (সমুদ্রতলে ষাট হাজার মাইল) নামে একটা বই ছাপা হয়েছে। সেই বইতে আপনার ইতিহাস লেখা আছে।

আমার ইতিহাস? ও হা-কয়েক মাসের ইতিহাস মাত্র।

হার্ডিং কাঁধ ঝাঁকালেন : সে-কথা ঠিক। কিন্তু সেই কয়েক মাসের আশ্চর্য ইতিহাসই আপনাকে পরিচিত করাবার পক্ষে যথেষ্ট।

অবজ্ঞার হাসি হাসলেন ক্যাপ্টেন নেমো : অপরাধী হিশেবে, মানুষের শত্রু হিশেবে পরিচিত করতে তা-ই যথেষ্ট, না?

হার্ডিং আহত হলেন একটু : ক্যাপ্টেন নেমো! আপনার অতীত জীবনের কাজকর্মের বিচার করবার অধিকার আমার নেই—সে-চেষ্টাও আমি করিনি। কেন যে আপনি অমন অদ্ভুত জীবন যাপন করতেন, তার কারণ আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, লিঙ্কন দ্বীপে পৌঁছুনোর পর থেকে একজন উপকারী বন্ধু সবসময় আমাদের সাংঘাতিক-সাংঘাতিক বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে আসছেন। আমরা যে বেঁচে আছি, সে শুধু সেই শক্তিশালী দয়ালু মহাত্মার কল্যাণে। সেই অজ্ঞাত বন্ধু আপনি স্বয়ং।

এই কথার জবাবে ক্যাপ্টেন নেমে শুধু একটু মৃদু হাসলেন।

হার্ডিং আর স্পিলেট উঠে দাঁড়ালেন। সকলেরই মন কৃতজ্ঞতায় ভরা। সেকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার জন্যে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ক্যাপ্টেন নেমে তা বুঝতে পারলেন। ইশারায় সবাইকে শান্ত করে বললেন, দাঁড়ান, আগে আমার সমস্ত ইতিহাস শুনে নিন।

ক্যাপ্টেন নেমো সংক্ষেপে তাঁর কাহিনী শেষ করলেন। শেষ পর্যন্ত বলতে গিয়ে তাঁর দেহ মনের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। অনেকবার হার্ডিং তাকে বিশ্রাম করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সে-কথায় কান না-দিয়ে তিনি সব খুলে বললেন। ক্যাপ্টেন নেমোর কাহিনীর সারমর্ম এ-রকম দাঁড়ায় :

ক্যাপ্টেন নেমো একজন ভারতীয়। তখনকার স্বাধীন রাজ্য বুন্দেলখণ্ডের রাজার ছেলে, নাম ছিল যুবরাজ ডাক্কার। তার যখন দশ বছর বয়স, তার বাবা তাকে ইওরোপে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়েছিলেন। সব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশে ফিরে এসে অধঃপতিত বুন্দেলখণ্ডকে ইওরোপের মতো করে তুলতে হবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। আশ্চর্য বুদ্ধি ছিল বলে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যেই কলা, বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যায় অদ্ভুত নৈপূণ্য লাভ করলেন ডাক্কার। সারা ইওরোপে তিনি চষে বেড়ালেন। রাজার ছেলে, তাই টাকা-কড়ির অভাব নেই। সবখানেই সমাদর পেলেন। জ্ঞানপিপাসু ডাক্কারের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল, ভবিষ্যতে যাতে একটা স্বাধীন, সুসভ্য দেশের রাষ্ট্রনায়ক হিশেবে বিখ্যাত হতে পারেন।

আঠারোশো উনপঞ্চাশ খ্রিষ্টাব্দে ডাক্কার বুন্দেলখণ্ডে ফিরে এলেন। অভিজাত বংশের একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হলদুটি ছেলেও হল তার। কিন্তু পারিবারিক সুখ-সৌভাগ্য তাকে তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। ডাক্কার তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এমন সময়, আঠারোশো সাতান্ন খ্রিষ্টাব্দে শুরু হল সিপাহী বিদ্রোহ। অন্য সকলের মতো ডাক্কারও বিদ্রোহে যোগ দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি লড়াই করতেন। কুড়িটি লড়াইয়ে দশবার তিনি আহত হয়েছিলেন। একসময়ে বিদ্রোহের অবসান হল। এই বিদ্রোহে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে ডাক্কার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিদ্রোহের অবসান হলে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করলেন, যুবরাজ ডাক্কারকে যে ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে অঢেল পুরস্কার দেয়া হবে। বিস্তর ইনাম, আর সেইসঙ্গে ভূষণ ও খেতাব।

বুন্দেলখণ্ড ইংরেজদের দখলে এল। ডাক্কার বুন্দেলখণ্ডের পাহাড়ে পাহাড়ে লুকিয়ে। বেড়াতে লাগলেন। জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা নির্মূল হয়ে গেল। ডাক্তার গোড়ায় দমে গিয়েছিলেন। সভ্য জগতের প্রতি, সারা মানব-জাতির প্রতি তার একটুও শ্রদ্ধা রইল না। ধন-দৌলত যা-কিছু ছিল সব সংগ্রহ করে কুড়িজন বিশ্বাসী অনুচরসমেত যুবরাজ ডাক্কার একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তার গতিবিধির চিহ্ন কিছুই প্রকাশ পেলো না।

ডাক্কার তবে কোথায় গেলেন তখন? স্বাধীন দেশের স্বপ্ন যখন চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে গেল, তখন কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন ডাকার?-সমুদ্রের অতলে; যেখানে পৃথিবীর কেউ তার অনুসরণ করতে পারবে না।

বীর নির্ভীক যোদ্ধা এবার বৈজ্ঞানিক হয়ে দাঁড়ালেন। প্রশান্ত মহাসাগরে একটি নির্জন নিরালা দ্বীপে ডক তৈরি করে নিজের পছন্দসই ডুবোজাহাজ তৈরি করলেন। নিজের আবিষ্কৃত উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তিকে এমনভাবে কাজে লাগালেন যে, জাহাজ চালানো, জাহাজের আলোর কাজ, জাহাজের শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সবকিছুই ঐ বৈদ্যুতিক শক্তিতেই সম্পন্ন হত। এই শক্তির শেষ নেই ... সমুদ্রের স্রোত থেকে ইচ্ছেমতো বিদ্যুৎ

উৎপাদন করা যায়। রত্নগর্ভ সমুদ্র। এ ছাড়া, মানুষ কত সময় কত মূল্যবান জিনিশপত্র, ধনদৌলত এই সমুদ্রগর্ভে হারিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমুদ্রের অতলে মাছ, শাকসজিও প্রচুর। সুতরাং ডাক্তারের আর-কোনো অভাবই রইল না। এত দিনে তার স্বপ্ন সার্থক হবে। ডুবোজাহাজে করে সমুদ্রের অতলে স্বাধীনভাবে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জাহাজের নাম দেয়া হল নটিলাস। নিজে নাম নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো অর্থাৎ কেউ না।

অনেক বছর ধরে ডাক্তার সমুদ্রের অতলে এক মেরু থেকে অন্য মেরু পর্যন্ত ঘুরে বেড়ালেন। নির্জন সমুদ্রগর্ভ থেকে তিনি কত-যে ধনদৌলত সংগ্রহ করলেন তার সীমা নেই। সতেরোশো দুই সালে কোটি-কোটি স্বর্ণমুদ্রা-সমেত স্পেনের একটা জাহাজ ভিগো উপসাগরে ডুবেছিল। ক্যাপ্টেন নেমে সেই সম্পদ সমুদ্রগর্ভ থেকে সংগ্রহ করলেন। যারা নিজেদের দেশ স্বাধীন করবার জন্যে লড়াই করতো, নিজের নাম গোপন রেখে এই ধনদৌলত দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো তাদের সাহায্য করতেন।

এইভাবেই অনেকদিন পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কোনো সংস্রব না-রেখে সমুদ্রগর্ভে বাস করলেন তিনি। শেষে আঠারোশো ছেষট্টি খ্রিষ্টাব্দের ছয়ই নভেম্বর রাত্রে দৈবাৎ তিনজন লোক তার জাহাজে এসে পড়ে। সেই লোক তিনজন হল—একজন ফরাশি অধ্যাপক, তার পরিচারক, আর ক্যানাড়ার এক তিমি-শিকারী।অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন নামে একটা আমেরিকার জাহাজ নটিলাসকে তাড়া করেছিল, নটিলাসের সঙ্গে সেই জাহাজের ধাক্কা লাগে। তখন এরা তিনজন নটিলাসের উপর পড়ে গিয়েছিল।

সেই ফরাশি অধ্যাপকের কাছে ক্যাপ্টেন নেমো শুনেছিলেন যে নটিলাসকে পৃথিবীর লোকে তিমি-জাতীয় কোনো বিশাল জানোয়ার কিংবা বোম্বেটে ডুবোজাহাজ বলে মনে করে–আর এই নটিলাসকে অন্য-সব জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেন নেমে এদের তিনজনকে কয়েদির মতো নটিলাসে আটক রাখলেন। সাত মাস পর্যন্ত তারা সমুদ্রের অতলের আশ্চর্য-আশ্চর্য ব্যাপার দেখতে পেয়েছিল।

আঠারোশো সাতষট্টি সালের বাইশে জুন লোক তিনজন নটিলাসের একটা নৌকোয় চড়ে পালিয়ে যায়। সেই সময়ে নটিলাস নরোয়ে উপকূলের সমুদ্রতলের নিদারুণ ঘূর্ণিপাকের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিল। নরোয়ের মেলস্টর্ম তার প্রলয়ক্ষমতার জন্যে কুখ্যাত। ক্যাপ্টেন নেমো তাই ভেবেছিলেন যে এরা সমুদ্রে ডুবে মরেছে। এদিকে তারা যে সৌভাগ্যবশত রেহাই পেয়েছিল, সে-কথা ক্যাপ্টেন নেমে জানতে পারেননি। এই ফরাশি অধ্যাপকই দেশে ফিরে ক্যাপ্টেন নেমোর সাত মাসের ঘটনাবলি টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আণ্ডার দি সী বইতে লিখে বের করেছিলেন।

এই ঘটনার পর অনেকদিন পর্যন্ত ক্যাপ্টেন নেমো সমুদ্রতলে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু তার সঙ্গীরা ক্রমশ একে-একে মারা যেতে লাগলেন। শেষে এই সমুদ্রতলের অধিবাসীদের মধ্যে একমাত্র বেঁচে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তার বয়স তখন ষাট। একলা হলেও নটিলাস নিয়ে তিনি লিঙ্কন দ্বীপের নিচে জলগর্ভে যে একটি বিশাল গহ্বরের মধ্যে তার একটা আশ্রয় ছিল, সেখানে হাজির হলেন। এই ধরনের বন্দর আরো ছিল, দরকার হলে তিনি সে-রকম বন্দরে গিয়ে বিশ্রাম করতেন। লিঙ্কন দ্বীপের বন্দরে ছ-বছর ধরে আছেন ক্যাপ্টেন নেমো। এখন আর সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়ান না। সঙ্গীদের সঙ্গে মেলবার জন্যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন।

www.bengaliebook.com

এমন সময় একদিন ক্যাপ্টেন নেমো দেখতে পেলেন, একটা বেলুন জনকয়েক লোক নিয়ে লিঙ্কন দ্বীপে এসে শূন্য থেকে পাক খেতে-খেতে পড়ছে। তিনি তখন ডুবুরির পোশাক পরে সমুদ্রতীর থেকে খানিক দূরে জলের নিচে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় সাইরাস হার্ডিং বেলুন থেকে জলে পড়ে গেলেন। হার্ডিং-এর অবস্থা দেখে তার মমতা হল। হার্ডিংকে জল থেকে উদ্ধার করলেন নেমো।

এরপর থেকে তাঁর একমাত্র চিন্তা হল, এই পরিত্যক্ত পাঁচজনের কাছ থেকে দূরে পালানো। কিন্তু তাঁর আশ্রয় থেকে বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে পড়েছিল। আগ্নেয়গিরির আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার অত্যাচারে গহ্বরের মুখের উপর পাথর নেমে পড়েছিল। ছোটোখাটো জাহাজের পক্ষে গহ্বরের মুখ যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু নটিলাসের পক্ষে সে-পথ কিছুই না। সুতরাং সেখানেই আটকে থাকতে হল তাকে।

ক্যাপ্টেন নেমো তখন গোপনে এঁদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন। দেখলেন, এরা সৎ, সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, কার্যক্ষম-আর সকলের মধ্যে আশ্চর্য একতা রয়েছে। নেমে ডুবুরির পোশাক পরে গ্র্যানাইট হাউসের কুয়োর কাছে যেতেন পাহাড়ের গা বেয়ে খানিকটা উঠে; দ্বীপবাসীদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে যে আলোচনা হত তা শুনতে। এমনিভাবে একদিন শুনতে পেলেন, দাস-ব্যাবসা বন্ধ করবার জন্যে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ বেধেছে। সাইরাস হার্ডিংরা সবাই দাসত্বপ্রথা নিবারণের পক্ষের লোক। কাজে-কাজেই ক্যাপ্টেন নেমোর সহানুভূতি পাওয়ার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আগেই বলেছি, নেমো সাইরাস হার্ডিংকে জল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। উনিই কুকুর টপকে নিয়ে গিয়েছিলেন চিমনিতে; ঝিলের জল থেকে টপকে তিনিই উদ্ধার করেছিলেন; সমুদ্রতীরে

দ্বীপবাসীদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিশপত্রে ভরা সিন্দুকটিও রেখেছিলেন উনি; ক্যানটাকে আবার মার্জিনদীর জলে এনে দিয়েছিলেন উনিই; বানরের দল গ্র্যানাইট হাউস আক্রমণ করবার সময় উপর থেকে দড়িটা নিচে ফেলে দিয়েছিলেন উনিই; আয়ারটনের খবর লিখে উনিই সমুদ্রের জলে বোতল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন; প্রসপেক্ট হাইটের উপরে যে-আগুন দেখে পেনক্র্যাফট পথ চিনেছিল, সে-আন উনিই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন; উনিই প্রণালীর জলে টর্পেডো দেগে দস্যুদলের জাহাজ উড়িয়ে দিয়েছিলেন। হার্বার্টকে সাক্ষাৎ-মৃত্যুর কবল থেকে কুইনাইন এনে দিয়ে রক্ষা করেছিলেন উনিই; উনিই ইলেকট্রিক গুলি মেরে দস্যু পাঁচজনকে হত্যা করেছিলেন : এই ইলেকট্রিক গুলির রহস্য শুধু ওঁরই জানা ছিল, এই গুলি দিয়ে সামুদ্রিক জীবজন্তু শিকার করতেন উনি।

লিঙ্কন দ্বীপে যতগুলো রহস্যময়, অত্যাশ্চর্য, বিস্ময়কর, অতিমানবিক ঘটনা ঘটেছিল, এতদিনে মীমাংসা হল সেগুলোর : সবগুলো ঘটনাতেই ক্যাপ্টেন নেমোর মহত্ত্ব আর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয়চিহ্ন অঙ্কিত।

তবু ক্যাপ্টেন নেমোর মনে দ্বীপবাসীদের আরো উপকার করবার ইচ্ছে হয়েছে, তাদের আরো অনেক বিষয়ে উপদেশ দিতে হবে; তাই গ্র্যানাইট হাউসের লোকদের বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ডেকে পাঠিয়েছেন এখানে।

...

ক্যাপ্টেন নেমো তার জীবন-কাহিনী শেষ করলে সাইরাস হার্ডিং সকলের তরফ থেকে তাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

ক্যাপ্টেন নেমো সাইরাস হার্ডিং-এর কথায় কান দিলেন না, শুধু বললেন : আমার কাহিনী তো শুনলেন, এখন আমার কার্যকলাপ সম্পর্কে আপনাদের মত কী?

একটা বিশেষ ঘটনা সম্পর্কেই ক্যাপ্টেন নেমো সকলের মত জানতে চেয়েছিলেন। সেই ফরাশি অধ্যাপক পালিয়ে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোর কাহিনী লিখে যে-বই প্রকাশ করেছিল, সেই বইতে ওই বিশেষ ঘটনাটির উল্লেখ ছিল, আর তা পড়ে সারা ইওরোপে তখন শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। ফরাশি অধ্যাপক ও তাঁর সঙ্গী দুজন পালিয়ে যাবার কিছুদিন আগে অতলান্তিক মহাসাগরের উত্তরভাগে নটিলাসকে একটা জাহাজ তাড়া করেছিল– বাধ্য হয়ে নটিলাস সেই জাহাজটা ডুবিয়ে দিয়েছিল। সাইরাস হার্ডিং-এর বুঝতে বাকি রইল না যে ক্যাপ্টেন নেমো এই বিশেষ ঘটনাটি সম্পর্কেই তাঁদের মত জানতে চেয়েছেন। হার্ডিং চুপ করে রইলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

তখন ক্যাপ্টেন নেমো আবার বললেন : একটা কথা মনে রাখবেন, সেটা ছিল শত্রুজাহাজ। আর ওটাই আগে আমাকে তাড়া করেছিল। তখন আমি ছিলাম একটা সংকীর্ণ উপসাগরের মধ্যে যেখানে জল কম, জাহাজটা আমার পথ আটকে ফেলেছিল। আমি সেটাকে ডুবিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন বলুন, কাজটা কি আমার অন্যায় হয়েছিল, না আমি ঠিকই করেছিলুম?

সাইরাস হার্ডিং বললেন : দেখুন, আপনার কাজের বিচার করবার অধিকার আমার নেই। মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে কাজের প্রেরণা পায়, তার ফলাফলের বিচারকও ঈশ্বরই। ক্যাপ্টেন নেমো! আমাদের শুধু এইটুকুই বলার আছে যে, আপনার মতো এমন মহৎ ও উপকারী বন্ধু হারিয়ে আমাদের মনে দারুণ দুঃখ হবে।

হার্বার্ট ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে তার হস্তচুম্বন করল। হার্বার্টের মাথায় হাত রেখে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে নেমো বললেন : ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

তখন সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু সূর্যালোকের একটি কণাও প্রবেশ করল না গহ্বরে। তখন ভরা জোয়ার। গহ্বরের মুখও বন্ধ হয়ে গেছে। নটিলাসের বিদ্যুতালোকেই চারদিক আলোয় আলোময়।

ক্যাপ্টেন নেমো উত্তেজনায় ক্লান্ত হয়ে সোফার উপর এলিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞানের মতো পড়ে রইলেন তিনি। সাইরাস হার্ডিং আর গিডিয়ন স্পিলেট মনোযোগ দিয়ে ওঁর অবস্থা দেখতে লাগলেন। এ-কথা বুঝতে বাকি রইল না যে, তার শক্তি-সামর্থ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তাকে বাঁচানোর আর-কোনো উপায় নেই।

পেনক্র্যাফট বললে বাইরে নিয়ে গেলে হয় না? খোলা হাওয়ায় আর রোদে হয়তো সুস্থ হতে পারেন।

কোনো লাভ নেই। ঘাড় নাড়লেন সাইরাস হার্ডিং : তাছাড়া নটিলাস ছেড়ে যেতে কিছুতেই রাজি হবেন না উনি। প্রায় বারো বছর ধরে উনি একাই নটিলাসে আছেন। ওঁর ইচ্ছে, এই নটিলাসেই যেন ওঁর মৃত্যু হয়।

সাইরাস হার্ডিং-এর কথা বোধহয় শুনতে পেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। মাথা তুলে দুর্বল অথচ স্পষ্ট গলায় বললেন : ঠিক, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। নটিলাসেই আমার মৃত্যু

হোক এই আমার ইচ্ছে। এখন আমার একটা অনুরোধ আছে। আপনারা কথা দিন যে আমার অন্তিম কামনাটি আপনারা পূর্ণ করবেন, তাহলেই আপনাদের কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করা হবে।

সবাই শপথ করলেন যে তারা ক্যাপ্টেন নেমোর অন্তিম কামনা পূর্ণ করবেন।

তখন ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : কাল আমার মৃত্যু হবে, আর এই নটিলাসেই হবে আমার সমাধি। আমার বন্ধুবান্ধব সবাই সমুদ্রের অতলে আশ্রয় নিয়েছেন, এই সমুদ্রগর্ভেই আমারও আশ্রয় হোক। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন। গহ্বরের মুখটা ছোটো হয়ে গেছে, তাই নটিলাস আটকা পড়ে গেছে। তবে, বেরিয়ে যাওয়া সম্ভব না-হলেও জল খুব গভীর এখানে, নটিলাস সহজেই ডুবতে পারবে এবং আমার সমাধি হবে। কাল আমার মৃত্যুর পরে আপনারা নটিলাস থেকে চলে যাবেন। এইসব মূল্যবান জিনিশপত্র, আশবাবপত্র ইত্যাদি সমেত নটিলাসও আমার সঙ্গে বিনষ্ট হবে। শুধু একটি উপহার যুবরাজ ডাক্কারের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে আপনাদের কাছে থাকবে। এই যে বাক্সটা দেখছেন, এর মধ্যে অনেক লক্ষ টাকা দামের অনেকগুলো হিরে-জহরৎ আছে। যাবার সময় এই বাক্সটা আপনারা নিয়ে যাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনাদের মতো সৎ ব্যক্তি এই টাকা ভালোকাজেই খরচ করবেন। আমার মৃত্যুর পরেও আপনাদের প্রত্যেক কাজে আমি পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে যোগ দেবো। কাল আপনারা এই বাক্সটা নিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে যাবেন। তারপর নটিলাসের ডেকের উপর উঠে নিচে দরজাটা একেবারে বন্ধ করে দেবেন।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : আপনার সমস্ত আদেশই আমরা পালন করবো।

হ্যাঁ ভালো কথা। ক্যাপ্টেন নেমো বললেন : তারপর আপনারা যে-নৌকোটা চ'ড়ে এসেছিলেন, সেই নৌকোয় চড়ে চলে যাবেন। যাবার আগে আরেকটা কাজ করবেন। নটিলাসের মুখের কাছে গেলে দেখতে পাবেন, ঠিক জলের সমতলে এক লাইনে দু-পাশে দুটো ফুটো আছে; সেই ফুটোর মুখ বন্ধ, সেই মুখ খুলে দেবেন। তাহ'লে জল আস্তে আস্তে নটিলাসের নিচের চৌবাচ্চায় ঢুকবে, আর নটিলাস আস্তে-আস্তে একেবারে ডুবে যাবে। আপনাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। ততক্ষণে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং আপনারা মৃত ব্যক্তিকেই সমাধিস্থ করবেন। আমার আর কিছু বলবার নেই। আশা করি আমার ইচ্ছেগুলো সব আপনারা পূরণ করবেন।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : আমরা কথা দিচ্ছি, আপনার সকল আদেশই পালিত হবে।

ক্যাপ্টেন নেমো সকলকে ধন্যবাদ জানালেন। তাৰপর বললেন : এখন ঘণ্টাকয়েকের জন্যে আপনারা এ-ঘর থেকে একটু চলে যান।

.

এরপর সবাই খাবার ঘর ও লাইব্রেরি-ঘর থেকে বেরিয়ে এঞ্জিন-ঘরে এসে পৌঁছুলেন। এই ঘরটা ছিল নটিলাসের সানের দিকে—এই ঘরেই সব যন্ত্রপাতি ছিল। নটিলাসের বিরাট এঞ্জিন-ঘর দেখে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

দ্বীপবাসীরা নটিলাসের উপরের প্ল্যাটফর্মটাকে উঠলেন। প্ল্যাটফর্মটা জল থেকে সাত ফুট উঁচুতে। সেখানে দেখলেন, খুব পুরু কাচের লেন্সের মতো আবরণ দিয়ে ঢাকা, বড়ো

বড়ো চোখের মতো ফুটো রয়েছে। তার ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বার হচ্ছে। এর পিছনেই একটা ঘর। এই ঘরের মধ্যে নটিলাসের হালের চাকা। চালক এই ঘরে উজ্জ্বল আলোর সাহায্যে নটিলাসকে সমুদ্রগর্ভে চালাতো।

সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। সকলের মন আবেগে ভরে আছে। যে-মহাপুরুষ এতকাল নানাভাবে তাদের অজস্র উপকার করেছেন, যার সঙ্গে সবেমাত্র তাদের পরিচয় হয়েছে, তিনি কিনা মৃত্যুশয্যায়!

এমন সময় আযাটন বললে : আচ্ছা, এই নটিলাসে চড়ে আমার লিঙ্কন আইল্যাণ্ড থেকে চলে যেতে পারি?

তা কী কবে হবে? সাইরাস হার্ডিং বললেন : নটিলাস তো আর আমাদের নয়। তা ছাড়া নটিলাস এখানে আটকা পড়ে গেছে, গহ্বরের ভিতর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় নেই। আর উপায় যদি-বা থাকতোই, ক্যাপ্টেন নেমো যখন ইচ্ছে করেছেন নটিলাস-সমেত তাকে সমুদ্রের অতলে কবর দিতে হবে–তখন সে-কাজই আমরা করবো।

এইভাবে কথাবার্তায় খানিকক্ষণ কাটল। তারপর সাইবার হার্ডিং সকলকে নিয়ে আবার নটিলাসের খাবারঘরের ভিতরে ঢুকলেন। সেখানে কিছু জলযোগ করে পরে আবার ক্যাপ্টেন নেমোর ঘরে ঢুকলেন।

ততক্ষণে ক্যাপ্টেন নেমোর অবসাদ অনেকটা দূর হয়েছে। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে-চোখমুখ। উজ্জ্বল হয়েছে চোখের তারা। সবাইকে দেখে একটু হাসলেন তিনি।

সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়ালেন।

সাইরাস হার্ডিংকে তিনি বললেন : আপনাদের সকলেরই আশ্চর্য সাহস। আপনাদের মতো সজ্জন দুনিয়ায় বিরল। আমি এতদিন ধরে আপনাদের কার্যকলাপ সবই দেখেছি। আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। মিস্টার হার্ডিং, আপনার হাতটি পেলে খুব বাধিত হব।

সাইরাস হার্ডিং তার হাত বাড়িয়ে দিলে ক্যাপ্টেন নেমো গভীর স্নেহে তার হাতে একটু চাপ দিয়ে বললেন : আমার নিজের কথা অনেক বলেছি। এবার আপনাদের কথা আর লিঙ্কন আইল্যান্ডের কথা বলবো। এই দ্বীপ ছেড়ে যেতে চান আপনারা?

পেনক্র্যাফট তাড়াতাড়ি উত্তর করলে : 'যেতে' চাই বটে, কিন্তু আবার আমরা ফিরে আসবো।

ক্যাপ্টেন নেমো একটু হাসলেন : সে তো আসবেই জানি। দ্বীপটাকে তোমরা ভয়ানক ভালোবাস। তোমাদের জন্যেই তো দ্বীপটার এত উন্নতি হয়েছে।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : আমাদের ইচ্ছে, দ্বীপটাকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেবো। ভবিষ্যতে প্রশান্ত মহাসাগরের এই অংশ লিঙ্কন আইল্যাণ্ড একটা বন্দরের মতো হয়ে উঠবে।

ক্যাপ্টেন নেমো খানিকক্ষণ নীরব থেকে বললেন, তাই হবে। তারপর হার্ডিং বললেন : আপনার সঙ্গে আমি নিভৃতে গোপনে একটু কথা বলতে চাই।

অন্য-সবাই সেই ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদেব হার্ডিং সবাইকে আবার ডেকে আনলেন। ক্যাপ্টেন নেমো গোপনে তাকে যে-সব কথা বলেছিলেন, হার্ডিং তা কারু কাছে প্রকাশ করলেন না।

সারাদিন এভাবে কেটে গেল। নটিলাসের মধ্যেই রইলেন সকলে। ক্যাপ্টেন নেমোর মুখে কোনো যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা গেল না বটে, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, তিনি ক্রমশ নির্জীব হয়ে পড়ছেন। অবশেষে রাত্রির দ্বিতীয় যাম অতিক্রম হবার পর প্রবল চেষ্টায় তিনি তার দু-হাত গুটিয়ে বুকের উপর রাখলেন। রাত একটার সমোয় 'জননী জন্মভুমি' কথাটি উচ্চারণ করলেন তিনি। তারপর তার শেষ নিশ্বাস পড়ল।

সাইরাস হার্ডিং ক্যাপ্টেনের বুকে ক্রশচিহ্ন আঁকলেন, তারপর প্রার্থণা করলেনঃ ঈশ্বর! এই মহাপুরুষের আত্মাকে তোমার পায়ে সমর্পণ করলুম।

ক্যাপ্টেন নেমোর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা বাদে দ্বীপবাসিরা তার সবগুলো আদেশ পালন ক'রে তাদের প্রতিজ্ঞা রাখলেন। তারপর সকলে অভিজ্ঞান হিশেবে পাওয়া বাক্সটা সঙ্গে নিয়ে নটিলাস পরিত্যাগ করলেন।

ক্যাপ্টেন নেমোর উজ্জ্বল আলো-ভরা ঘরটা সযত্নে বন্ধ করে দেয়া হল। ডেকের উপর যাবার লোহার দরজাটা এমনভাবে বন্ধ করে দেয়া হল যাতে এককোটা জলও নটিলাসের ভিতরে ঢুকতে না-পারে।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

এরপর সবাই গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। নৌকোটাকে নটিলাসের গলুইয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। সেখানে জলের সমতলে দুটি বড়ো ফুটো দেখতে পাওয়া গেল। সেই ফুটোর সঙ্গে জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া চৌবাচ্চার যোগাযোগ। এই ফুটো দুটি খুলে দেয়া হল।

আস্তে-আস্তে চৌবাচ্চা জলে ভরে গেল। ধীরে-ধীরে ডুবতে লাগল নটিলাস। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল জলের অতলে।

.

৩.৭ ভয়ংকরের সম্ভাবনা

সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নীরবে গহ্বরের মুখের কাছে উপস্থিত হলেন। এই গহ্বরটির নাম রাখা হ'ল ডাক্কার-গহ্বর'। তখন ভাটার সময়। নিরাপদেই গহ্বরের মুখ পার হয়ে গেলেন সবাই। যাবার সময় নেব আর পেনক্র্যাফট নৌকোটাকে গহ্বরের দেয়ালে একটা উঁচু প্ল্যাটফর্মের মতো জায়গায় তুলে রাখলে। জায়গাটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

ডাক্কার গহ্বর ছেড়ে সবাই কোর্যালে র দিকে চললেন। ক্যাপ্টেন নেমো যে কতবার তাদের প্রাণ বাঁচিয়েছেন, সেই কথা ভেবে সবাই তখন অভিভূত। চুপচাপ তারা পথ চলতে লাগলেন।

সকাল ন-টার সময় গ্রানাইট হাউসে এসে পৌঁছুলেন সবাই। এবার থেকে নৌকোর কাজ আরো উৎসাহের সঙ্গে শুরু হল। সাইরাস হার্ডিং আরো-মনোযোগ দিলেন এ-কাজে। ভবিষ্যতে কী হবে, কিছুই বলবার উপায় নেই। নৌকো যত শিগগির তৈরি করা যায়

ততই ভালো। লিঙ্কন আইল্যাণ্ড পরিত্যাগ করতে না-পারলেও অন্তত টেবর আইল্যান্ডে গিয়ে আয়ারটনের খবর রেখে আসতে হবে। বলা তো যায় না, স্কটিশ-জাহাজ এলেও আসতে পারে।

আঠারোশো আটষট্টি খ্রিষ্টাব্দের শেষভাগ অব্দি অন্য-সব কাজ ফেলে রেখে সকলে নৌকোর কাজেই লেগে রইলেন। আড়াই মাস পরিশ্রম করে নৌকোর পাঁজরটা তৈরি হল। তারপর শুরু হল তক্তা বসানোর কাজ।

আঠারোশো উনসত্তর খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের পয়লা তারিখে হঠাৎ সাংঘাতিক ঝড়তুফান শুরু হ'ল, সঙ্গে-সঙ্গে দ্বীপ জুড়ে অবিশ্রাম বজ্রপাত। বড়ো-বড়ো গাছ বজ্রের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

আকাশের এই আকস্মিক উৎপাতের সঙ্গে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গোলযোগের কি কোনো সম্পর্ক আছে?

সাইরাস হার্ডিং-এর মনে কিন্তু সেই ধারণাই হ'ল। কারণ, দেখা গেল, এই ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির নতুন-নতুন লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

জানুয়ারি মাসের তিন তারিখে আগ্নেয়গিরির চুড়ো থেকে ঘন মেঘের মতো ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল। ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় একাকার হয়ে গেল আকাশ। সাত-আটশো ফুট উপর পর্যন্ত আকাশ ধোঁয়ায় একেবারে ছেয়ে গেল।

সাইরাস হার্ডিং অনেকক্ষণ ধ'রে মনোযোগ দিয়ে এই ধোঁয়া দেখলেন। তারপর সবাইকে ডেকে বললেন : শিগগির ভয়ংকর কিছু একটা ঘটবে, এ-কথা আর গোপন রাখা চলে না। একটা সর্বগ্রাসী পরিবর্তন আসবে। আগ্নেয়গিরির ভিতরকার সবকিছুতেই আগুন ধ'রে গিয়েছে। একটা ভীষণ অগ্ন্যুদগারের যে আর বেশি দেরি নেই– কোনো সন্দেহ নেই সে সম্পর্কে।

আয়ারটন মাটিতে কান পেতে শুনলে। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বললে আমি যেন ভিতরে ভীষণ একটা গুড়-গুড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি!

তখন সবাই কান পেতে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। হ্যাঁ, আয়ারটন মিথ্যে বলেনি। গুড়গুড় শব্দের সঙ্গে মধ্যে-মধ্যে গভীর গর্জনের মতোও শোনা গেল। বোঝা গেল দ্বীপের অভ্যন্তরে সাংঘাতিক একটা আলোড়ন শুরু হয়েছে।

একটু পরে পেনক্র্যাফট বললে : ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বত যতই ধোঁয়া ছাড়ুক, অগ্ন্যুদগার করুক, হাঁক-ডাক যা খুশি করুক, তা-ব'লে কি আমরা আমাদের জাহাজের কাজ বন্ধ রাখবো? চলুন, আমরা গিয়ে কাজে লাগি।

এবার সবাই দ্বিগুণ মনোযোগের সঙ্গে নৌকোর কাজে লেগে গেলেন। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, নৌকোটা শেষ করতেই হবে। কে জানে, ভবিষ্যতে হয়তো-বা এই নৌকোই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে সবাইকে।

সন্ধের আগে বেরিয়ে সবাই যখন প্রসপেক্ট হাইটের উপত্যকায় পৌঁছুলেন, তখন সন্ধে হ'য়ে গেছে। চারদিকেই ঘন অন্ধকার। গন্তব্য স্থানে পৌঁছেই দেখা গেল, পর্বতের চুড়ো

দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে। হলদে রঙের আগুন যেন তার হাজার জিভ মেলে আকাশ চাটতে শুরু করেছে।

সেখান থেকে ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বত প্রায় দু-মাইল দূরে। তবু মনে হল, পর্বতের চুড়োয় যেন ভীষণ একটা মশাল জ্বলছে! সমস্ত দ্বীপটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আগুনের আলোয়।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : পরিবর্তনটা দেখছি একটু দ্রুতই শুরু হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি যে বিপদ আসবে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

গিডিয়ন স্পিলেট বললেন : এটা আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নয়। আগ্নেয়গিরির উৎপাত তো শুরু হয়েছে প্রায় আড়াই মাস আগে থেকে–সেই যখন আমরা ক্যাপ্টেন নেমোর আবাস খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তখন থেকে। ভিতরের আগুন তখন থেকে ঘুষ-ঘুষ করে জ্বলতে শুরু করেছিল, এখন একেবারে দাউদাউ করে জ্বলছে।

সাইরাস হার্ডিং শুধোলেন : মাটির একটা মৃদু কম্পন টের পাচ্ছেন না কি?

স্পিলেট বললেন : হ্যাঁ, তা পাচ্ছি বটে। কিন্তু এই মৃদু কম্পন আর ভূমিকম্প এ-দুটোয় ঢের তফাৎ।

ভূমিকম্প হবে বলে আমার মনে হয় না। হার্ডিং বললেন : এবং ঈশ্বর করুন, সেইটে যেন আর না-হয়। কিন্তু তা না-হলেও, অন্যসব ঘটনা এমন সাংঘাতিক হতে পারে যে তাতে আমাদের বিপদের সীমা থাকবে না।

কী-রকমের বিপদ হতে পারে?

সেইটে এখন ঠিক করে বলতে পারছি না। হার্ডিং উত্তর করলেন : একটু ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু ভয়ংকর কিছুর সম্ভাবনা আছেই।

চৌঠা, পাঁচুই, ছয়ই—জানুয়ারি মাসের তিন দিন পার হয়ে গেল। নৌকোর কাজে কোনো বাধা পড়ল না; খুব মনোযোগ দিয়ে সবাই সেই কাজ চালাতে লাগলেন। কিন্তু দ্বীপের অন্যান্য জায়গাগুলোও মধ্যে-মধ্যে দেখা দরকার। বিশেষ করে কোর‍্যালে গিয়ে জন্তুগুলোর আহারের ব্যবস্থা করা উচিত। তখন ঠিক হল, পরের দিন সাতই জানুয়ারি আয়ারটন কোর‍্যালে যাবে।

এই কাজের জন্যে আয়ারটন একাই যথেষ্ট। অথচ এর উপর সাইরাস হার্ডিং যখন বললেন : আয়ারটন, কাল আমিও তোমার সঙ্গে কোর‍্যালে যাবো – তখন সবাই অবাক হলেন।

পেনক্র্যাফট বললে : এখনো নৌকোর কাজ ঢের বাকি আছে। আপনিও যদি যান, তবে তো কাজের খুব ক্ষতি হবে।

হার্ডিং বললেন : আমরা তো কালই আবার ফিরে আসবো। আমার কোর‍্যালে যাওয়া বিশেষ দরকার। এই অগ্ন্যুৎপাতের রকম-সকম একটু ভালো করে দেখতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা সাইরাস হার্ডিং আয়ারটনের সঙ্গে ওনাগার গাড়ি চড়ে কোর‍্যালে রওনা হলেন। বনের উপর দিয়ে বিশালকায় ঘন মেঘের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। মেঘগুলো

অগ্ন্যুদগারের ধুলোয় ভরা। তারা কোর‍্যালের কাছে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বারুদের মতো কালো ধুলো পড়তে লাগল আকাশ থেকে। দেখতে-দেখতে চারদিকের গাছপালা, জমি কয়েক ইঞ্চি পুরু ধুলোয় ঢেকে গেল।

আয়ারটন বললে : এটা তো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার।

সাইরাস হার্ডিং বললেন : শুধু অদ্ভুত নয়, আয়ারটন, এটা বড়ো সাংঘাতিক ব্যাপার! এই-যে কালো পাথরের গুঁড়োর মতো খনিজ ধুলো সব পড়ছে, এতে প্রমাণ হচ্ছে যে আগ্নেয়গিরির পেটের মধ্যে একটা দারুণ ওলোট-পালোট ব্যাপার শুরু হয়েছে।

আয়ারটন শুধোল : এর একটা-কিছু করা যায় না?

কিছুই করবার নেই। মাথা নাড়লেন হার্ডিং : শুধু নজর রাখতে হবে ব্যাপার কদ্দুর গড়ায়। তুমি এক কাজ করো, আয়ারটন। জীবজন্তুগুলোর খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতে থাকো, কোর‍্যালের কাজকর্মগুলো শেষ করে ফ্যালো। আমি এই ফাঁকে আগ্নেয়গিরির অবস্থাটা একটু দেখে আসি। ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই আমি ফিরে আসবো। তারপর একবার ডাক্কার-গহ্বরটা দেখতে যেতে হবে।

ডাক্কার-গহ্বর কেন?

ওখানে গেলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের একটা আন্দাজ করা যাবে। ক্যাপ্টেন নেমো মৃত্যুর পূর্বে আমাকে গোপনে কী বলেছিলেন, জানো, আয়ারটন? বলেছিলেন, আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে সাবধান থেকো। সমুদ্রের জল আগ্নেয়গিরির মধ্যে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকছে।

সমুদ্রের জল! আয়ারটন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল :গোটা দ্বীপটাই যে তাহলে বয়লারের মতো ফেটে পড়বে!

হ্যাঁ। সেইটেই হল সবচেয়ে ভয়ংকর সম্ভাবনা। যা-ই হোক, তুমি এদিককার কাজকর্মগুলো সেরে ফ্যালো। আমি ততক্ষণে আগ্নেয়গিরির অবস্থাটা একবার দেখে আসি।

ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের অবস্থা দেখে-শুনে হার্ডিং ফিরে এলেন। আয়ারটন ইতিমধ্যে কোর‍্যালের সমস্ত কাজ শেষ করেছে। সাইরাস হার্ডিংকে দেখে সে বললে : ক্যাপ্টেন হার্ডিং, জীবজন্তুগুলো যেন কেমন অদ্ভুতরকম অস্থির হয়ে উঠেছে।

তা তো হবেই। এরা সব টের পায়। এদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই এরা বুঝতে পেরেছে যে শিগগিরই একটা সাংঘাতিক বিপদ উপস্থিত হবে। থাক সে-কথা, একটা কাজ করো। একটা আলো সঙ্গে নাও; এক্ষুনি ডাক্কার-গহ্বরে যেতে হবে।

গহ্বরের কাছে পৌঁছে তারা প্রবেশপথটা খুঁজে বার করলেন। তখন হার্ডিং বললেন : লোহার নৌকোটা তো থাকবার কথা। আয়ারটন নৌকোটা টেনে বার করবার পর দু-জনে নৌকোতে উঠলেন। আয়ারটন আলোটা জেলে নৌকোর গলুইএ রাখল। হার্ডিং হাল ধরে বসলেন। আয়ারটন দাঁড় টেনে চলল।

এ-যাত্রায় আর নটিলাসের আলো নেই। ঘন অন্ধকারে গহ্বরের ভিতর যাওয়া। বাতির আলো ক্ষীণ হলেও তারই সাহায্যে গহ্বরের দেয়ালের গা ধরে আস্তে-আস্তে এগুতে

লাগলেন তারা। খানিক দূর এগুতেই সাইরাস হার্ডিং স্পষ্ট শুনতে পেলেন-পর্বতের ভিতর থেকে গুম-গুম আওয়াজ বের হচ্ছে।

এই শব্দ ছাড়াও একটা জোরালো ভারি গন্ধ পাওয়া গেল। গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম।

সাইরাস হার্ডিং বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন :এ-রকমটা যে হবে, সেটা ক্যাপ্টেন নেমো নিজেও ভয় করেছিলেন। যাক-তবু গহ্বরের শেষ অব্দি যেতে হবে আমাদের।

প্রায় পঁচিশ মিনিট বাদে তারা গহ্বরের প্রান্তে এসে হাজির হলেন। তখন সাইরাস হার্ডিং উঠে দাঁড়িয়ে গহ্বরের দেয়ালে আলো ফেললেন। এই দেয়ালের পরেই আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থল। এই দেয়াল কতটা পুরু? কে জানে। দশ ফুটও হতে পারে, একশো ফুটও হতে পারে। ঠিক কতটা পুরু, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। কিন্তু ভিতরের আগ্নেয়গিরির শব্দ এমনি সুস্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল যে, দেয়াল খুব বেশি পুরু নয় বলেই মনে হল।

সাইরাস হার্ডিং আলোটাকে একটা দাঁড়ের ডগায় বেঁধে দেয়ালের অনেকটা উঁচু পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখলেন। দেয়াল ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে। সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে দুর্গন্ধ ধোঁয়ার মতো গ্যাস বেরিয়ে গহ্বরের হাওয়া নষ্ট করে ফেলেছে।

সাইরাস হার্ডিং চুপ করে কী যেন ভাবলেন খানিকক্ষণ। তারপর ভারি গলায় বললেন, ক্যাপ্টেন নেমো ঠিক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন বিপদের উৎপত্তি হবে এখান থেকেই, আর সেইটেই সবচেয়ে ভয়ংকর হবে। সাংঘাতিক মারাত্মক হবে তার পরিণাম।

এরপর তারা ফিরে চললেন। আধঘণ্টা পরে গহ্বরের মুখে তাঁদের দেখা গেল।

.

৩.৮

ক্যাপ্টেন নেমোর শেষ দান

এক দিন এক রাত্রি কোর‍্যালে কাটিয়ে পরদিন আটই জানুয়ারি সাইরাস হার্ডিং আর আয়ারটন গ্রানাইট হাউসে ফিরে এলেন। তক্ষুনি সবাইকে ডেকে হার্ডিং জানালেন যে বিষম সাংঘাতিক এক বিপদে লিঙ্কন আইল্যান্ড ফেটে চৌচির হয়ে যেতে পারে। যে-কোনো মুহূর্তে। কোনো মানুষের সাধ্য নেই সেই বিপদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

হার্ডিং আরো বললেন : ক্যাপ্টেন নেমো গোপন আলোচনার সময় আমাকে এই ভয়ংকর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

ক্যাপ্টেন নেমো! সবাই বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন নেমো। এবং মৃত্যুর পূর্বে সেইটিই তার শেষ দান।

শেষ দান। বিস্মিত হল পেনক্র্যাফট। শেষ দান! তার মানে, যদিও তিনি মারা গেছেন, তবুও তিনি আমাদের সাহায্য করছেন এখনো।

স্পিলেট জানতে চাইলেন : কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো কী বলেছিলেন আপনাকে?

হার্ডিং উত্তর করলেন : প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য-কোনো দ্বীপের মতোই নয় এই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড। এবং ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে জানিয়ে গেছেন যে, অবিলম্বেই এই দ্বীপ ফেটে বয়লারের মতো চৌচির হয়ে যাবে। কেননা সমুদ্রের জল আগ্নেয়গিরির মধ্যে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঢুকতে শুরু করেছে। গতকাল আমি এই সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ডাক্কার-গহ্বরে গিয়েছিলুম। ডাক্কার-গহ্বরের দেয়াল একেবারে আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। একটামাত্র সামান্য পুরু দেয়াল দিয়ে গহ্বরটি আগ্নেয়গিরির মধ্যস্থল থেকে আলাদা। কাল আমি গিয়ে দেখেছি, সেই দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে, আর আগ্নেয়গিরির সালফারাস গ্যাস তখনই গহ্বরের বাতাস দূষিত করে তুলেছে। আরো দেখতে পেলুম, শিগগিরই ঐ দেয়ালের মধ্যে ছোট্ট একটা পথের মতো তৈরি হবে, আর তাই দিয়েই হু-হু করে জল ঢুকবে আগ্নেয়রিরির ভিতরে। জ্বলন্ত লাভার মধ্যে যখন গিয়ে জল পড়বে, তক্ষুনি পলক ফেলতে-না-ফেলতেই লিঙ্কন আইল্যাণ্ড চৌচির হয়ে উড়ে যাবে।

হার্ডিং-এর কথা শুনে সবাই ভয়ে আতঙ্কে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। সাইরাস হার্ডিং যে কিছুই বাড়িয়ে বলেননি, তা বুঝতে কারু বিলম্ব হল না। তক্ষুনি সকলের মনে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে উঠল : তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে জাহাজ।

প্রত্যেকে দ্রুত হাতে জাহাজের কাজে লাগলেন। অন্য-কোনোদিকে মনোযোগ দেয়ার বিন্দুমাত্র অবসর নেই এখন। গ্রানাইট হাউসের ভাঁড়ার বাড়িয়ে কী লাভ আর! ভাঁড়াড়ে যে-সব জিনিশ আছে, একটি সমুদ্রযাত্রার পক্ষে তা যথেষ্ট। অবশ্যম্ভাবী সেই বিপদ শুরু

হবার আগেই যাতে জাহাজের কাজ শেষ হয়ে যায়, সেইজন্যে সবাই আপ্রাণ পরিশ্রম করতে লাগলেন, উন্মাদের মতো খাটতে লাগলেন।

তেইশে জানুয়ারি জাহাজের ডেকের কাজ অর্ধেক সাঙ্গ হল। ইতিমধ্যে ফ্র্যাঙ্কলিন পর্বতের চুড়োর কোনো পরিবর্তন হয়নি। একটানা ধোঁয়া বর্ষণ করে চলেছে আগ্নেয়গিরি। তেইশে জানুয়ারি রাত্রিবেলা ভয়ংকর একটি আওয়াজ হল। আকাশ লাল হয়ে উঠল আগুনে আগুনে। গ্র্যানাইট হাউসে থেকেই সকলে আগ্নেয়গিরির উত্তাপ অনুভব করতে পারলেন। জ্বলন্ত জলধারার মতো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে বেরুতে শুরু করল গলানো লাভা। জ্বলন্ত এবং চলন্ত আগুন দ্রুতবেগে নিচে নামতে লাগল ঝরনার মতো।

আয়ারটন ভীতি-বিহ্বল স্বরে চেঁচিয়ে উঠল : কোর‍্যাল! কোর‍্যাল।

সত্যি কোর‍্যালের দিকে দ্রুতবেগে ধেয়ে চলছিল লাভা। দেখতে-না-দেখতেই রেড ক্রীকের ঝরনা আর জ্যাকামার অরণ্য জ্বলন্ত ধ্বংসের নিচে তলিয়ে গেল।

আয়ারটন চেঁচিয়ে উঠতেই সংবিৎ ফিরল সকলের। তক্ষুনি কোর‍্যালের উদ্দেশ্যে দ্রুত রওনা হলেন সকলে পোষা জীবজন্তুগুলোকে মুক্ত করে দেবার জন্যে।

ভোর তিনটের মধ্যে কোর‍্যালে এসে পৌঁছুলেন সকলে। জন্তুগুলো ভয়ে উম্মাদের মতো ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে ওরা কোর‍্যালের ভিতরে। আয়ারটন তক্ষুনি কোর‍্যালের দরজা খুলে দিলে। আতঙ্কবিমূঢ় জীবগুলি মুহূর্তের মধ্যে দ্বীপের চারদিকে ছুটে চলে গেল।

এর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরেই লাভায় স্রোতের নিচে ঢাকা পড়ে গেল কোর‍্যাল।

তক্ষুনি তারা ফিরে এলেন তাঁদের ডকইয়ার্ডে। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না। জ্যাকামার অরণ্যের ঘন গাছপালার দরুন লাভার গতি রুদ্ধ হবে। এরপর লেক গ্র্যান্ট আর প্রসপেক্ট হাইটের জন্যেও লাভার গতি বন্ধ হবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয় কোনো অগ্ন্যুদপাত না-হওয়া পর্যন্ত এই জ্যাকামার অরণ্য পর্যন্ত এসেই বন্ধ হয়ে যাবে জ্বলত তরল মৃত্যুর বিদ্যুৎগতি। দ্বিতীয় অগ্ন্যুদপাত হতে যদি আর-কিছুদিন বিলম্ব হয়, ততদিনের মধ্যে হয়তো-বা জাহাজের কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে।

দেখতে-দেখতে তেসরা মার্চ এসে গেল। এর মধ্যে আর-এক মুহূর্তও বিশ্রাম করেননি কেউ। হিশেব করে বুঝতে পারলেন যে, আর দিন-দশেকের মধ্যেই তারা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রপাড়ি দেতে সক্ষম হবেন। দ্বিতীয় কোনো অগ্ন্যুদপাত এখন না-হলেও দিন-দিনই খারাপ হচ্ছে দ্বীপের অবস্থা। এখন যে-অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তাতে যে-কোনো মুহূর্তে দ্বীপটি বয়লারের মতো ফেটে পড়তে পারে। কে জানে আর দিন-দশেক সময় পাওয়া যাবে কি না। হয়তো তীরে এসে তরী ডুববে শেষ পর্যন্ত। তবু তাঁদের মনে আশার আলো ফিরে এলো। এতদিনের মধ্যে যখন দ্বিতীয় কোনো অগ্ন্যুৎপাত হয়নি, তবে হয়তো আর দিন দশেকও নিরাপদে কাটবে। আর, তার মধ্যেই জাহাজের কাজ শেষ হয়ে যাবে। সবাই প্রাণপণে খাটতে লাগলেন।

কিন্তু আবার আগ্নেয়গিরির অবস্থা খারাপ হয়ে উঠল। জ্বালামুখের উপরের আকাশ আগুনে লাল হয়ে গেল। ঝরনা-ধারার মতন লাভার স্রোত বেরোতে লাগল জ্বালামুখ দিয়ে। লেক গ্র্যান্টের পশ্চিম তীর ধরে সেই জ্বলন্ত মৃত্যু প্রসপেক্ট হাইটের সমভূমি পর্যন্ত

ছুটে এলো। মুহুর্মুহু আর্তনাদ করতে লাগল টপ আর জাপ। বোঝা গেল তারাও আসন্ন, অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যুর কথা বুঝতে পেরেছে।

প্রথমবারের অগ্ন্যুদপাতেই দ্বীপের বহু জীবজন্তু মারা গিয়েছিল। যারা কোনোমতে আত্মরক্ষা করে ছিল, তারা টাউন মার্শ-এ আশ্রয় নিয়েছিল। কেউ-কেউ আশ্রয় নিয়েছিল প্রসপেক্ট হাইটে। সেই-শেষ আশ্রয়ের দিকেও এবার বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এলো তরল আগুন। গ্রানাইট পাথরের দেয়াল পর্যন্ত এসে সেই লেলিহান আগুন পথ পরিবর্তন করে বিদ্যুতের মতো নামল সমুদ্র সৈকতে। এই ভয়ংকরের কোনো বর্ণনা দিতে লেখনী অসক্ষম। রাত্রিবেলা এই লাভাস্রোতকে দেখে মনে হল যেন তরল আগুনের নায়াগ্রা প্রপাত এসে আশ্রয় নিয়েছে লিঙ্কন আইল্যান্ডে।

তখনও জাহাজের শরীরে এসে স্পর্শ করেনি লাভাস্রোত। হার্ডিং ঠিক করে ফেললেন, আর দেরি করা চলবে না, তক্ষুনি সমুদ্রে রওনা হয়ে পড়তে হবে। পেনক্র্যাফট আর আয়ারটন সঙ্গে-সঙ্গেই সমুদ্রযাত্রার জন্যে আবশ্যকীয় প্রস্তুতিতে লেগে গেল, ঠিক হল আগামী কাল নয়ই মার্চ সমুদ্রযাত্রা শুরু হবে।

কিন্তু আট তারিখ রাত্রিবেলাতেই জ্বালামুখ থেকে সবেগে ছিটকে বেরিয়ে এলো আগুনের ধারা, অজস্র বজ্র যেন গর্জন করে উঠল একসঙ্গে, চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে গেল আস্ত দ্বীপটাই, আর তিন হাজার ফুট উপর পর্যন্ত উঠল সেই হাজারখণ্ড দ্বীপের এক-একটা টুকরো।

নিশ্চয়ই ডাক্কার-গহ্বরের দেয়াল গ্যাসের চাপে ফেটে চুরমার হয়ে গেছে, আর বিদ্যুদ্বেগে সমুদ্রতরঙ্গ প্রবেশ করেছে অগ্নিস্রাবী পর্বতের কেন্দ্রে। একটি জ্বালামুখে কুলোয়নি,

সহস্রধারায় লাভা বেরিয়ে আসছে দ্বীপের সহ অংশ দিয়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল, যেখানে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে নীল প্রশান্ত মহাসাগরের সীমাহারা উত্তাল তরঙ্গ কীসের জন্যে যেন ক্রমাগত উদ্দাম আক্রোশে ফেটে পড়ছে।

একটিমাত্র পর্বতখণ্ড-ত্রিশ ফুট লম্বা আর বিশ ফুট চওড়া : জলের কিনারা থেকে ফুটদশেক দুরে শুধু এই জমাট স্থানটুকুই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে জেগে আছে। এইটুকুই গ্রানাইট হাউসের পর্বতের অবশিষ্ট খণ্ড চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে গ্রানাইট হাউসের দেয়াল। বড়ো হলটার কতগুলো পাথর একটার উপরে আরেকটা পড়ে একত্রে জড়ো হয়ে এই পর্বতখণ্ডটি প্রস্তুত হয়েছিল। চারদিকে অন্যকিছুর চিহ্নমাত্র নেই। লিঙ্কন আইল্যান্ডের একমাত্র অবশিষ্ট রইল এই পর্বতখণ্ডটি। টপকে সঙ্গে করে এখানে এসেই আশ্রয় নিলেন সবাই। হতভাগ্য জাপ একটা ফাটলের মধ্যে পড়ে মারা গেছে।

সাইরাস হার্ডিং, গিডিয়ন স্পিলেট, হার্বাট, পেনক্র্যাফট, আয়ারটন আর নেব-এরা সবাই আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা পেলেন। অগ্ন্যুৎপাতের প্রচণ্ড আক্ষেপে সবাই ছিটকে পড়েছিলেন সমুদ্রের জলে। তারপর কাছে এই পর্বতখণ্ডটি দেখে সাঁতরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন সেখানে। নৌকোটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই জায়গা ছেড়ে যাবার কোনো উপায়ই আর নেই। সবাই মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এভাবে ন-দিন কেটে গেল পর্বতখণ্ডে। চরম দুরবস্থার আর দেরি নেই। স্নায়বিক উত্তেজনার চরম সীমায় এসে পৌঁছুলেন সবাই। হার্বাট আর নেব অনাহারে অনিদ্রায় প্রলাপ বকতে শুরু করে দিলে। আশার ক্ষীণতম আলোকবিন্দু পর্যন্ত তখন অদৃশ্য হয়েছে। কী করে যে আরও চার-পাঁচদিন কেটে গেল, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

সৌভাগ্যবশত সেই পর্বতখণ্ডের ফাটলে কিছু বৃষ্টির জল জমেছিল। তা পান করেই কাটল সকলের।

অবশেষে চব্বিশে মার্চ তারিখে বহু দূরে, সমুদ্রের দিগন্তে একটি বিন্দুর মতো কী যেন দেখতে পেলে আয়ারটন। সে উঠে দাঁড়িয়ে ভালো করে লক্ষ করলে সেই বিন্দুটিকে, তারপর সেই বিন্দুর দিকে হাত দিয়ে সংকেত করতে লাগল।

ক্রমে দেখা গেল, পাহাড় থেকে অনেক দূরে একটা জাহাজের পাল দেখা যাচ্ছে। এই পর্বতখণ্ডটির দিকেই যেন এগিয়ে আসতে লাগল জাহাজটি। তাদের যদি শক্তি থাকত, তারা যদি সমূদ্রের চারদিকে দৃষ্টি রাখতেন, তবে অনেক আগেই জাহাজটিকে দেখতে পেতেন। জাহাজটি দেখেই আয়ারটন বিড়বিড় করে বলে উঠল : ডানকান জাহাজ ... তারপরেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

সাইরাস হার্ডিং আর তার সঙ্গীদের যখন সংবিৎ ফিরল, তখন তারা দেখতে পেলেন তারা একটা জাহাজের ক্যাবিনের মধ্যে শুয়ে আছেন। কী করে যে তারা নিশ্চিত বিনাশের হাত থেকে রেহাই পেলেন প্রথমটা তা বুঝতে পারলেন না। পরে আয়ারটনের একটা কথায় বিষয়টা পরিষ্কার হল। আয়ারটন জানালে যে এইটেই ডানকান জাহাজ।

ডানকান! বিস্মিত হয়ে বললেন হার্ডিং, তারপর হাত তুলে ধন্যবাদ জানালেন ঈশ্বরকে।

সত্যিই এই জাহাজটি লর্ড গ্লেনারভনের ডানকান। কাপ্তেন গ্র্যান্টের ছেলে রবার্ট এখন এই জাহাজের কাপ্তেন। বারো বছর পরে আয়ারটনকে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁকে টেবর

আইল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিলো। সেইজন্যেই দ্বীপবাসীরা শুধু যে এখন রক্ষাই পেয়েছেন তাই নয়, জাহাজে চড়ে চলেছেন আমেরিকার দিকে–স্বদেশে।

সাইরাস হার্ডিং কাপ্তেন রবার্ট গ্র্যান্টকে জিগেস করলেন : আচ্ছা, আপনি তো আয়ারটনের খোঁজে টেবর আইল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে তাকে পাননি। কিন্তু, তারপরে এখানে, তার দেড়শো মাইল উত্তর-পুবদিকে আপনি এলেন কেন? কে আপনাকে এ-জায়গার খবর দিলে?

রবার্ট গ্র্যান্ট বললেন : কাপ্তেন হার্ডিং, আমি এখানে শুধু আয়ারটনের খোঁজে নয়, আপনার আর আপনার সঙ্গীদের খোঁজেও এসেছি।

আমার আর আমার সঙ্গীদের খোঁজে!

নিশ্চয়ই— রবার্ট গ্র্যান্ট উত্তর করলেন : লিঙ্কন আইল্যাণ্ডে।

আপনি লিঙ্কন আইল্যাণ্ডের খোঁজ পেলেন কী করে? ম্যাপে তো এই দ্বীপের নামটার পর্যন্ত উল্লেখ নেই।

রবার্ট গ্র্যান্ট বললেন : টেবর আইল্যাণ্ডে যে আপনারা একটা চিরকুটে লিখে রেখে এসেছিলেন, সেই কাগজটুকু পড়ে লিঙ্কন আইল্যাণ্ড আর আপনাদের কথা জানতে পেরেছিলুম। এই বলে রবার্ট গ্র্যান্ট সেই কাগজটুকু বার করে দেখালেন।

সাইরাস হার্ডিং কাগজের লেখা দেখে বুঝতে পারলেন, বোতলের মধ্যে যে-চিঠিটা পাওয়া গিয়েছিল আর কোর‍্যালে যে-চিঠিখানা তারা পেয়েছিলেন, তার লেখা আর এই কাগজের লেখা একই হাতের।

বুঝতে পেরেছি, বললেন হার্ডিং :কাপ্তেন নেমোর সর্বশেষ দান এটা। আর-একবার তিনি আমাদের প্রাণ বাঁচালেন। আমাদের বন-অ্যাডভেনচারে চড়েই তাহলে তিনি একদিন টেবর আইল্যান্ডে গিয়েছিলেন।

এমন সময় আয়ারটন এসে দাঁড়ালে সেখানে। তার হাতে কাপ্তেন নেমোর দেয়া সেই বাক্সটা। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়েও আয়ারটন বাক্সটা প্রাণপণে রক্ষা করেছে! এবার সে বাক্সটা সাইরাস হার্ডিং-এর হাতে তুলে দিলেন।

রুদ্ধ কণ্ঠে হার্ডিং বললেন, আয়ারটন!

তারপর মাথার টুপি খুলে অভিবাদন জানালেন কাপ্তেন নেমোর মহৎ আত্মাকে।

মহাসমুদ্রের সুনীল তরঙ্গ কেটে-কেটে ডানকান তখন নতুন মহাদেশ আমেরিকার দিকে এগিয়ে চলেছে।